ভাগনাডিহির মাঠ। ১৮৫৫ সালের ৩০শে জুন এই মাঠে প্রায় দশহাজার সাঁওতাল সমবেত হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে দামিন-ই কোহ্ থেকে সমস্ত শোষক-উৎপীড়ককে উৎখাত করে তারা স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে।

উৎসর্গ

৺পিতৃদেবের

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

"হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙ্গিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দুপাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি,
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান—
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!"

—নজরুল

ভূমিকা

প'য়ত্রিশ বছর আগে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীকালীকিংকর দত্ত সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৭) সম্বন্ধে গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। ঘটনাটি অভিনব। সেকালে আমাদের ঐতিহাসিক এবং গবেষকদের দৃষ্টি কৃষক বিদ্রোহের উপর পড়েনি। স্বাধীনতার পর এবং বিশেষ করে বিগত দুই দশকে গবেষণার পরিধি প্রসারিত হয়েছে। ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহ এবং উনিশ শতকের কৃষক বিদ্রোহ গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ব্রিটিশরাজের ভূমিকা বুঝবার জন্য এই ধরনের ঘটনার গুরুত্ব অধুনা স্বীকৃত। ঔপনিবেশিক পর্বে ভারতের জনসাধারণের মধ্যে যে বিক্ষোভ জমে উঠেছিল, তাঁরা বারে বারে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন, তার ইতিহাস তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করা দরকার। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ধারা বুঝতে হলে কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস জানতে হবে। মনে হয় এই উপলব্ধি থেকে ভারতীয় এবং বিদেশী গবেষক অধুনা কৃষক বিদ্রোহ সম্বন্ধে গবেষণায় রত। উল্লেখ না করে পারছি না যে নীল বিদ্রোহ সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ বই লিখেছেন আমেরিকার অধ্যাপক ব্লেয়ার ক্লিং। সুখের বিষয় পাবনার কৃষক সংগ্রাম, বাংলার তেভাগা এবং টঙ্ক সংগ্রাম, তেলেঙ্গানার কৃষক বিদ্রোহ সম্বন্ধে ভারতীয় লেখকদের বই সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় এবং ধারা যে দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে বাংলা ভাষায় সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্বন্ধে বই লিখেছেন। যতদূর জানি বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে আর কোন লেখক এই বিষয়ে এত বিস্তারিত আলোচনা করেন নি। শ্রীবাস্কের বই সুলিখিত এবং তথ্য সমৃদ্ধ। সরকারী দলিল এবং সমসাময়িক সংবাদপত্র থেকে তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাঁর লেখার মধ্যে সাঁওতাল কৃষক সম্বন্ধে যে দরদ এবং আবেগ ফুটে উঠেছে, তা পাঠকের চোখে পড়বে। আমার মনে হয় কৃষকদের প্রতি ভালবাসা না থাকলে তাদের দুঃখ-দৈন্য, স্বপ্ন-হতাশা লেখায় ফুটিয়ে তোলা দুঃসাধ্য। শ্রীবাস্কে সাঁওতাল কৃষকদের কাছে থেকে দেখেছেন বলে তাঁর লেখা এত জীবন্ত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর বাংলার বিভিন্ন জেলায় নতুন নতুন জমি কর্ষণাধীন হয়েছিল, জংগল সাফ করে জমি পুনরুদ্ধার করেছিল প্রধানত সাঁওতাল কৃষক। জমি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদ্ধার করা হয়েছিল কৃষকের বেগার শ্রমের সাহায্যে। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ ও দিনাজপুর জেলায় জংগল সাফ করেছিল সাঁওতাল কৃষক। অসংখ্য সাঁওতাল পরিবার এইসব জেলায় বসতি স্থাপন করে। প্রথমে কয়েক বছর খাজনা থেকে তারা রেহাই পেয়েছিল। জমি পুনরুদ্ধারের কাজ হয়ে গেলে তাদের উচ্ছেদ করে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয় তাদের, যারা উঁচু হারে নগদ খাজনা দিতে পেরেছিল। নগদ খাজনা যখন ফসলে খাজনার চেয়ে কম লাভজনক মনে হলো তখন ভূস্বামী

ভাগচাষের আশ্রয় নিতে থাকে। সাঁওতালদের মধ্যে যে ক্ষেতমজুর এবং বর্গাদারের সংখ্যা বেশী তা দৈবাৎ ঘটনা নয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বর্গাদারদের প্রায় পঞ্চাশ ভাগ সাঁওতাল, ডোম, বাগদি, হাড়ি সম্প্রদায়ভুক্ত। হিন্দু সমাজে এরা অচ্ছুৎ। এদের উপর তাই শুধু অর্থনৈতিক শোষণ চলে না, সামাজিক অত্যাচারও চলে। স্বাধীনতার পরে আদিবাসী সমস্যা যে বিস্ফোরণের মুখে অনেক বিশেষজ্ঞ তার উল্লেখ করেছেন।

১৮৫৫ সালে মুহূর্তের বিদ্যুৎ ঝলকের মত সাঁওতাল কৃষকদের গভীর অসন্তোষ প্রকাশিত হলো একটি বিদ্রোহে। সাঁওতাল কৃষক ব্রিটিশ সৈন্য-বাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হলো। অদ্যাবধি এত ব্যাপক এবং জঙ্গী সাঁওতাল বিদ্রোহ দেশে আর ঘটে নি। এই বিদ্রোহের নেতা দুই ভাই—সিদু ও কানু। প্রথমে সাঁওতাল কৃষকদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল জমিদার ও মহাজন ; ক্রমে তাদের লড়াই করতে হয় সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে। কয়েক হাজার কৃষক এই সংগ্রামে নিহত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের বিদ্রোহ পরাজিত হয়। পরবর্তীকালে তারা কৃষকসভার মধ্যে সংগঠিত হতে থাকে। তেভাগা সংগ্রামে সাঁওতাল কৃষকদের ব্যাপক অংশগ্রহণ দেখা গেল। পশ্চিমদিনাজপুরে বালুরঘাট শহরের কাছে ঘাঁপুরে যে সংঘর্ষ হয়েছিল, তাতে পুলিসের গুলিতে নিহত ২২ জন কৃষকের মধ্যে ৯ জনই সাঁওতাল, বাকী কৃষকরা ছিলেন রাজবংশী এবং মুসলমান।

সেদিন সাঁওতাল কৃষক অন্যান্য সম্প্রদায়ের কৃষকের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সীমানা ছাড়িয়ে তাদের সংগ্রাম সমস্ত বর্ণ ও সম্প্রদায়ের কৃষকের সংগ্রামের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। আদিবাসী কৃষকদের সমস্যা সাম্প্রদায়িক সমস্যা নয়, এই সমস্যা বাংলার কৃষি-সমস্যার অংগ। কৃষি-ব্যবস্থার রূপান্তরের মধ্যে আদিবাসী কৃষকদের সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজতে হয়। শুধু আদিবাসী কৃষকদের সাহায্যে "বিপ্লব" ঘটাবার প্রচেষ্টা অধুনা কোন কোন অঞ্চলে দেখা গেছে, কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

সুনীল সেন
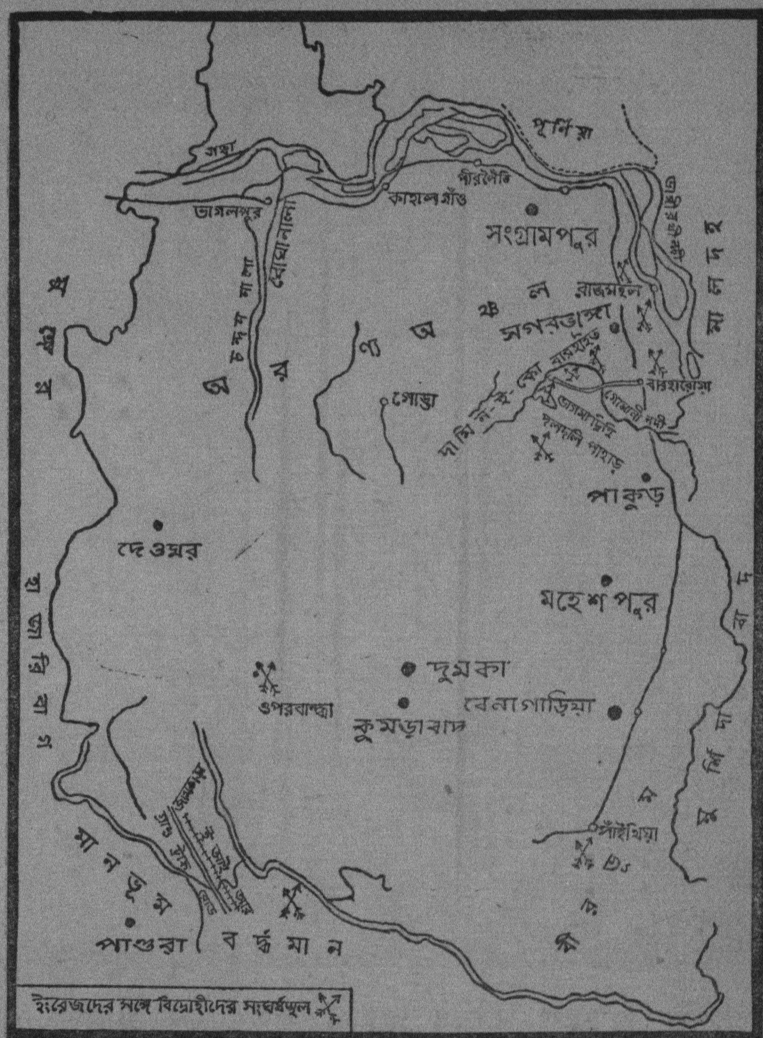
সাঁওতাল বিদ্রোহের ঘটনাস্থল, ১৮৫৫-৫৬ সাল।
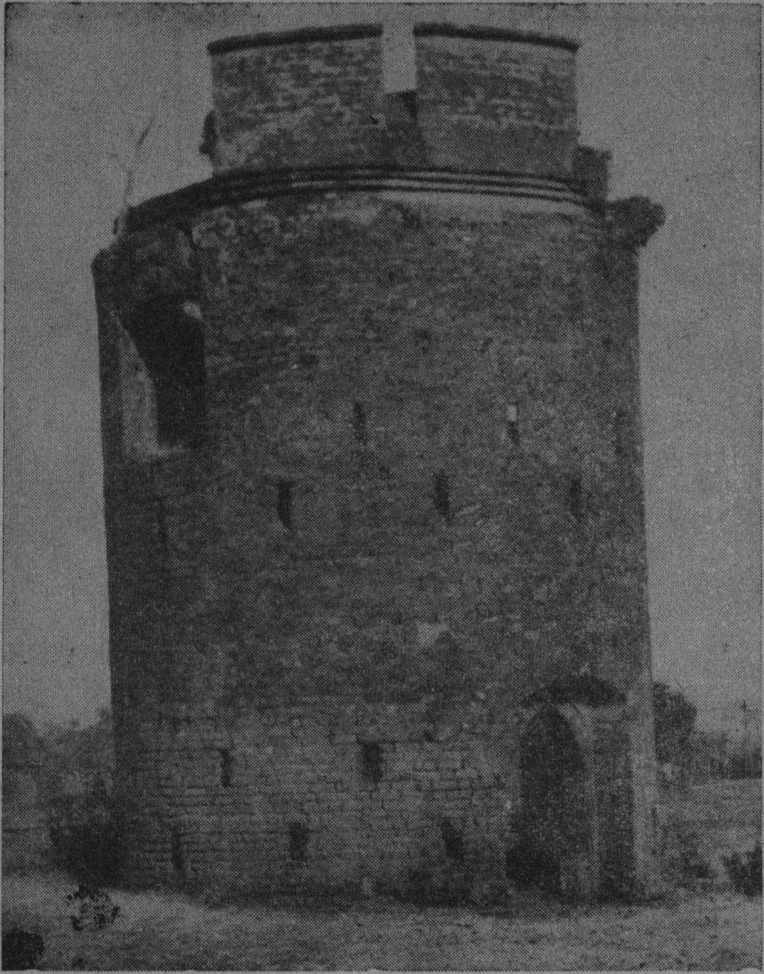
সাঁওতাল বিদ্রোহীদের আক্রমণে পর্যুদস্ত ইংরাজ সেনা পাকুড়ের এই স্তম্ভে আশ্রয় নিয়েছিল।
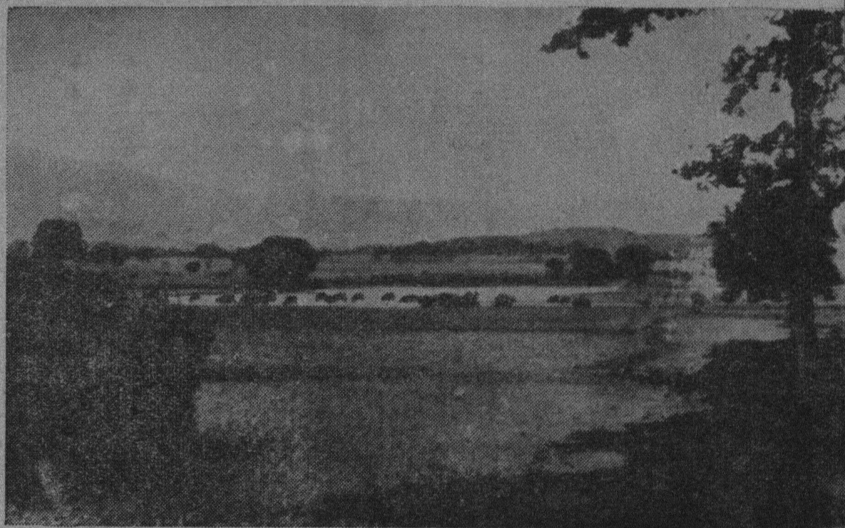
ঊনবিংশ শতাব্দীর দামীন-ই-কোহ্ ।

এক

"আদিবাসীরাই ভারতের প্রকৃত স্বদেশী বা প্রাচীনতম অধিবাসী; তাদের কাছে আর সকলেই বিদেশী। এই প্রাচীন জাতিরই নৈতিক দাবি ও অধিকার হাজার হাজার বছরের পুরানো।" (সি. বি. মেমোরিয়া, 'ট্রাইবাল ডেমোগ্রাফি ইন ইণ্ডিয়া', পৃ. ১৪২)।

বড় সত্যি কথা। পড়তে যেমন ভাল লাগে, শুনতেও তেমনি ভাল লাগে। কিন্তু ভারতের ইতিহাস সেভাবে লেখা হয়নি। ভারতের ঐতিহাসিকরা তা করেন নি। ভারতীয় সভ্যতা ও ভারতের ইতিহাস আজ পর্যন্ত আদিবাসীদের এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণের ইতিহাসকেও স্বীকৃতি দেয় নি। বড় দুঃখের কথা! আমরা জানি ইতিহাস—ইতিহাসই। ইতিহাসের কাছে ছোট বড় নেই, জাতি বিচার নেই। ইতিহাসে লেখা হয় সমাজের, দেশের ঘটনা ও কাহিনী। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে অন্যরূপ দেখতে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকরা লিখে গেছেন রাজারাজড়াদের, বড়লোকদের, বড় বড় কাহিনী। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত যে সকল জাতি অনুন্নত জাতি বলে গণ্য হচ্ছে, তাদের কথা তাঁরা লিখলেন না। বরং একটু স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয়, যারা বনজঙ্গলের বাঘ-ভালুক তাড়িয়ে তৈরি করল দেশ, বন-জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে তৈরি করল জমি-জায়গা, চাষ-আবাদ করল, মাটি খুঁড়ে খুঁজে বের করল সোনা-রুপো, তারা স্বীকৃতি তো পেলই না, বরং ইতিহাসে পরিচিত হল অসভ্য বর্বর জাতি বলে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা রেলপথ তৈরির কাজে যোগ দিল, তারা তার বিনিময়ে পেল অকথ্য অত্যাচার। বীরের মত যে জাতি দেশের জন্য প্রাণ দিল, বিদেশী শাসন লুপ্ত করার জন্য তীর-ধনুক, বল্লম, টাঙ্গি-তরোয়াল সম্বল করে কামান বন্দুকে সুসজ্জিত দুর্ধর্ষ ইংরাজ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করল, তাদের কথা লেখা হল 'খণ্ড জাতির বিদ্রোহ' কিংবা নিছক একটা স্থানীয় হাঙ্গামা বলে। দেশের প্রতি ভালবাসা যে তাদেরও যথেষ্ট ছিল এবং তারাও ভারতকে, এ দেশকে, সমানভাবে ভালবাসত, সেটা ঐতিহাসিকরা দেখেও দেখলেন না। স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে তারা স্থান পেল না, সুযোগ পেল না, সেটা চাপা পড়ল বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীভুক্ত সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের মনের সংকীর্ণতায়। আজকের সমাজ ব্যবস্থা যে পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছে, তা দেখে মনে হয়, তারাও সেদিন বুঝতে পেরেছিল আগামী দিনে কি হবে এবং তাই তারা চেয়েছিল শোষকশ্রেণীকে উৎখাত করতে। কিন্তু সেদিন কলিকাতার সমস্ত সংবাদপত্র, 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া' থেকে 'সংবাদ প্রভাকর' পর্যন্ত সাঁওতালদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেছিল। দুঃখের বিষয়, সাঁওতাল-দের সপক্ষে কথা বলবার কেউ ছিল না। এমন কি সমস্ত বিষয়টি নিরপেক্ষ

পর্যবেক্ষণেরও কোন চেষ্টা হয় নাই। একটা নিরীহ জাতি, যারা রাজনীতির ধার ধারে না, তারা কেন বেপরোয়াভাবে জীবনের মায়া ছেড়ে মরিয়া হয়ে উঠেছিল, তা তদন্তও হল না। ভারতের ইতিহাসকে শোষণ ও শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন অনুযায়ী সাজাতে হবে তো! তাই শোষণ ও শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম দেখা দিয়েছিল, তারা সেদিন তা আড়াল করে রাখবার চেষ্টা করেছিল। ঐতিহাসিকরা সেদিন শোষণ ও শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনে আসল ইতিহাসকে গোপন রেখে মিথ্যা, শোষণ, উৎপীড়ন ও সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করে গেছেন এবং ভারতীয় ঐতিহাসিকরাও গণসংগ্রামের ইতিহাসকে চাপা দিয়ে শাসকগোষ্ঠীর ইতিহাস রচনা করে গেছেন। যুগের পর যুগ আমরা সেই বিকৃত ইতিহাস পড়ে যাব? কিন্তু আর কতদিন? আদিবাসীদের সমস্যা আলোচনা করতে গিয়ে শ্রী বর্ধন লিখেছেন—

> "বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে সামগ্রিক সংগ্রামের একেবারে পয়লা সারিতে আদিবাসীরাও যে ছিল এবং উল্লেখযোগ্যভাবে সর্বাধিক আত্মত্যাগ তারাও যে করেছে এ কথা স্মরণ না করলে তাদের প্রতি প্রকৃত সুবিচার করা হয় না, এবং ভারতের ইতিহাস রচনায় তাদের ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়নও করা হয় না। বুর্জোয়া ঐতিহাসিকরা হয় এ সত্য অস্বীকার করতে চেষ্টা করেন অথবা মাঝে মাঝে উদারতার বশবর্তী হয়ে আদিবাসীদের এইসব সংগ্রামকে খুব বেশী হলেও স্থানীয় বিদ্রোহমাত্র বলে উল্লেখ করেন—অর্থাৎ তাঁদের ভাষায় এ সব ঘটনা ছিল আদিবাসীদের আদিম ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ মাত্র, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের ওপর তার প্রভাব খুব একটা পড়েনি। বুর্জোয়ারা চেষ্টা করেছে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে কেবল বুর্জোয়াশ্রেণীর ভাবাদর্শগত প্রভাবেই পরিপুষ্ট এবং তাদেরই কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালিত একটি আন্দোলন মাত্র বলে চিত্রিত করতে। এই পটভূমিতেই আজ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আদিবাসীদের অসংখ্য তীব্র সংগ্রামকে দাসত্ব ও শোষণের বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতির সংগ্রামের সাধারণ উত্তরাধিকারের অঙ্গ হিসাবে স্থান করে দেওয়ার।"[১]

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিক ও তাদের অনুসরণকারী দেশীয় ঐতিহাসিকদের রচিত বিকৃত ইতিহাসের স্বরূপ সাধারণ মানুষের কাছে আজ স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। নবাবের বিলাস-শালার চোখ ধাঁধানো চাকচিক্যের অন্তরালে কিংবা বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর সাম্রাজ্য বিস্তারের ষড়যন্ত্রের আড়ালে যে বিপুল গণসংগ্রাম চলেছিল, জনসাধারণ আজ তা জানতে পেরেছে। আরো, আনন্দের কথা ইদানীং মার্ক্সীয় মতাবলম্বী আধুনিক ঐতিহাসিকরা এ সব বিদ্রোহের মধ্যে

১। এ. বি. বর্ধন, 'দি আনসলভড্ ট্রাইবাল প্রবলেম', পৃ-৫।

ইংরাজ উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে গণ-প্রতিরোধের প্রথম প্রয়াস লক্ষ্য করেছেন, সেই সঙ্গে বৃটিশ শাসনের প্রথম ভাগে শ্রমজীবী মানুষের যে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তারও পরিচয় পেয়েছেন। দেশের সাধারণ মানুষের পরিচয় যে ইতিহাসে ঢাকা পড়ে, তা কখনও প্রকৃত ইতিহাসের মূল্য পায় না। সমাজের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ যে ইতিহাসে উপেক্ষিত হয়, তাদের গণ-আন্দোলন, স্বাধীনতা-সংগ্রাম যে ইতিহাসে সঠিকভাবে বর্ণিত হয় না, সে ইতিহাস কোন দিনই মানুষের কাছে প্রকৃত ইতিহাসের মর্যাদা পায় না। অতীতের ঐতিহাসিক-দের ইতিহাসে দাঙ্গাকারী, লুণ্ঠনকারী, ডাকাত, খুনী প্রভৃতি নামে বিকৃতভাবে যারা আখ্যা পেয়েছে তাদের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরতে হবে, তাদের জাতীয়তা-বোধ ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের সম্মান দিয়ে ভারতের প্রকৃত ইতিহাস রচনা করতে হবে। তবেই তো ইতিহাস রচনার সার্থকতা! অতীতের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করতে পারলেই আমরা আরো উন্নততর সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করতে পারব ও প্রগতির পথে অগ্রসর হব।

ইতিহাস কিছু ভোলে না, ভুলতে পারে না ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা। ভি. রাঘবাইয়া লিখেছেন—

> "বিভিন্ন আদিম জাতির সঙ্গে সংগ্রামের অঙ্গ হিসাবে নানা জটিলতার কিছুটা পূর্ব অভিজ্ঞতার পর বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সরকারকে সম্ভবতঃ বৃহত্তম আদিবাসী অভ্যুত্থানের, ১৮৫৫ সালের সাঁওতালজাতির বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হল। এর আগে অবধি বৃটিশরা জানত না আদিবাসীদের সঙ্গে সংঘাতের অর্থ কি, সুতরাং এবার বৃটিশদের এই সমস্যার মোকাবিলার জন্য খুব ভালভাবে তৈরি হতে হল। এজন্যই আমরা দেখতে পেলাম সাঁওতালদের সঙ্গে এবং প্রায় একই সময় এ দেশের আর একটি উপজাতি, মুণ্ডাদের সঙ্গে আচরণে বৃটিশরা আরো বেশী সতর্ক, আরো বেশী যত্নবান হয়েছে।"[১]

প্রচণ্ড বিক্ষোভে সেদিন সাঁওতাল চরিত্রের উগ্ররূপ সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। সমসাময়িক কবি কৃষ্ণদাস রায় 'সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া' রচনা করে লিখেছিলেন—

> "শুন ভাই বলি তাই সভাজনের কাছে।
> শুভবাবুর হুকুম পেয়ে সাঁওতাল ঝুঁকেছে॥
> বেটারা কুক্ ছাড়িল জড় হৈল হাজারে হাজারে।
> কখন আসে কখন লুটে থাকা হৈল ভার॥...

১। ভি. রাঘবাইয়া, 'ট্রাইবাল রিভোল্টস্', পৃ-১৩।

হাজার দুই সাঁওতাল তারা রাজবাড়ী সান্ধ্যায়।
লুটি ঘর সব কলরব করিয়া বেড়ায় ॥...
বার শ' বাষট্টি সাল, বর্ষাকাল বানের বড় বৃদ্ধি।
আব্দারপুরের মানুষ কেটে করলে গাদাগাদি ॥"[১]

আর সাঁওতালরা ? তারা চিৎকার করে বলে উঠেছিল—

"নেরা নিয়া, নুরু নিয়া,
ডিঁডা নিয়া ভিটা নিয়া,
হায়রে হায়রে ! মাপাঃকু' গপচু' দ,
নুরিচু' নাঁড়াড় গাই-কাডা, নাচেল লাগিৎ পাচেল লাগিৎ,
সেদায় লেকা বেতাবতেৎ এাম রুওয়াড় লাগিৎ
তবে দে বোন হুল গেয়া হো।"

অর্থাৎ—

"স্ত্রী-পুত্রের জন্য,
জমি-জায়গা বাস্তু-ভিটার জন্য,
হায় ! হায় ! এ মারামারি, এ কাটাকাটি
গো-মহিষ লাঙ্গল ধন-সম্পত্তির জন্য,
পূর্বের মত আবার ফিরে পাবার জন্য
আমরা বিদ্রোহ করব।"

বৃটিশ শাসন ও শোষণ-উৎপীড়নের কবল থেকে মুক্তিলাভ করার জন্যে দলে দলে সাঁওতাল সেদিন আপসহীন স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। হ্যাঁ—বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম। স্বাধীনতা লাভের জন্য আপসহীন সংগ্রাম ছাড়া কোন পরাধীন জাতির অন্য কোন অস্তিত্ব ও ক্রিয়াকলাপ থাকতে পারে না। এ সংগ্রামে পরাজয় ছিল, আপস ছিল না ; সাঁওতালরা নির্ভয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল, কিন্তু আত্মসমর্পণ করে নি। কারণ এ সংগ্রামের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা। ইংরাজ ঐতিহাসিক ও শাসকবর্গও এ কথা স্বীকার করে লিখেছেন :

"সাঁওতাল-বিদ্রোহের পশ্চাতে ছিল জমির উপর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সাঁওতালদের স্বাধীনতা-স্পৃহা, যার ফলে তারা ধ্বনি তুলেছিল : তাদের নিজ দলপতির অধীন স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য চাই।"[২]

সত্যি, অবাক হবারই কথা। স্বাধীনতার চেয়ে বড় তাদের কাছে আর কিছু ছিল না। তাই তারা স্বাধীনভাবে বাঁচবার অধিকার আদায় করে নেবার জন্য স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্যের দাবি তুলেছিল আর বৃটিশ-শক্তির বিরুদ্ধে বাঘের মত দুরন্ত লাফে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

১। 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা', ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা।
২। 'বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার ফর সানতাল পরগনাস', পৃ-৪৮।

ওল্ডহ্যাম সাহেব লিখেছেন ঃ

> "পুলিস ও মহাজনের অত্যাচারের স্মৃতি যাদের দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলেছিল, আন্দোলন তাদের সকলকেই আকৃষ্ট করল, কিন্তু যে মূল ভাবধারাকে কাজে পরিণত করবার চেষ্টা চলছিল তা ছিল সাঁওতাল অঞ্চল ও সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠার চিন্তা।"[১]

সমসাময়িক সাঁওতাল গুরু কলিয়ান হাড়ামের শিষ্য জুগিয়া হাড়াম সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—

> "খানুগে সিদো আর কানহুকিন হুকুমকেৎআ, রাজ আর সাউ যতবোন গচ্' চাবাকোওয়া আর দসার দেকো দো গঙ্গা পারমতে-বোন লাগাকোওয়া, আবোনাঃক্' রাজগে হোয়োঃক্'আ।"[২]

অর্থাৎ—

> 'সিদো আর কানহু বলল, আমরা রাজামহাজনদের সবাইকে খতম করব, পরে হিন্দু ব্যবসায়ীদের গঙ্গার ওপারে তাড়িয়ে দিব, আমাদেরই রাজ্য হবে।'

ছটরায় দেশমাঁঝিও একই কথা বলে গেছেন। বিদ্রোহে তিনি যোগ দিয়েছিলেন ও পরে বিদ্রোহের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—

> "হুল এতহপ্' পাহিলরে দো সিদো কানহুকিন পাসনাওকেৎআ, কাডা নাহেল ৮ আনা আর ডাংরা নাহেল ৪ আনা বোন এমা, আর রাজ নওয়া কাথা বাকো দহয়তাবোন খান লাড়হাইবোন এহবা; বেবাক্ দেকোবোন মাঃক্' গচ্'কোওয়া আর আবোবোন রাজঃক্'আ।"[৩]

অর্থাৎ—

> 'বিদ্রোহ আরম্ভ হবার পূর্বে সিদো কানহু জাহির করল, আমরা মহিষে টানা লাঙ্গল ৮ আনায় ও বলদে টানা লাঙ্গল ৪ আনায় দিব আর সরকার আমাদের কথা না রাখলে আমরা যুদ্ধ আরম্ভ করব, দেকোদের খতম করব এবং আমরাই রাজা হব।'

অতি স্পষ্ট কথা। অরণ্যরাজ্যে সুখে শান্তিতে বসবাস করবার জন্য তারা জমি করেছে, গ্রাম বসিয়েছে, শান্তির দেশ গড়ে তুলেছে। সেই শান্তি আজ নষ্ট হতে চলেছে। তাদের শ্রমের অংশ লুঠ করে নেবার জন্য কোম্পানীর অনুগত জমিদার ও মহাজনী ব্যবসাদারের দল হাত বাড়িয়েছে—এ যে অসহ্য। তারা প্রতিবাদ জানাল, কিন্তু বৃটিশ শাসক তাদের কথায় কর্ণপাত করল না। দিনে দিনে অত্যাচার বেড়ে যেতে লাগল। আর সহ্য করতে পারে না নিরীহ অশিক্ষিত সাঁওতালরা। তাদের সহ্যের সীমা যখন অতিক্রম করল তখন তারা

১। 'সানতাল রিবেলিয়ন' (প্রবন্ধ), পি. সি. যোশী।
২। 'হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃক্' কাথা', পৃ-২৪৩।
৩। 'ছটরায় দেশমাঞ্জহি রেয়াঃক্' কাথা', পৃ-৭।

বহুদিনের জমানো বিক্ষোভে ফেটে পড়ল বিদ্রোহের তূর্য নিনাদে ১৮৫৫ সালে। হাজার হাজার সাঁওতালের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল—

"নুসাসাবোন, নওয়ারাবোন চেলে হুঁ বাকো হেঙ্গোন,
খাঁটি গেবোন হুলগেয়া হো,
খাঁটি গেবোন হুলগেয়া হো,
দিশম দিশম দেশমাঞ্জ্হি পারগানা
নাতো নাতো মাপাঞ্জিকো
দঃ বোন দানাং বোন বাং গেকো তেঙ্গোন
তবে গেবোন হুলগেয়া হো।"

অর্থাৎ—

'আমরা বাঁচব, আমরা উঠব, কেউ আমাদের পাশে দাঁড়াবে না
আমরা সত্যিই বিদ্রোহ করব
আমরা সত্যিই বিদ্রোহ করব
দেশের মাঝি ও পারগানারা
গ্রামের মোড়লরা,
আমাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে, কেউ পাশে দাঁড়াবে না
তবে আমরা নিশ্চয় বিদ্রোহ করব।'

সাঁওতালরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল আর এ বিদ্রোহ শুধু স্বাধীনতার জন্যই। বিদেশীর ইতিহাসে তারা বন্য অসভ্য ও বর্বর বলে পরিচিত হল—একমাত্র তাদের স্বাধীনতা-প্রিয়তার জন্যই। পরবর্তীকালে ডব্লিউ. জি. আর্চার লিখেছেন ;

> "এটা এখন সকলেই স্বীকার করেন যে সাঁওতাল বিদ্রোহের একটা গভীরতর, অন্ততপক্ষে অতিরিক্ত কারণ হচ্ছে সাঁওতালদের স্বাধীনতার আকাঙ্খা ; যখন তাদের মাথার উপর কোন উৎপীড়ক প্রভু চেপে বসেনি সেই প্রাচীন অতীত দিনের স্বপ্ন ; হয়তো বা প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই স্মৃতি, যখন কোন কোন পণ্ডিতের মতে সাঁওতালরা নিজেরাই ছিল গাঙ্গেয় উপত্যকার একচ্ছত্র প্রভু এবং আর্য আক্রমণ-কারীদের দ্বারা তখনও সেখান থেকে তারা বিতাড়িত হয়নি। যাই হোক না কেন, কোন কোন সময় সাঁওতালদের মধ্যে 'খের্ওয়াড়ী' নামে একটা আন্দোলন দেখা যায়। 'খের্ওয়াড়' সাঁওতালদের প্রাচীন নাম এবং সাঁওতালদের মনে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে আছে সেই অতীত দিনের স্মৃতি, যখন তারা চাম্পা দেশে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বাস করত ; কাউকে খাজনা বা কর দিতে হত না, কেবল সর্দারগণকে সামান্য কিছু বার্ষিক খাজনা দিলেই চলত।"

এর পরেও কি বলতে হবে যে, সাঁওতাল বিদ্রোহ সাম্রাজ্যবাদী শোষক ইংরাজের বিরুদ্ধে একটা সচেতন বিদ্রোহ নয় ? ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটা অবিস্মরণীয় অধ্যায় নয় ?

দুই

পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌল্লার পরাজয় ঘটার পর পরাধীনতার কালো ছায়া আস্তে আস্তে বাঙ্গলার বুকে নেমে এল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গলা ও বিহারের ক্ষমতা দখল করে বসল। কোম্পানীর অর্থলোভী কর্মচারীরা রাজস্ব আদায়ের নামে দুই প্রদেশের ধনসম্পদ অবাধে লুট করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তারা বাঙ্গলা-বিহারের অরণ্য অঞ্চলের উপরও হাত বাড়াল। ভাগীরথীর পশ্চিমে অর্থাৎ রাজমহল থেকে আরম্ভ করে হাজারীবাগ ও মুঙ্গেরের সীমান্ত পর্যন্ত তখন ছিল শ্বাপদ-সঙ্কুল গভীর অরণ্য ; এ অরণ্য উত্তরে ভাগলপুর থেকে শুরু করে দক্ষিণে বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশ হয়ে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। সমস্ত অঞ্চলটাই ছিল ছোট ছোট পাহাড় ও জঙ্গলে ভরা, তবে পাহাড়ের থেকে জঙ্গলই বেশী। কোথাও শুধুমাত্র শালগাছে ভর্তি, আবার কোথাও শালগাছের সঙ্গে মিশে শিমুল, পলাশ, আম, মহুয়া এবং আরো রকমারি ছোট-বড় গাছ ; মাঝে মাঝে আবার কাঁটা গাছের ভয়ঙ্কর ঝোপ। দুর্ভেদ্য এ জঙ্গলে বাঘ, ভালুক, হাতী প্রভৃতি বন্যজন্তুর রাজত্ব। স্মরণাতীত কাল থেকে সাঁওতাল, পাহাড়িয়া, মাল পাহাড়িয়া প্রভৃতি আদিবাসীরাই এ জঙ্গলে বাস করে আসছিল। শিকার ও আদিম প্রথায় চাষ-আবাদ করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। পাঠান ও মোগল সেনারা বার বার বাঙ্গলা দেশ আক্রমণ করা সত্বেও এই বিশাল জঙ্গল ও পাহাড়ী এলাকার জন্য তাদের জীবনধারাকে খুব বেশী আঘাত দিতে পারেনি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের বিভিন্ন রচনা থেকে দেখা যায় যে, এ সমস্ত আদিবাসী ছিল যেমনি বুনো তেমনি গোঁয়ার, যেমনি দুর্ধর্ষ তেমনি দুরন্ত। কোনদিন তারা কারো বশ্যতা স্বীকার করেনি। নবাবের আমলে হিন্দু ও মুসলমান জমিদাররা রাজমহল পাহাড়ের আশপাশে কিছু কিছু জমি দখল করেছিল বটে, কিন্তু অরণ্যভূমির ভেতরে তারা প্রবেশ করতে পারেনি। স্বাধীনচেতা অরণ্য সন্তানরা কাউকে তাদের এলাকায় প্রবেশ করতে দিত না। জমিদাররা লোকজন নিয়ে অরণ্যের ভেতরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করলে কিংবা তাদের দমন করতে এলে তারা আরো গভীর জঙ্গলে সরে পড়ত এবং বনের ভেতর থেকে ঝাঁকের পর ঝাঁক তীর ছুঁড়ে জমিদারদের লোকজনকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করত। জমিদারদের সাধ্য ছিল না এই সব আদিবাসীকে দমন করে। এজন্য প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার সময় তারা আদিবাসী সর্দারদের নেমন্তন্ন করে পাগড়ি, পোশাক ও নানারকম জিনিস উপহার দিত।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজমহল এলাকায় দেওয়ানী নেওয়ার পরই এ সমস্ত আদিবাসীকে দমনের চেষ্টা করল—বিশেষভাবে পাহাড়িয়াদের। এই পাহাড়িয়ারা কোম্পানীর ডাক লুট করছিল এবং তারা ছিল অত্যন্ত বন্য ও হিংস্র প্রকৃতির। পাহাড়ের উপরে ছোট ছোট ঝুপড়িতে তারা বাস করত। শীতের

পূর্বে তারা খাদ্য সংগ্রহের জন্য দলে দলে পাহাড় থেকে নেমে আসত এবং সমতলভূমির ফসল লুট করে চলে যেত ; আর কোথাও বাধা পেলে তারা প্রলয়ঙ্কর মূর্তিতে শত্রু পক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্দয়ভাবে প্রতিশোধ নিত। কোম্পানী আমলের রাজস্ব কর্মচারী শেরউইল তাঁর বিবরণে এই সব পাহাড়িয়াকে 'পর্বত-অরণ্যচারী' বলে বর্ণনা করে লিখেছেন—

> "পাশাপাশি জেলাগুলিতে এই পাহাড়িয়ারা ছিল মূর্তিমান বিভীষিকা ; এই জেলাগুলির অধিবাসীদের কাছ থেকে তারা জোর করে অর্থ আদায় করত। যখন অর্থ পেত না তখনই তারা সশস্ত্র দলে সংগঠিত হত এবং বাঁশের তীর ধনুক নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসত। যে কেউ তাদের ডাকাতিতে বাধা দিত তাকেই তারা হত্যা করত এবং কাছাকাছি ও দূরে লুটতরাজ করে দুর্ভেদ্য জঙ্গলের নিরাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে যেত।"[১]

১৭৭২ সালে ক্যাপ্টেন ব্রুক নামে এক ইংরেজ একদল সিপাহী নিয়ে এই পাহাড়িয়াদের দমন করতে গেছলেন, কিন্তু পাহাড়িয়ারা অধিকাংশ সিপাহীকেই জঙ্গলের আড়াল থেকে তীর দিয়ে হত্যা করে, ফলে ক্যাপ্টেন সাহেবকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল। পরের বৎসর অগস্টাস ক্লিভল্যাণ্ড রাজমহলের সুপারিনটেনডেণ্ট নিযুক্ত হয়ে এলেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। ১৭৭৯ সালে তিনি ভাগলপুরের কালেক্টর পদে নিযুক্ত হলেন। তিনি অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলেন যে শক্তি প্রয়োগ করে এইসব পাহাড়িয়াকে দমন করা সম্ভব নয়, তাই এ পথ ত্যাগ করে কৌশলে তাদের বশীভূত করার চেষ্টা করলেন। এ না করলে যে কোম্পানীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা কোনদিনই সম্ভব হবে না। কূটবুদ্ধিতে এই অরণ্যচারী মানুষদের ওপরে সহজেই টেক্কা দেওয়া যায়। বন্ধুত্বই একমাত্র পথ। অতএব তিনি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে সচেষ্ট হলেন। তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে তিনি তাদের সমস্ত অভাব-অভিযোগ দূর করার দায়িত্ব নেবেন। ক্লিভল্যাণ্ড সাহেবের কৌশলের ফাঁদে পাহাড়িয়ারা সহজেই ধরা পড়ল। সাহেবকে তারা বন্ধুর চোখে দেখতে লাগল, নাম রাখল 'চিলিমিলি সাহেব'। সাহেবের কাজ-কর্মে আস্তে আস্তে তাদের ধারণা হল এমন হিতৈষী লোক বুঝি আর হয় না! এমনি করে ক্লিভল্যাণ্ড সাহেব অসাধ্য সাধন করলেন ; এজন্যই তাঁর সমাধির ওপর লেখা আছে ঃ

> "কোন রক্তপাত না করে অথবা কর্তৃত্বের ক্ষমতা প্রয়োগ না করে কেবল আপস-আলোচনা, আস্থা এবং দয়াদাক্ষিণ্যের মাধ্যমে তিনি রাজমহলের এই জঙ্গল টেরির (অরণ্য সীমান্ত) এই অবাধ্য এবং বন্য অধিবাসীদের সম্পূর্ণভাবে অনুগত করতে চেয়েছিলেন এবং সে কাজে তিনি সফলও

১। 'ক্যাপ্টেন শেরউইল'স রিপোর্ট', পৃ-২৬।

হয়েছিলেন। এই আরণ্যক অধিবাসীরা পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘকাল ধরে আক্রমণ লুটতরাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। ক্লিভল্যান্ড সাহেব এদের সভ্যজীবনের আস্বাদ দিয়ে অনুপ্রাণিত করলেন এবং তাদের হৃদয় জয় করে বৃটিশ সরকারের বশীভূত করলেন—হৃদয় জয় করাটাই আধিপত্য বিস্তারের সবচেয়ে যুক্তিপূর্ণ তথা চিরস্থায়ী পদ্ধতি।"

"[ক্লিভল্যান্ড সাহেবের সম্মানে এবং অন্যান্যদের সম্মুখে আদর্শ হিসাবে উপস্থাপনের জন্য বাঙ্গলার গভর্নর জেনারেল এবং কাউন্সিলের আদেশক্রমে প্রচারিত ১৭৮৪]"

ক্লিভল্যান্ড্ সাহেব প্রথমেই পাহাড়িয়া সর্দার ও মাঝিদের নিয়ে বৈঠকের ব্যবস্থা করলেন। বছরে দু'বার ঐ বৈঠক হত এবং তিনি নিজেই বৈঠক পরিচালনা করতেন। পাহাড়িয়াদের উৎপাত বন্ধ করার জন্য সর্দারদের দশ টাকা ও মাঝিদের দু'টাকা করে মাসিক বেতন ও তাদের জন্য নীল জামা আর লাল পাগড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন; এ ছাড়া, বহু পাহাড়িয়াকে সিপাহীতে নিয়োগ করলেন। তার ফলে, পাহাড়িয়াদের অনায়াসেই বশে আনা সম্ভব হল। জানা যায়, ১৭৮০ সালে চার শ' পাহাড়িয়া সিপাহী নিযুক্ত হয়েছিল।

"১৭৮০ সালরে পোন শায় গান পাহাড়িয়া সিপাহীয়ে দহকেৎ-কোওয়া; ওন্‌কো দো আশয়কায়তে সর্দারকো জিমারেকো তাঁহেনা। ওন্‌কো সিপাহী দো বির্ দিশমরে আকো জাত হড় কবজ্‌কোরে আঁড়ি কাজরেন হড়কো হোয়এনা। অনা কামিরেকো হেওয়াএঃক্'এন খান ভাগলপুর রেকো দহকেৎকোওয়া আর লেফ্‌টেন্যান্ট্ স ওন্‌কোরেন কাপ্তেনে বহালএনা।"[১]

অর্থাৎ—

'১৭৮০ সালে চারশ' সিপাহী নিযুক্ত করলেন; তারা সর্দারদের অধীনে থাকত। এই সব সিপাহী অরণ্য প্রদেশে তাদের স্বজাতি দমনে খুব কাজে লেগেছিল। এ কাজে তারা অভ্যস্ত হলে পর তাদের ভাগলপুরে রাখা হয় এবং লেফ্‌টেন্যান্ট স তাদের ক্যাপ্টেন নিযুক্ত হন।'

এর পরই তিনি পাহাড়িয়াদের জন্য একটি উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করলেন, নাম রাখলেন দামিন-ই-কোহ্ অর্থাৎ পাহাড়ের প্রান্তদেশ। কিন্তু পাহাড়িয়ারা সেখানে যেতে রাজী হল না। এ সময় মুশকিল বাধল সাঁওতালদের নিয়ে, তারা আর কোম্পানীর শাসনকে আমল দিতে চাইল না। অরণ্য-প্রকৃতির স্বাধীনতা তাদের দেহে-মনে। এতদিন তারা স্বাধীনভাবে চাষবাস ও অরণ্যসম্পদের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ

১। চৈতন্য হেম্ব্রম কুমার, 'সান্তাল পারগানা, সান্তাল আর পাহাড়িয়াকোওয়াঃক্' ইতিহাস', পৃ-৩১।

করে এসেছে, এমন কি মোগলযুগেও তাদের স্বাধীনতা কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয়নি, কিন্তু কোম্পানীর লোকজন আজ তাদের সেই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে তাদের শোষণের শিকারে পরিণত করতে চাইছে, তাদের কাছে খাজনা দাবি করছে। জমির উপর খাজনা বা অন্য কোন কর দেওয়াকে তারা অন্যায় বলে মনে করে। বিদেশী কোম্পানীর লোকজনকে তারা এক পাই-পয়সা খাজনা দিতে রাজী হল না এবং কোম্পানীর বশ্যতাও স্বীকার করল না। শুরু হল তখন সাঁওতালদের উপর ইংরাজ শাসকের অত্যাচার-উৎপীড়ন। খাজনা আদায়ের জন্য কোম্পানীর কর্মচারীরা সাঁওতালদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে ও যথাসর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাদের জীবন অসহনীয় করে তুলল। বণিকের মানদণ্ডকে রাজদণ্ড রূপে মেনে নেওয়ার জন্য শাসককুলের কর্মচারীরা সাঁওতালদের প্রতিদিন ভাগলপুরে ধরে এনে তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালাতে লাগল। বিদেশী শাসক-গোষ্ঠীর এই বর্বরসুলভ মনোভাব ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন বাবা তিলকা মাঝি। তাঁর আসল নাম তিলকা মুর্মু। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন অসীম সাহসী ও তীক্ষ্ন বুদ্ধির অধিকারী। স্বজাতির উপর বিদেশী শাসকের এরূপ অন্যায় অত্যাচার দেখে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না. চরম প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। অবিলম্বে তিনি সাঁওতালদের নিয়ে এক মুক্তি-বাহিনী গড়ে তুললেন এবং তাদের তীর-ধনুক, বর্শা, টাঙ্গি ও বাঁটুল চালনা শিক্ষা দিতে লাগলেন। তিনি নিজেও ছিলেন তীর ও বাঁটুল চালনায় পারদর্শী। গ্রামে গ্রামে তাঁর অভয়বাণী প্রচারিত হল, দলে দলে সাঁওতাল যুবক এসে তাঁর দলে যোগ দিল। অবশেষে একদিন এই সাঁওতাল মুক্তি-বাহিনী নিয়ে বিদেশী শত্রুকে উচ্ছেদ করার জন্য তিনি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। তাঁর মুক্তি-বাহিনী গেরিলা যুদ্ধের কায়দায় ইংরাজ সৈন্যদের অতিষ্ঠ করে তুলল। অরণ্যের গোপন ঘাঁটি থেকে হঠাৎ বের হয়ে তারা ইংরাজ সৈন্য ও পুলিসের উপর আক্রমণ চালিয়ে আবার অরণ্যের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে পড়ত। এভাবে ইংরাজ সৈন্য নাজেহাল হতে লাগল। কয়েকবার সামনাসামনি সংঘর্ষও হল, কিন্তু তিলকা মাঝির দলকে দমন করা সম্ভব হল না! জঙ্গলের আড়াল থেকে তারা তীর ও বাঁটুল মারত এবং অব্যর্থ ছিল তাদের নিশানা। বাঁটুলের গুলি ও তীর ইংরাজ সৈন্যদের গায়ে লাগলে তারা ত্রাহি ত্রাহি ডাক দিয়ে পালাতে বাধ্য হত। জানা যায়, অবস্থা সেদিন এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে ইংরাজ সৈন্যরা দিনের বেলাতেও জঙ্গলের কাছে যেতে সাহস করত না। এভাবে লড়াই চলল বহুদিন। শত শত সাঁওতাল-বিদ্রোহী প্রাণ দিল, ইংরাজ পুলিসও প্রচণ্ড মার খেল। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী ক্লিভল্যাণ্ড সাহেব তিলকা মাঝির বাঁটুলের গুলিতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে প্রাণ হারালেন। তিলকা মাঝির এই মুক্তি আন্দোলনের কথা লিখতে গিয়ে শ্রীরামলক্ষণ প্রসাদ উল্লেখ করেছেন ঃ—

> "বাবা তিলকা মাঁঝি কা জন্ম ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৭৫০ ইং মেঁ বতায়া যাতা হেঁ। উন্‌হো নে আপুনি জাতি তথা দেশ কো স্বতন্ত্র

রাখ্‌নে কে লিয়ে ভাগলপুর তথা রাজমহলকে প্রথম কালেক্টর আগস্ট ক্লিভল্যাণ্ড্‌ কো আপ্‌নি তীরোঁ কা নিশানা বনায়া। কুছ্‌ লগো কা কাহ্‌না হেঁ কি বাবা তিলকা মাঁঝি নে ক্লিভল্যাণ্ড্‌ কো ঢেলবাঁশ কা নিশানা বনায়া থা; উস্‌কে বাদ বাবা তিলকা মাঁঝি কো অংরেজী সেনা দ্বারা কাফি সংঘর্বকে বাদ পকড়কর বর্তমান তিলকা মাঁঝি মহল্লাকে তিলকা মাঁঝি চক্‌ স্থিত বড় (বট) বৃক্ষকে নীচে ১৭৮৫ ইং মেঁ উন্‌হে ফাঁসী দি গই॥[১]"

ক্লিভল্যাণ্ড্‌ সাহেবের মৃত্যুর পর সাঁওতালদের উপর শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার চরমে উঠল। বিদ্রোহ দমন করার জন্য হাজার হাজার সৈন্য এল, গ্রামে গ্রামে পুলিস দল মোতায়েন করা হল। তারা তিলকা মাঝি ও তাঁর অনুচরদের ধরবার জন্য সমস্ত সাঁওতাল এলাকা চষে ফেলতে লাগল। সাঁওতালদের ঘর-বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল। সুসভ্য, সুশিক্ষিত বলে পরিচিত ইংরাজ সৈন্যদের এই নির্মম পাশবিকতা দেখে, তথাকথিত অসভ্য, বর্বর অরণ্য-সন্তানরা পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে গেল। কত যে সাঁওতাল প্রাণ হারাল, কত যে কুঁড়ে ঘর ভস্মীভূত হল তার হিসেব নেই। তিলকার মুক্তি-বাহিনীও সর্বস্ব পণ করে ইংরাজরাজের উপর আঘাত হানতে লাগল। প্রায় এক বৎসর ধরে চলল এখানে ওখানে লড়াই। অবশেষে শাসকগোষ্ঠী তিলকা ও তাঁর অনুচরদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হল।

ভাগলপুরের কাছে সুলতানগঞ্জ প্রান্তরে অর্থাৎ তিলকপুর গ্রামে ইংরাজ বাহিনীর সঙ্গে তিলকা ও তাঁর অনুচরদের একদিন সাক্ষাৎ হল। তিলকপুর গ্রাম সে সময় ছিল জঙ্গলে ভরা। ইংরাজ সৈন্য প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ করলে তিলকা তাঁর দলবল নিয়ে জঙ্গলে আত্মগোপন করলেন। ইংরাজসৈন্যও জঙ্গলের চারদিক ঘেরাও করল, কিন্তু তিলকার অনুচরদের তীর ও বাঁটুলের ভয়ে কেউ জঙ্গলে প্রবেশ করতে সাহস করল না। শত্রুকে চোখে দেখা যায় না, সুতরাং তাদের উপর আঘাত হানাও চলে না। দিনের পর দিন যায়। তিলকার সঙ্গে যেটুকু খাদ্য ছিল তা আস্তে আস্তে ফুরিয়ে এল। তিলকা তখন তাঁর দলবল নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলেন। সুলতানগঞ্জ প্রান্তরে তীর-ধনুকে সজ্জিত তিলকার মুক্তি-বাহিনীর সঙ্গে ইংরাজ-বাহিনীর লড়াই চলল। গুলি-গোলা উপেক্ষা করে তিলকার মুক্তি-বাহিনী ইংরাজ সৈন্যদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুড়তে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের তীর ফুরিয়ে এল, উপায় না দেখে তারা কুড়ুল, টাঙ্গি ও বর্শা নিয়ে ইংরাজ-বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিছু-ক্ষণের মধ্যেই অসংখ্য রক্তাক্ত দেহ মাটিতে পড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। তিলকপুর গ্রামের মাটি মুক্তি-বাহিনীর রক্তে লাল হয়ে গেল। তিলকা ধরা পড়লেন। তাঁকে ভাগলপুরে ধরে এনে নিদারুণভাবে চাবুক মারা হল এবং ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে সমস্ত শহরে টেনে হিচঁড়ে ঘোরানো হল। এতেও তাঁর মৃত্যু

১। শ্রী রামলক্ষণ প্রসাদ, 'অমর শহীদ বাবা তিলকা মাঁঝি', পৃ-৩।

হল না দেখে শেষ পর্যন্ত ফাঁসি দেওয়া হল। এভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান যোদ্ধা তিলকা মাঁঝিকে পৈশাচিকভাবে হত্যা করে ইংরাজরাজ অরণ্য প্রদেশের প্রথম দাবানল নেভাল। বলা বাহুল্য, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই মহান শহীদের নাম একবারও উচ্চারণ করেনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের অনুসরণকারী স্বার্থান্বেষী ও দেশীয় ঐতিহাসিকরা এবং স্বাধীন ভারতের শাসক-গোষ্ঠীও ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ ১৯০ বৎসর কালের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেনি। জনসাধারণ আজও জানতে পারেনি তিলকার মত শত শত শহীদের আত্মত্যাগের ইতিহাস এবং পরাধীন ভারতে তাদের সংগ্রামী ভূমিকা। এ কারণেই স্বাধীনতা সংগ্রামের কোন লিখিত ইতিহাস ভারতের জনসাধারণের কাছে আজ অবধি সমাদর লাভ করেনি কিংবা জনসাধারণও সে ইতিহাসকে তাদের নিজস্ব ইতিহাস বলে ভাবতে পারেনি। যাহোক স্বাধীনতার জন্য বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বিপ্লবী ভারতের ইতিহাসে তিলকা মাঁঝি যে অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচনা করে গেছেন, তা অন্য কারো কাছে যাই হোক না কেন, সাঁওতাল তথা আদিবাসী সমাজের কাছে অমূল্য। শ্রীরামলক্ষণ প্রসাদ মহাশয় এ কথা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করে লিখেছেন—

> "বাবা তিলকা মাঁঝি নে সন্থাল অন্য আদিবাসীয়োঁ কো বিচ্ দিকু মহাজনী তথা অংরেজী কে বিরুদ্ধ ১৩ জানুয়ারী ১৭৮৪ ইং কো আগস্ট ক্লিভল্যাণ্ড কো তীর সে মারকর ক্রান্তি কি জ্বালা প্রজ্জ্বলিত কিয়া—তথা আপ্নি রক্ত কি দান সে সন্থালো তথা অন্য আদিবাসীয়োঁ কে বিশৃঙ্খলিত ক্রান্তি কো এক শৃঙ্খলিত ক্রান্তি কা রূপ দিয়া। অংরেজী তথা দেশী জমিনদারো নে সন্থাল আদিবাসিয়োঁ কো দেশদ্রোহী ঘোষিত্ কিয়া। অতঃ অংরেজ পদাধিকারীয়োঁ নে সন্থালো কো ভিন্ন ভিন্ন তরহ্ সে (Torture) দারুণ কষ্ট দেনা শুরু কিয়া। অংরেজী নে জিস্ জাগাহ্ সন্থাল তথা অন্য আদিবাসীয়োঁ কো দেখা উন্‌হে বহী গোলী মার দেনে কি আজা দে হি। ইন সন্থাল আদি-বাসীয়োঁ কি মা-বোহ্‌নো পর্ ভি নানা প্রকার কে অত্যাচার প্রারম্ভ কর্ দিয়ে গয়ে, আউর বিশেষকর বাবা তিলকা মাঁঝিকে কে পরিবার কে লগো কো খোঁজ-খোঁজ কর তংগ্ কর্‌না শুরু কিয়া গয়া। ইস্ লিয়ে উন্‌কে পরিবারবালো নে আপ্‌নি জান তথা প্রাণ কে লোভ তথা অসহ্য কষ্ট কে চল্‌তে ইস্ ইলাকে (ভাগলপুর) কো ছোড় কর দুস্‌রি জাগাহ্ ভাগ্‌নে কো বিরশ্ হুয়ে তথা যাঁহা-তাঁহা ইন্‌কে পরিবার তথা বাস্তিবালে ভাগলপুর সে অন্যত্র যা কর লুক ছিপকর বস্ গয়ে। অব্ য়্য জাত হুয়া হে কি বাবা তিলকা মাঁঝি কে খানদান কে ব্যক্তি ইন্ অংরেজো কে অত্যাচার সে বারকোপ, বড়হেত হোতে হুয়ে কুছ্ লোগ্ বঙ্গালকে মিদনাপুর তক্ বড় গয়ে, জি আজ ভি মিদনাপুর জিলে মে বসে হুয়ে হে। ইস্ তরহ সে ভাগলপুর কে সৈভি সন্থাল

তথা অন্য আদিবাসী ইস্ ইলাকে কো ছোট কর সন্থাল পরগনা, সহরসা, পূর্ণিয়া, চম্পারণ, সারণ, সাহাবাদ, ছোটনাগপুর কে সিংহভূম, ধানবাদ, হাজারীবাগ, পলামু, মুঙ্গের, রাঁচি, বঙ্গালকে বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, পূর্ব বঙ্গালকে ঢাকা, ওড়িষ্যাকে ময়ূরভঞ্জ, রায়রঙ্গপুর, বারিপড়া, কেঁওনঝড়, বাবনঘাটি, মধ্যপ্রদেশকে গোণ্ডয়ানা, সরগুজা, আসামকে শিবসাগর, ডিব্রুগড়কে আশপাশ তথা চায় বাগানো তথা নেপালকে কুছ্ জিলো কো জঙ্গলো মেঁ ভাগকর শরণ লিয়ে হে। অতঃ উন অংরেজো তথা জমিনদারো কে অত্যাচার কা ফল স্ত্যাহ্ হুয়া কি ভাগলপুর তথা আশপাশ কে ইলাকো মেঁ সন্থালো তথা অন্য আদিবাসীয়োঁ কি সংখ্যা বহুৎ কম রহ্ গই।"[১]

বিদেশীরাজের বিরুদ্ধে তিলকা মাঝির বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও গভীর দেশপ্রেম ও স্বজাতির মুক্তিসাধনের জন্য তিনি যেভাবে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন, তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে থাকার যোগ্য। এই সংগ্রামের ইতিহাস থেকেই পরবর্তীকালে সাঁওতালরা লাভ করেছে দেশব্যাপী আপসহীন স্বাধীনতা সংগ্রামের জ্বলন্ত প্রেরণা।

১। শ্রী রামলক্ষণ প্রসাদ, 'অমর শহীদ বাবা তিলকা মাঁঝি' পৃ-২৭-২৯।

তিন

অগস্টাস ক্লিভল্যাণ্ড সাহেবের মৃত্যুর পর দামিন-ই-কোহ্‌র ভার পড়ল আবদুল রসুল খাঁ নামে এক এ দেশীয় কর্মচারীর উপর। তাঁর আমলে দামিন-ই-কোহ্‌র কোন উন্নতি তো হলই না, বরং নানারকম গোলযোগ দেখা দিল। কোম্পানীর কর্মচারীরা অবাধে শোষণ ও উৎপীড়ন চালাতে লাগল। পাহাড়িয়ারা ক্লিভল্যাণ্ড সাহেবের আমলে যে-সব সুবিধা পেয়েছিল, সে-সব বন্ধ করে দেওয়া হল। ফলে, তাদের মধ্যেও অসন্তোষ দেখা দিল। এ অসন্তোষ ক্রমেই বেড়ে চলল এবং শেষে একদিন ইংরাজশাসন ও জমিদারগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের আকারে আত্মপ্রকাশ করল। শোষণ ও শাসনে জর্জরিত সমতলভূমির অধিবাসীরাও এ সুযোগ ছাড়ল না, তারাও পাহাড়িয়াদের সঙ্গে যোগ দিল। দেখতে দেখতে সমস্ত বীরভূম জেলায় এ বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ল। কোম্পানীর কর্মচারীদের চিঠিপত্র থেকে জানা যায়, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বীরভূম ও বাঙ্গলাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এক ব্যাপক গণবিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল এবং বিদ্রোহীরা প্রায় তিন বৎসরকাল ইংরাজশাসন ও জমিদারদের বিরুদ্ধে এমন সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়েছিল যে, এ অঞ্চলের ইংরাজ শাসন অচল হয়ে পড়েছিল। সরকারী ইতিহাস ও গেজেটিয়ার রচয়িতা উইলিয়াম হাণ্টার লিখেছেন—

> "১৭৮৯ খৃষ্ট সাল থেকে ১৭৯১ খৃষ্ট সাল পর্যন্ত বীরভূম ও (বঙ্গদেশের) উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে দারুণ বিশৃঙ্খলা এমন একটা পর্যায়ে উঠেছিল যে, এর সঙ্গে একটা দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধের পার্থক্য সামান্যই ছিল।"[১]

পাহাড়িয়াদের এ বিদ্রোহে সমতলভূমির জনগণ অর্থাৎ সাধারণ কৃষকও দ্বিধাহীনভাবে সমর্থন জানিয়েছিল ও সর্বপ্রকারে সাহায্য করেছিল। এজন্য সেদিন পাহাড়িয়াদের রণকৌশলের কাছে ইংরাজদের সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীকেও বারবার পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল।

বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় যে, ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি থেকে বিদ্রোহীদের আক্রমণ শুরু হয়েছিল। বিদ্রোহীরা বীরভূম জেলার উত্তর প্রান্তে গঙ্গার ধারে ধারে একশত মাইল জুড়ে ইংরাজ বণিকদের কুঠি ও জমিদারদের কাছারি লুট করতে থাকে। বীরভূম জেলার কালেক্টর ছিলেন ক্রিস্টোফার কিটিং। তখনকার দিনে কালেক্টর মানে একদিকে যেমন রাজস্ব আদায়ের কর্তা, অন্যদিকে তেমন স্থানীয় সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি। কিটিং সাহেব অবিলম্বে বিদ্রোহীদের দমন করবার জন্য সেনাবাহিনী নিয়োগ করলেন, কিন্তু কোন ফল হল না। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে

১। ডব্লু. ডব্লু. হাণ্টার, 'দি অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল', পৃ-৭৪।

বিদ্রোহীরা সংঘবদ্ধ হয়ে বীরভূম জেলার ত্রিশ-চল্লিশটি গ্রামের জমিদারদের শস্যগোলা ও ইংরাজ বণিকদের কয়েকটি কুঠি আবার লুট করল। ইংরাজসৈন্য শত চেষ্টা করেও বিদ্রোহীদের দমন করতে সক্ষম হল না। ফলে জানা যায়, এ সমস্ত গ্রাম থেকে ইংরাজ শাসন একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।[১]

এর পরই বিদ্রোহী বাহিনী বীরভূম জেলার ইংরাজ বাহিনীর উপর আঘাত হানতে আরম্ভ করল। বিদ্রোহের রূপ দেখে শাসকগোষ্ঠীও আতঙ্কিত হয়ে উঠল। হান্টার সাহেব তা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন—

> "সর্বত্র আতঙ্ক ও রক্তপাত চলতে থাকে; সীমান্তের প্রবেশ-পথগুলির পাহারাদার সৈন্যদের রক্ষা করবার জন্য তাদের অবিলম্বে সরিয়ে নেওয়া হয়। ১৭৮৯ খৃষ্ট সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি মিঃ কিটিং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে একযোগে কাজ করবার জন্য অনিয়মিত সৈন্যদের নিযুক্ত করেন। এই বিদ্রোহীরা তখন তিন থেকে চার শত লোকের এক একটি দল গঠন করে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে জেলার মফঃস্বল শহরগুলোতে লুণ্ঠন করে ফিরতে থাকে।"[২]

বিদ্রোহীরা সমস্ত বীরভূম জেলার জমিদার, মহাজন ও ইংরাজ বণিকদের সম্পত্তি লুট করতে লাগল। শাসকগোষ্ঠী সর্বশক্তি নিয়োগ করেও বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হল, কারণ বিদ্রোহীরা তখন অনেক বেশী সংগঠিত, অনেক বেশী শক্তিশালী। তাছাড়া, লড়াইয়ের সময়ে এই পাহাড়িয়ারা তীর-ধনুকের পরিবর্তে দেশী বন্দুক ও তলোয়ার ব্যবহার করছিল। তাদের রণকৌশল যে যথেষ্ট উন্নত ছিল তা স্বীকার করে বীরভূমের কালেক্টর সাহেব গভর্নর জেনারেলের কাছে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন—

> "আমাদের এখানে যে সৈন্যদল আছে তা দিয়ে বিদ্রোহীদের বাধা দেওয়া সম্ভব নয়। আমাদের সৈন্যদের তুলনায় বিদ্রোহীরা অনেক বেশী শক্তিশালী, অনেক বেশী সুশৃংখল ও অনেক বেশী সাহসী। আর আমাদের সৈন্যরা শৃংখলাহীন, উদ্যমহীন এবং তারা লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরিবর্তে তাদের সঙ্গে সহযোগিতাই বেশী পছন্দ করে।"[৩]

এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, দেশীয় সৈন্যরাও সেদিন পাহাড়িয়াদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল, যার ফলে তাদের সংগঠন ও রণকৌশল অনেকখানি উন্নত হয়েছিল। সমতলভূমির শোষিত কৃষকও পাহাড়িয়াদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল যার ফলে বিদ্রোহীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

দেখতে দেখতে বিদ্রোহের আগুন আশেপাশের জেলাগুলিতে ছড়িয়ে পড়ল। বিদেশী শাসকগোষ্ঠী অতি নিষ্ঠুরভাবে বিদ্রোহ দমন করবার চেষ্টা করল।

১। 'লেটার ফ্রম দি কালেকটর অফ বীরভূম টু লেঃ স্মীথ', ১০ জানুয়ারী, ১৭৮৯।
২। ডব্লু, ডব্লু, হান্টার, 'দি অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল', পৃ-৭৭।
৩। 'লেটার ফ্রম দি কালেক্টর অফ বীরভূম টু দি গভর্নর জেনারেল', ১৬ অক্টোবর, ১৭৮৯।

জানা যায়, শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশে "ইংরাজ সৈন্যরা বিদ্রোহীদের বন্দী করা মাত্র হত্যা করে তাদের ছিন্ন মুণ্ডগুলি ঝুড়ি বোঝাই করে সদর দপ্তরে পাঠাত।"[১] এ রকম পৈশাচিক আচরণ যে-কোন সভ্য মানুষের কল্পনার অতীত।

কিন্তু এত করেও কোন ফল হল না। বিদ্রোহের আগুন কিছুমাত্র কমল না। বিদেশী শাসকগোষ্ঠী বুঝতে পারল যে, শোষণ ও উৎপীড়নমূলক অর্থনীতি চাপানোর ফলে সাধারণ মানুষ মরণ-যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ছোবল দিতে উদ্যত হয়েছে। প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা ও জীবিকা-নির্বাহের উপায় নিশ্চিহ্ন হওয়ায় সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে এবং সর্বশক্তি নিয়ে বাধা দিতে এসেছে। তারা আর অত্যাচার সহ্য করবে না। ক্ষমা করবে না ইংরাজদের, ক্ষমা করবে না অত্যাচারী জমিদার ও মহাজনদের। ধূর্ত ইংরাজ বিদ্রোহীদের শান্ত করবার জন্য বীরভূমের বনজঙ্গল কেটে চাষ-আবাদ ও বসতি স্থাপনের গঠনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করল।[২] ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ থেকে নতুন করে গ্রাম-সমাজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলল। এর ফলে বিদ্রোহীদের অনেকে বিদ্রোহ বন্ধ করে গ্রামে ফিরে যেতে লাগল। শাসকগোষ্ঠীও এ সুযোগে বিদ্রোহীদের সংগঠনকে ধ্বংস করল এবং পাহাড়িয়া বিদ্রোহের অবসান ঘটল।

বীরভূমের বনজঙ্গল কেটে চাষ-আবাদ ও নতুন করে গ্রাম-সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজ আরম্ভ হল। সাঁওতালরাও বাদ পড়ল না, তারাও বনজঙ্গল পরিষ্কার করে ঘর বাঁধতে শুরু করল। চৈতন্য হেম্ব্রম কুমার মহাশয় লিখেছেন—

> "রাজমহল বুরু দাখিন সেচ্ বীরভুম আর মানভুমরে দামোদর (নাই) পুডা হাবিচ্' পাহাড়িয়া লেকান আদিবাসিয়া (aboriginals) সান্তাল হড় আঁড বছর পাহিলরেগে হেচ্' বাসা আকান তাঁহেকানা; ওনকো দো হিন্দু জমিদার আর মহাজনকোওয়াঃক্' কোচলগড কারণতে আতিঞ আতিঞতে রাজমহল বুরু ভিড়াওকো হেচ্'এনা। তায়মতে পাহাড়িয়াকো অতেৎ জুমি বাকো গরজাৎতে সরকার দো ১৭৯০ সাল খন আঁড কুঁসতে সান্তালকো বল ওচোয়াৎকোওয়া। সান্তাল হড় দো বুরু আড়েপাশে বাড়িয়াঁও অতেৎ আর তাপল জুমিকো ঞামকেৎ খান আঁড কুঁসতে বির মাঃক্' টাঁড টাঁডতে বেরেলঃক্' কো এহপ্'-এনা।"[৩]

অর্থাৎ—

> "রাজমহল পাহাড়ের দক্ষিণে বীরভূম ও মানভূমে দামোদর (নদ) পর্যন্ত পাহাড়িয়াদের মত আদিবাসী সাঁওতালরা বহু বছর পূর্বে এসে বসবাস করছিল; তারা হিন্দু জমিদার এবং

১। এল. এস. এস. ও'ম্যালি, 'সান্তাল পরগনা ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার', পৃ-২৯।

২। 'লেটার ফ্রম দি কালেক্টর অফ বীরভূম টু দি বোর্ড অফ রেভিনিউ', ৩ জুলাই, ১৭৮৯।

৩। রেভাঃ চৈতন্য হেম্ব্রম কুমার, 'সান্তাল পারগানা, সান্তাল আর পাহাড়িয়াকোওয়াক্' ইতিহাস', পৃ-৩৫।

মহাজনদের অত্যাচারে ঘুরতে ঘুরতে রাজমহল পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত এসেছিল। পরে পাহাড়িয়ারা সমতল জমি পছন্দ না করায় সরকার ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ থেকে আনন্দে সাঁওতালদের প্রবেশ করতে দিল। সাঁওতালরা পাহাড়ের আশেপাশে উর্বর ও সমতল জমি পেয়ে মহানন্দে বনজঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে বসতি স্থাপন করতে লাগল।"

সাঁওতালরা সর্বপ্রথম গ্রাম প্রতিষ্ঠা করল দামিন-ই-কোহ্‌র পূর্বদিকে সগড়-ভাঙ্গায়, তারপরে পিপড়া ও আমগাছিয়াতে। আস্তে আস্তে গ্রামের সংখ্যা বাড়তে লাগল। ১৮০৯ সালে দুমকা মহকুমায় ও ১৮১৮ সালে গোড্ডা মহকুমায় তারা প্রবেশ করল। কিন্তু ইতিমধ্যে হিন্দু জমিদার ও মহাজনরা পাহাড়ী এলাকাগুলো দখল করতে থাকায় দামিন-ই-কোহ্‌র সীমানা নির্ধারণ ও তার চারপাশে পিল্‌পা তৈরি করার ব্যবস্থা হল। এ কাজের ভার পড়ল জন পেটি ওয়ার্ডের উপর। ১৮৩২-৩৩ সালে তিনি এবং সার্ভেয়ার ক্যাপ্টেন ট্যানার দামিন-ই-কোহ্‌র সীমানা নির্ধারণ করলেন। ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের ১৩৬৬.০১ বর্গমাইল জায়গা দামিন-ই-কোহ্‌র মধ্যে পড়ল, এর মধ্যে ৫০০ বর্গমাইল ছাড়া সমস্ত অঞ্চলটাই ছিল শুধু পাহাড়। আবার এই ৫০০ বর্গমাইলের মধ্যে ২৪৬ বর্গমাইল জঙ্গল ; মাত্র ২৫৪ বর্গমাইল ছিল আবাদযোগ্য জমি। দামিন-ই-কোহ্‌র সীমানা নির্ধারণ হওয়ার পরই বড়লাট লর্ড বেণ্টিঙ্ক রাজমহলের পশ্চিমদিকের জঙ্গল পরিষ্কার করে বসবাস করার জন্য সাঁওতালদের আহ্বান জানালেন। দলে দলে সাঁওতাল তখন কটক, ধলভূম, মানভূম, বরাভূম, ছোটনাগপুর, পালামৌ, হাজারীবাগ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূম থেকে দামিন-ই-কোহ্‌তে প্রবেশ করতে লাগল। চৈতন্য হেম্ব্রম কুমার মহাশয়ের বর্ণনায় পাওয়া যায় ঃ

"দামিন-ই-কোহ্‌রে হোড় হপনকো আকোরেন হাপড়ামকোওয়াঃক্' দেওয়া-সেওয়া, পরব-পরবাস, আর লেগচারকো কুসি রাস্কীতে মানাও লীগিৎ নিরাই জায়গাকো বুঝাওকেৎতে নাই-গাডা অন পারম হাজারীবাগ, মানভূম আর মেদিনীপুর খন ধন-দুরীব আর মাল ঝাল আনতে লাদ লাদকো হেচ্'এনা। চাম্পা রেয়াঃক্' সুক নিরাই দিশাতেকো আশএনা অডে হ্ঁ চেলে অনকা সুক নিরাইতেগেলে তাঁহে দাড়েয়াঃক্'আ। সেদায়াঃক্' চালি লেকা আতোরে মাঁঝিহি, পারাণিক আর পারগানা দেশমাঁঝিহি এমানকো তাঁহেনতাকোওয়া। সরকারকো দো হোড় হপনকো নিরাইতে দামিন-ই-কোহ্‌রে গিরাবাসী ওচোকোওয়া মেন্তে জেমস্ পণ্টেট্ সাহেব তালিকিয়াকো কোলকেদেয়া। উনি দ খাজনা উঠাও এমান আল্‌গাঃক্'আ মেন্তে দিশম দো পারগানা পারগানায় হাটিঞকেদা। মেনখান পাহাড়িয়াকো দামিন-ই-কোহ্‌রে অকা পোরহো তাঁহেকান-তাকোওয়া অনা পোরহো দো হোড় হপনকো বাকো এম ওচোআকান তাঁহেকানা। অনা ইয়াতে মাহাজনকো দো

দিশম ভিতরিতে বলঃক্‌' আর হোড় হপনকোওয়াঃক্‌' অরজন গাবচ্‌জং লাগিৎ আংকো ঞেল হোহোরকান তাঁহেকানা।"[১]

অর্থাৎ—

"দামিন-ই-কোহ্‌তে সাঁওতালরা তাদের পূর্ব-পুরুষদের রীতি-নীতি, পূজা-পার্বণ এবং আচার-অনুষ্ঠান মানবার জন্য নিরাপদ জায়গা মনে করে নদী-নালা পেরিয়ে হাজারীবাগ, মানভূম এবং মেদিনীপুর থেকে ধন-সম্পত্তি ও জিনিসপত্র নিয়ে দলে দলে এল। চাম্পার সুখ-শান্তি স্মরণ করে তারা মনে করল যে, ওখানেও সেরকম সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে। পূর্বের নিয়ম মত গ্রামে মাঁঝি, পারাণিক এবং পারগানা, দেশমাঁঝি প্রভৃতি তাদের থাকবে। সরকার সাঁওতালদের দামিন-ই-কোহ্‌তে সুখে-শান্তিতে বাস করতে দেওয়ার জন্য জেমস্‌ পণ্টেট্‌ সাহেবকে সুপারিনটেনডেণ্ট নিযুক্ত করে পাঠালেন। তিনি খাজনা আদায়ের সুবিধা হবে ভেবে দেশটিকে পরগনা পরগনায় বিভক্ত করলেন। কিন্তু পাহাড়িয়ারা দামিন-ই-কোহ্‌তে যে-সব সুবিধা পেয়ে আসছিল সে-সব সুবিধা সাঁওতালদের দেওয়া হল না। এজন্য মহাজনরা দেশের মধ্যে প্রবেশ করে সাঁওতালদের শস্য-সম্পদ আত্মসাৎ করবার সুযোগ খুঁজছিল।"

এভাবে সাঁওতালরা তাদের শক্ত সবল বাহুর ঘায়ে পাহাড় ভেঙ্গে জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করল। মাটি থেকে কাঁকর ও পাথর সরিয়ে তারা চাষের জমি তৈরি করল এবং সে জমিতে সোনার ফসল ফলাতে লাগল। সাঁওতাল পরগনার ডেপুটি কমিশনার রবার্ট কারস্টেয়ার্স তাদের চরিত্র প্রত্যক্ষ করে লিখেছেন—

"পণ্ডিত না হয়েও এই সব আরণ্যক নিজেদের কাজ বুঝত। তারা গাছ কাটতে, জঙ্গল পরিষ্কার করতে, বাড়ি তৈরি করতে, বাঁধ দিতে, ধানের জমি তৈরি করতে এবং ধান ও ভুট্টা ফলাতে জানত। তারা সব কিছুই খেত এবং প্রতিটি পাতা, মূল এবং ফল চিনত—খাদ্যোপযোগী প্রতিটি প্রাণীকেই তারা চিনত। আর শিকারের ক্ষেত্রে একমাত্র পাহাড়িয়াদের উৎকর্ষ ছিল এদের থেকে বেশি। পাহাড়িয়াদের ক্ষেত্রে শিকারটাই ছিল চরিত্রের মূল আবেগ। বন্যপ্রাণী, প্রকৃতি এবং ক্ষুধার সঙ্গে সাঁওতালদের লড়াই ছিল চিরন্তন। কেবল মানুষের সঙ্গেই তারা কখনও লড়াই করেনি। লড়াইয়ের কথা তারা জানত না, কেবল গ্রামের উৎসবে অথবা তাদের পিতৃপুরুষের অতীত কাহিনীতে প্রহরা-অগ্নির চারপাশে কৃত্রিম লড়াই ছাড়া যুদ্ধের কথা তারা কখনও শোনেনি।

১। চৈতন্য হেম্ব্রম কুমার, 'সান্তাল পারগানা, সান্তাল আর পাহাড়িয়াকোওয়াঃক্‌' ইতিহাস', পৃ-৫৭-৫৮।

এই অরণ্য প্রদেশে যেখানেই তারা গেছে, শাসকজাতি তাদের পথিকৃৎ বলে স্বাগত জানিয়েছে।"[১]

খেটে খাওয়া মানুষ তারা। পরিশ্রমী শক্তি তাদের মজ্জায় মজ্জায়, কৃষি-সংস্কৃতির রূপরেণু তাদের দেহে-মনে। তাই অনুর্বর অঞ্চলকে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করতে দেরি হল না। বন্য জন্তু ও শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যে প্রকৃতির কোলে তারা গড়ে তুলল অসংখ্য গ্রাম। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পরিশ্রম করে তারা তৈরি করল শস্য-শ্যামল কৃষিক্ষেত্র। নিজস্ব বাসভূমি গড়ার আনন্দে বিভোর হয়ে সেদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরও তারা গান গেয়েছিল ঃ—

সুর—লাগড়েঁ

"হানা ঘুটু পোর কুটাম
নওয়া ঘুটু সিয়োঃক্'
লিতাই লিতাই হার টুটি গেল
হামারে ঘরের ঘিরণী
দানা পানি নাই হে
মাঁডি বোকাঃক্' টুটি গেল।
আশ ছুটি গেল
লিতাই লিতাই হার টুটি গেল।"[২]

অর্থাৎ—

"ঐ মাঠে ঝোপজঙ্গল কাটতে হচ্ছে
এ মাঠে লাঙগল করতে হচ্ছে
নিতে নিতে হাল ভেঙেগ গেল
আমার ঘরের গিন্নী
দানা পানি নেই
রান্নার হাতা ভেঙে গেল
আশা ফুরালো
নিতে নিতে হাল ভেঙেগ গেল।"

[লিতাই লিতাই < লিতে লিতে > নিতে নিতে]

১। আর, কারস্টেয়াস', 'হারমা'জ ভিলেজ', পৃ-৮।
২। চৈতন্য হেম্ব্রম কুমার, 'সান্তাল পারগানা, সান্তাল আর পাহাড়িয়াকোওয়াঃক্' ইতিহাস', পৃ-৫৬।

চার

কয়েক বৎসরের মধ্যেই দামিন-ই-কোহ্‌র চেহারা একেবারে পাল্টে গেল। দুর্ভেদ্য অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে সাঁওতালদের ছোট ছোট গ্রাম। মাটির দেওয়াল আর খড়ের ছাউনি। মাটির দেওয়ালে লাল, কালো, সাদা রঙ দিয়ে নানা রকম জীবজন্তু ও লতাপাতার ছবি আঁকা। ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে তক্‌তকে। জানা যায়, ১৮৫১ সনে এ এলাকায় মোট ৮২,৭৯৫ জন অধিবাসী অধ্যুষিত ১,৪৩৭টি গ্রাম গড়ে উঠেছিল। সারাদিন সাঁওতালরা উন্মুক্ত আকাশের নীচে কাজ করে—মাটি কাটে, ক্ষেত-খামারে কাজ করে, আবার কখনও বা গভীর জঙ্গল থেকে অরণ্য-সম্পদ সংগ্রহ করে। সন্ধ্যেবেলায় বাড়িতে ফিরে যা পায় তা দিয়ে তারা উদর পূরণ করে। তারপর কেউ বা বাঁশী বাজায়, আবার কেউ বা গ্রামের নাচগানের আখড়ায় যোগ দেয়। সমস্ত বনভূমি তখন তাদের আনন্দ, উচ্ছ্বাসে ভরে ওঠে। নাচতে নাচতে, গাইতে গাইতে তারা এক সময় প্রকৃতির কোলেই ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙ্গে পরদিন মোরগ ডাকার সঙ্গে সঙ্গে। পান্তা ভাত খেয়ে বেরিয়ে পড়ে-যে যার নিজের নিজের কাজে। দিনের পর দিন একই তাদের কর্মসূচি। এই তাদের জীবন। এ জীবনের বিরতি নেই, ক্লান্তি নেই, ক্ষয় নেই। এ সময়ের বর্ণনা করতে গিয়ে ছটরায় দেশমাঞ্জহি বলেছেন—

> "অনা অন্তরে হড়কো রেয়াঞ আঁড়ি সুক তাঁহেকানতাকোওয়া, আঁড়ি রাস্কাতে দিনকো টালাওএৎ তাঁহেকানা, যাঁহাঁরেগে ছাতা, পাতা, কালী দিবী পরব রেয়াঃক্‌'কো আঁজম, আঁজম তরাগে আতোরেন কুড়ি কড়া দো তুমদাঃক্‌' টামাক, করতাল তিরিয়োকোআনতে এনেচ্‌'কো ঞির বাড়ায়কান তাঁহেকানা, আর আতোকোরে হঁ দিনাম লেকাগে লাগড়েঁকো এনেচ্‌' আ। হড় হপন রেয়াঞ অনা অন্তরে দো ইনাগে আঁড়ি সুককো মেতাঃক্‌' কান তাঁহেকানা, ইনা ছাড়া যাঁহাঁনাঃক্‌' বোগেয়াঃক্‌' মা বাকো বাড়ায়লেৎ।"[১]

অর্থাৎ—

> "ঐ সময়ে সাঁওতালরা খুব সুখে ছিল, খুব আনন্দের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছিল। যেখানেই ছাতা উৎসব, পাতা উৎসব, কালীপুজোর খবর পেত, সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামের ছেলেমেয়েরা মাদল টামাক, করতাল বাঁশী নিয়ে নাচগান করতে যেত, আর গ্রামেও প্রতিদিন একনাগাড়ে নাচত। ঐ সময়ে এটাই ছিল সাঁওতালদের বড় আনন্দ, এ ছাড়া তারা অন্য ভাল কিছু জানত না।"

এভাবেই প্রকৃতির কোলে সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা বড় হয়, শৈশব থেকে

১। 'ছটরায় দেশমাঞ্জহি রেয়াঃক্‌' কাথা', পৃ-৩।

কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে। তখন তাদের কণ্ঠে জাগে বিচিত্র মধুর সঙ্গীত—

"বির্ বাড়্গে নওয়া অড়াঃক্' কঃক্' আলাং,
রাজারাণী নণ্ডে আলাং কঃক' আলাং,
রেঙ্গেচ্' জালা দ লাং এড়ের গিডিয়া,
সের্মা রেয়াঃক্' সুকলাং ভুঞ্জাও সুকজংআ।"

অর্থাৎ—

"এ বনভূমিতে আমরা ঘরবাড়ি তৈরি করব,
রাজারাণী হয়ে আমরা থাকব,
জগতের দুঃখ-কষ্ট আমরা ভুলে যাব,
স্বর্গীয় আনন্দ আমরা উপভোগ করব।"

বছরের পর বছর তাদের জীবন কাটে প্রকৃতির অন্তঃপুরে, অফুরন্ত আনন্দের মাঝে। বাইরের জগতের এতটুকু কালিমা তাদের মনকে স্পর্শ করতে পারে না। প্রকৃতির মতই তারা সরল, শান্ত ও সুন্দর। ছল, চাতুরী, প্রতারণা তাদের অজানা। সরল প্রাণ এই মানুষগুলিকে প্রতারণা করবার লোকের অভাব এ পৃথিবীতে হয় না। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান থেকে লোভী ব্যবসায়ী ও মহাজনের দল একে একে উপস্থিত হয় দামিন-ই-কোহ্‌তে। ব্যবসায়ীরা সাঁওতালদের কাছ থেকে সস্তা দরে ফসল কিনে চড়া দরে বাইরে চালান দেয়, আবার বাইরে থেকে নুন-তেল, এটা ওটা এনে চড়া দরে সাঁওতালদের কাছে বিক্রি করে। এই ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রবঞ্চনার ভাগই ছিল বেশী। ধূর্ত ব্যবসায়ীরা কেনাবেচার সময় ওজনে সাঁওতালদের নানাভাবে ঠকাত। সাঁওতালরা দেখত—যত ফসলই তারা নিয়ে আসে তাতে বিশ সের আর হয় না। তাই অবাক হয়ে তারা বলত—বিশ্ বোল্ বাবু, একবার বিশ বোল্। কিন্তু বাবুর মুখে কোন রকমেই বিশ কথাটা আর বেরোয় না। এ ছাড়া মহাজনের দলও চড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে সাঁওতালদের শ্রমের ফসল ইচ্ছামত আদায় করত। এই সব ব্যবসায়ী ও মহাজনদের কথা বলতে গিয়ে ঐতিহাসিক কালীকিঙ্কর দত্ত লিখেছেন—

"ক্রমে ক্রমে ময়রা, বেনিয়া ও অন্যান্য শ্রেণীর আরও বহু বাঙ্গালী পরিবার বর্ধমান ও বীরভূম জেলা থেকে এসে উপস্থিত হল। মহাজনী ব্যবসায় ও বাণিজ্যের অবাধ সুযোগে আকৃষ্ট হয়ে সাহাবাদ, ছাপরা, বেতিয়া, আরা ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভোজপুরী, ভাটিয়া প্রভৃতি পশ্চিমী ব্যবসায়ীরা দলে দলে দামিন-ই-কোহ্ অঞ্চলে এসে জেঁকে বসল। পাহাড়ী অঞ্চলের 'প্রধান শহর' (১৮৫১ সনে) বারহাইত (ই. আই. রেলওয়ের লুপ লাইনের বারহারোয়া রেলস্টেশনের প্রায় ১৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত) ছিল একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম এবং এখানে বহু সংখ্যক অধিবাসীর মধ্যে পঞ্চাশটি বাঙ্গালী ব্যবসায়ী পরিবারও বাস করত। এখানে একটি বাজার ছিল এবং সপ্তাহে

> দু'বার হাট বসত। এখানে একটি বিরাট পুকুর ছিল এবং দামিন-ই-কোহ্‌র সুপারিনটেনডেণ্ট পণ্টেট্‌ সাহেব সেখানে আলু চাষ করতেন। বহু বাঙালী মহাজন (ব্যবসায়ী ও সুদের কারবারীরা) বারহাইতের বাজার থেকে সাঁওতাল পরগনার বিপুল পরিমাণ ধান, সরিষা ও বিভিন্ন প্রকারের তৈলবীজ গরুর গাড়ি বোঝাই করে ভাগীরথীর তীরবর্তী জঙ্গীপুরে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে প্রথমে মুর্শিদাবাদে ও কলকাতায় এবং পরে অধিকাংশ সরিষা ইংলণ্ডে রপ্তানি করত। এ সকল শস্যের পরিবর্তে সাঁওতালদের দেওয়া হত সামান্য অর্থ, নুন, তামাক অথবা কাপড়। দুমকা মহকুমার কাঁথিকুণ্ডে বসবাসকারী কিছু বাঙ্গালী শস্য-ব্যবসায়ী সাঁওতালদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যের চেয়ে বহু অল্প মূল্যে সরিষা ও ধান নিয়ে আসত। তারা এই শস্য সিউড়িতে চালান দিত।"[১]

সাঁওতালদের উৎপন্ন শস্যের প্রায় সমস্ত অংশই উঠতে লাগল ইংরাজ বণিক-গোষ্ঠীর কুঠিতে ও ব্যবসায়ী-মহাজনদের গুদামে। এর প্রতিকারের কোন পথ তাদের কাছে খোলা ছিল না। কারণ বিদেশী শোষকরাজই ছিল এ শোষণ ব্যবস্থার প্রশ্রয়দাতা। এ ছাড়া খাজনা বাড়ানোর ফলেও সাঁওতালরা সর্বস্বান্ত হচ্ছিল। অরণ্যভূমিতে আবাদ করার জন্য যখন সাঁওতালদের ডাকা হয় তখন খাজনা লাগবে না, এ কথাই বলা হয়েছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ঐ আশ্বাস মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছিল, খাজনা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেয়েছিল। জানা যায় যে দামিন-ই-কোহ্‌ থেকে ১৮৩৮ সনে ইংরাজ সরকার বাৎসরিক দু' হাজার টাকা খাজনা আদায় করত, তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৫১ সনে দাঁড়িয়েছিল ৪,৩৯১৮ টাকা ১৩ আনা ৫।। পয়সা। শুধু তাই নয়, খাজনা আদায়কারী নায়েব সুজায়ালরা যা খাজনা তার সমপরিমাণ বা কখনও কখনও তারও বেশী মজুরী আদায় করত। এ না দিলে সাঁওতাল কৃষককে নানাভাবে উৎপীড়িত করা হত। এই অভূতপূর্ব শোষণের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে সাঁওতালদের জীবন ক্রমশঃই দুর্বিষহ হয়ে উঠতে লাগল। অর্থোন্মাদ শাসকগোষ্ঠীর ভয়ঙ্কর শোষণ-জ্বালা থেকে বাঁচবার জন্য শেষ পর্যন্ত তারা নামল বিদ্রোহের পথে। ইংরাজ শাসন ও ইংরাজ শাসকদের এ দেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য আদি-বাসীরা সেদিনই শুধু বিদ্রোহ করেনি, ইংরাজ শাসনের সূচনাকাল অর্থাৎ আঠারো শতকের শেষার্ধ থেকে ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাঙ্গলাদেশে এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে বহুবার তারা বিদ্রোহ করেছে। কালীচরণ ঘোষ মহাশয় লিখেছেন—

> আদিবাসী বিদ্রোহ ঘটেছে অগণ্য; সেগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো উল্লেখের দাবি রাখে। এ ছাড়াও আরো অসংখ্য ছোটখাট বিদ্রোহ ঘটেছিল: চুয়াড় (ঘাটশিলা ও বরাভূমের মধ্যবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী)

১। কে. কে. দত্ত, 'দি সান্তাল ইনসারেকশন অফ ১৮৫৫-৫৭', পৃঃ-৪-৫।

বিদ্রোহ—১৭৭০ ও ১৭৭৯, খাসি বিদ্রোহ—১৭৮৩, গঞ্জাম বিদ্রোহ—১৭৯৮, নায়ার বাহিনীর বিদ্রোহ—১৮০৪. ফরাজী আন্দোলন—১৮০৪-১৮৩৮, ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান ভেলু তাম্পির নেতৃত্বে খান্দেশের আদিবাসীদের বিদ্রোহ—১৮০৮, জাঠ বিদ্রোহ—১৮০৯ ; সাহারণপুরের গুজার বিদ্রোহ—১৮১৩, খান্দেশের ভীল বিদ্রোহ—১৮১৮, গোপাল সিং ও দিবাকর দীক্ষিতের নেতৃত্বে বুন্দেলখণ্ডীদের বিদ্রোহ—১৮২৪, কিটুর (বেলগাঁও) বিদ্রোহ—১৮২৪, কোল বিদ্রোহ—১৮৩১-৩২, মানভূমের ভূমিজ বিদ্রোহ—১৮৩২, ভিজিয়ানাগ্রামের নেতৃবর্গের বিদ্রোহ—১৭৯৩-১৮৩৪. নাগা বিদ্রোহ—১৮৩৯, আন্নাসাহেবের নেতৃত্বে কোলাপুর বিদ্রোহ—১৮৪৪, ওড়িশার খোণ্ড বিদ্রোহ—১৮৪৬ এবং বৃটিশ শাসকদের যা সবচেয়ে বেশি বেগ দিয়েছিল সিধু-কানহু, চাঁদ ও ভৈরবের নেতৃত্বাধীন সেই সাঁওতাল বিদ্রোহ—১৮৫৫ এবং মুণ্ডা বিদ্রোহ—১৮৫৭।”[১]

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে এই সমস্ত বিদ্রোহ ঘটেছিল এবং ব্রিটিশরাজের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও শাসনব্যবস্থাকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছিল। শাসকগোষ্ঠী শত চেষ্টা করেও বিদ্রোহের আগুন নেভাতে পারেনি। আদিবাসীরা বারবার বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরে সেই পতাকার নীচে হাজারে হাজারে প্রাণ দিয়েছে। এমন কি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও তারা রাঁচির মুরাবাঁদি পাহাড়ের উপর সমবেত হয়ে ব্রিটিশ রাজশক্তিকে এ দেশ থেকে উচ্ছেদ করার জন্য নেতাজীকে আহ্বান জানিয়েছে। এ ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ বলেছেন—

> সূর্যের প্রথম রশ্মি এসে মন্দির শীর্ষের ‘ওঁ’ প্রতীকটিকে স্পর্শ করল। তারপর সেই রশ্মি পড়ল বিরাট এক শিলাখণ্ডের উপরে। ১৯৪০ সনে এই শিলাখণ্ডের উপর দাঁড়িয়েই সুভাষ এক আদিবাসী জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আদিবাসীরা সেবারে সুভাষকে একটি লাঠি দিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন এই লাঠি দিয়ে ইংরেজকে এ দেশ থেকে তাড়াতে হবে।”[২]

সত্যি, তাদের সাহস ও স্বাধীনতা স্পৃহার প্রশংসা না করে পারা যায় না। মৃত্যুকে তুচ্ছ করে বারবার তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে ব্রিটিশরাজের সেনাবাহিনীর ওপর। ভারতীয় কৃষকের সুপ্ত সংগ্রামী শক্তিকে তারাই তো জাগিয়ে দিয়ে গেছে। ফলে, পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরো ব্যাপক, আরো তীব্র, আরো জঙ্গীরূপে প্রকাশ পেয়েছে। বিদ্রোহী ভারতের সাধারণ মানুষ

আদিবাসীদের সংগ্রামী চরিত্রকে ভুলতে পারেনি। সংগ্রামী মানুষের জন্য তাই তারা রচনা করে গেছে সাঁওতাল বিদ্রোহের ছড়া ঃ

"পাহিলে দাক্ষিণ জঙ্গল থা বাঘ ভল্লুক কা বাসা,
সাঁওতাল লোক সাফা কিয়া সাবিক দেশ এইসা।
এক বিঘা জমি নেহি থা দামিন কোলমে,
লাখ বিঘা জমি হুয়া দেখ নজর।
আট আনাকে দর সে পঞ্চাশ হাজার শাল,
এই সা প্রজা অবিচার মে হোগা বেহাল।
গোলাদার বাঙ্গালী দামিনের মহাজন,
তাদের কাছে কর্জ্জ নেয় সাঁওতাল প্রজাগণ।
শ্রাবণ মাসে এক টাকা নিলে,
আট মাসে তার একুশ টাকা হলো।
বার টাকায় চুরাশি টাকা একুন করিয়া,
গরু বাছুর সব তাদের লয় ডাকাইয়া।
দারোগার কাছে যদি নালিশ করিবে,
সেও বলে শালার বেটা টাকা দিতে হবে।
এইরূপে ধন মোদের সকল হরে নিলো
এইজন্য দামিনীতে হাঙ্গামা হইলো।"[১]

বিদেশী ইংরাজরাজের কুশাসন ও জমিদার-মহাজনদের শোষণ-উৎপীড়নের জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করছে সাধারণ মানুষের এই মূল্যবান দলিল।

১। 'ভারতবর্ষ', ২৬ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, মাঘ ১৩৪৫, 'সাঁওতাল বিদ্রোহের ছড়া'।

পাঁচ

লর্ড ডালহৌসির আমল। কলকাতা তখন সারা ভারতবর্ষের রাজধানী—বৃটিশ সাম্রাজ্যের শাসনকেন্দ্র। ভারতবর্ষের চেহারাটা অনেকখানি পাল্টে গেছে। বড়লাট লর্ড ডালহৌসী ছলে-বলে-কৌশলে একটির পর একটি দেশীয় রাজ্য গ্রাস করে চলেছেন। দেশীয় রাজ্যগুলিকে বশে না আনতে পারলে ইংরাজ রাজ্য নির্বিঘ্ন হয় না, যে কোন সময়েই তারা হাঙ্গামা বাধাতে পারে। ঘোর সাম্রাজ্যবাদী শাসক তিনি। বৃটিশ আধিপত্য বিস্তার ও শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর উদ্দেশ্য। বিদেশীরাজের আক্রমণের ফলে ভারতের প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে, ভারতের জনগণের আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে এক চরম দুর্যোগ নেমে এসেছে। গ্রাম-সমাজের সঙ্কট আরও তীব্র হয়ে উঠেছে ভূমি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে। লর্ড কর্নওআলিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির উপর জমিদারদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই অধিকারের বলে তারা বিদেশীরাজের হাতে নির্দিষ্ট রাজস্ব অর্পণ করে ইচ্ছামত খাজনা আদায় ও জমি থেকে উচ্ছেদ করবার অবাধ অধিকার পেয়েছে। নানাপ্রকার বৈধ ও অবৈধ কর দিতে দিতে কৃষকের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে। কৃষক-শোষণের এই শোচনীয় অবস্থা বিশপ হিবারের একটি উক্তি স্মরণ করিয়ে দেয়—

"দেশীয় কোন রাজাই আমাদের মত কর আদায় করেনি।"[১] একই কথা বলেছেন কর্নেল ব্রিগস্ :

> "ভারতে বর্তমানে যে ভূমিকর প্রচলিত আছে, ভূস্বামীর সমস্ত খাজনাই যাতে প্রায় চলে যায়, ইউরোপ বা এশিয়ার কোন সরকারেই এ রকম ভূমিকর প্রচলিত নাই।"[২]

কারিগরদেরও একই অবস্থা। ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের প্রয়োজনে এ দেশকে কাঁচামাল সরবরাহকারী ও শিল্পজাত দ্রব্য আমদানিকারীরূপে পরিণত করা হয়েছে। ইংলণ্ডের পণ্য ভারতের বাজার ছেয়ে ফেলেছে। ফলে গ্রাম্য-শিল্প ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের যে একটা আত্ম-নির্ভরতা ছিল, তা নষ্ট হয়ে গেছে। সখারাম গণেশ দেউস্কর লিখেছেন—

> "দীর্ঘকাল পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষেরা এ দেশের কৃষি-শিল্পজীবীদিগকে যেরূপ নির্মমভাবে লুণ্ঠন করিয়াছিলেন তাহাতেই ভারতবাসীর অধিকাংশ সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ হইয়া যায়—অতিরিক্ত কর দিয়া কৃষকেরা নিঃস্ব হইয়া পড়ে, শিল্পীগণ বাণিজ্য সংগ্রামে

১। সখারাম গণেশ দেউস্কর, 'দেশের কথা', পৃ-৫৮।
২। ঐ।

> পরাস্ত হইয়া অর্থশূন্য হওয়ায় কৃষিকর্ম অবলম্বনে বাধ্য হয়। ইংরাজ-শাসনের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের কৃষিজীবী সম্প্রদায়ে দারিদ্র-রাক্ষস কিরূপে স্থায়ী আধিপত্য লাভ করে, তাহা বুঝিতে হইলে, রাজস্ব-বৃদ্ধির এই ইতিহাস অবশ্য জ্ঞাতব্য। বৃটিশসিংহ যখনই কোনও প্রদেশে পদার্পণ করিয়াছেন, তখনই সেই প্রদেশের কৃষকদিগের শোণিত এরূপ অপরিমিতভাবে পান করিয়াছেন যে, হতভাগ্যগণ একেবারে উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা ঘোরতর কলঙ্কের বিষয় হইলেও ঐতিহাসিক সত্য। তাহার পর অবশ্য প্রথম আক্রমণের কঠোরতা স্থানে স্থানে লাঘব হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে প্রজাগণের প্রনষ্ট শক্তি কতদূর পুনরাগত হইয়াছে, প্রজা একগুণ দিয়া সহস্র গুণ পাইয়াছে কি না, ভারতে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ ও অন্নকষ্টের সংঘটনেই তাহা অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে।"[১]

ভারতের উপর বণিকরাজের এই আক্রমণ বর্ণনা করতে গিয়ে কার্ল মার্কস্ লিখেছেন—

> "বাণিজ্যের সমস্ত চরিত্রই পাল্টে গেছে। ১৮১৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষ ছিল রপ্তানিকারী দেশ, আর এখন ভারতবর্ষ আমদানিকারী দেশে পরিণত হয়েছে।"[২]

এ অবস্থায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী সরকারী আপিসে ও জমিদারী সেরেস্তায় চাকরি করে দু'পয়সা আয় করছে। ঐতিহাসিক যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন—

> "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ভূমির মালিকানাস্বত্ব স্থির হ'লে মধ্যবিত্ত বাঙালীরা তা থেকে লাভবান হ'তে থাকে। জমিদার-সরকারে ও সওদাগরী আপিসে চাকরি করেও এরা বেশ দু'পয়সা রোজগার করে। কোম্পানীর নিমক মহালে এজেন্টের পদ নিয়ে বহু মধ্যবিত্ত বাঙালী লক্ষপতি হয়।"[৩]

বাঙলার এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী তখন ইংরাজী শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়েছে, তাদের জীবনযাত্রায় ও চিন্তাধারায় পাশ্চাত্ত্য প্রভাব প্রবেশ করেছে। সমাজের ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও প্রশাসনিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের সুচিন্তিত মন্তব্য বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ পাচ্ছে। বলা বাহুল্য, বাঙলার ইতিহাসে এ সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নবযুগের সূচনা হয়েছে। কিছুকাল আগে ইয়ং-বেঙ্গল অর্থাৎ সংস্কার-মুক্ত একদল বাঙালী যুবক সারা বাঙলাকে তছনছ করে দিয়ে গেছে। ফলে, বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজে ঝড় বইছে। ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি ক্ষেত্রে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। কৃষ্ণমোহন

১। সখারাম গণেশ দেউস্কর, 'দেশের কথা', পৃ-৬২-৬৩।
২। কার্ল মার্কস্, 'দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী' (প্রবন্ধ, নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন, ১৮৫৩)।
৩। যোগেশচন্দ্র বাগল, 'মুক্তির সন্ধানে ভারত', পৃ-১৪।

বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩—১৮৮৫), রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩—১৮৯৭), দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪—১৮৭৮), রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০—১৮৫৮), শিবচন্দ্র দেব (১৮১১—১৮৯০), রাধানাথ সিকদার (১৮১৩—১৮৭০), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫—১৮৬৮), ভোলানাথ চন্দ্র (১৮২২—১৯১০), তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৪—১৮৫৫), প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮০৩—১৮৬৮), গোবিন্দ বসাক, কৈলাস নাথ দত্ত প্রমুখ মনীষীদের আবির্ভাব হয়েছে। সমাজে বিপ্লবীর ভূমিকা তাঁরাই গ্রহণ করেছেন। একদিকে তাঁরা যেমন চিরাচরিত হিন্দুসংস্কার রীতিনীতি অবিশ্বাসীর মন দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করছেন, অন্যদিকে তেমনি নতুন প্রাগ্রসর ভাবধারায় জাতীয় জীবনকে গড়ে তুলবার চেষ্টা করছেন। এক কথায়, মধ্যযুগীয় সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে আধুনিকতার সদ্য নির্মিত পথে বাঙগালী-সমাজ পা ফেলে চলছে।

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে বহু পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৫৫ সনের ১২ এপ্রিলের 'সংবাদ প্রভাকর'-এ এই সব পত্র-পত্রিকার এক তালিকা পাওয়া যায়ঃ

দৈনিক : সংবাদ প্রভাকর, সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়।

দিনান্তরিক : সংবাদ ভাস্কর।

অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক : সংবাদ রসরাজ, সংবাদ বিভাকর, নূতন সমাচার চন্দ্রিকা।

সাপ্তাহিক : গবর্নমেণ্ট গেজেট, সংবাদ সাধুরঞ্জন, রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ, বর্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী, সংবাদ বর্দ্ধমান, সংবাদ জ্ঞানোদয়, কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা।

পাক্ষিক : নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

মাসিক : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, উপদেশক, সত্যার্ণব, বিবিধার্থ সংগ্রহ, ধর্ম্মরাজ।"[১]

এ ছাড়া, ইংরাজী পত্রিকাও এ সময়ে বেশ কিছু প্রকাশিত হয়েছে। বাঙ্গালীর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এই সব পত্র-পত্রিকার অবদান যে কত, তা বলে শেষ করা যায় না। সেদিনের চিন্তাশীল মনীষীরা এই সব পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেই তাদের চিন্তাধারা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছেন। ফলে, বাঙগালী-সমাজ বিশেষ উপকৃত হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ইতিমধ্যে দেশের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। হাওড়া থেকে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেল চলাচল করছে। রাজমহলেও কাজ আরম্ভ হয়েছে এবং কাজের ভার পড়েছে মিঃ ভিগার্সের ওপর। তিনিই প্রধান ইঞ্জিনিয়ার। রেলপথ নির্মাণের ফলে একদিকে যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে, অন্যদিকে তেমন

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাময়িক পত্র', পৃ-১৩০।

বাংলার কুটির-শিল্প ধ্বংস হয়েছে। গ্রামের মানুষের দুঃখ দুর্দশার সীমা নেই। এক পুরানো সাঁওতালী গানে দেশের এ অবস্থা চোখে পড়েঃ

"এ ফুল দেলা ফুল
রেলগাডিরে দেজঃক্' ফুল
ডুমকা জিলা এেল,
রেলগাডিরে বাঞ দেজঃক্'
ডুমকা জিলা বাঞ এেল
ডুমকা জিলা হড় দরে হালেডালে।"

অর্থাৎ—

"ও ফুল এস
রেলগাড়িতে উঠ
ডুমকা জেলা দেখ,
রেলগাড়িতে আমি উঠব না,
ডুমকা জেলা আমি দেখব না,
ডুমকা জেলার মানুষ চরম দুর্দশার মধ্যে আছে।"

ভয়াবহ দারিদ্র্য দেখা দিয়েছে গ্রামে গ্রামে, বাড়িতে বাড়িতে। গ্রামাঞ্চলে শস্য নেই, সে শস্য রপ্তানি হয়েছে ইংলণ্ডের বিভিন্ন বাজারে। বলা বাহুল্য. রেলপথ নির্মাণের ফলেই যে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, বহু ইংরাজ লেখকও এ কথা স্বীকার করে গেছেন। 'নিউ ইংলণ্ড ম্যাগাজিনে' রেভাঃ জে. টি. সণ্ডারল্যাণ্ড লিখেছেন—

"রেলপথ ভারতের বহু প্রাচীন শিল্পকে ধ্বংস করেছে এবং তার ফলে এ দেশের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর কপালে নেমে এসেছে চরম দুর্গতি ও কষ্ট; কিন্তু এর ফলে শাসকজাতির সমৃদ্ধি বেড়েছে। রেলপথের ফলে এই মূল্যবান উপনিবেশের ওপর শাসকজাতির সামরিক কব্জা দৃঢ়তর হয়েছে এবং অন্য যা কিছুরই অভাব ঘটুক না কেন শাসকশ্রেণীর টাকার অভাব কখনও ঘটেনি।"[১]

অতি সত্য কথা। বাণিজ্যিক ও সমরনৈতিক তাগিদে ভারতে রেলপথ নির্মাণ হয়েছে এবং এই কূটনীতির সাহায্যেই বিদেশীরাজ ভারতে কায়েমী শাসন-ব্যবস্থার দৃঢ়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। যদিও এটাও সত্য যে রেলপথ ও টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে অত্যন্ত প্রগতিশীল এক ভূমিকাও পালন করতে বাধ্য হয়েছে।

যাই হোক, রেলপথ তৈরির কাজ চলছে পুরোদমে। সাঁওতালরা জঙ্গলের গাছ কাটছে, রাস্তায় মাটি ফেলছে এবং রেললাইন পাতছে। তিনপাহাড়, সাহেবগঞ্জ, ভাগলপুর প্রভৃতি অঞ্চলে রেলপথ সম্প্রসারিত হচ্ছে। রেলপথ তৈরির কাজে সাঁওতালরা নগদ মজুরি পাচ্ছে। মজুরি অবশ্য বেশী নয়,

১। সখারাম গণেশ দেউস্কর, 'দেশের কথা', পৃ-৮৭।

কিন্তু তাই পেয়েই তারা যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছে। এদিকে আবার রেলের ফিরিঙ্গী সাহেবদের দৌরাত্ম্য ক্রমে বেড়ে চলেছে। রেলপথে কাজ দেওয়ার অজুহাতে তারা সাঁওতালদের গ্রাম থেকে ছাগল, মুরগী জোর করে বিনা পয়সায় ধরে নিয়ে যাচ্ছে, এমন কি, সাঁওতাল মেয়েদের দিকেও নজর দিচ্ছে।

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল। বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা তখন একটি প্রদেশের অন্তর্গত। ভাগলপুর একটি ডিভিসন, বীরভূমের উত্তর পর্যন্ত তার সীমানা। মিঃ অলিভার এই ভাগলপুর ডিভিসনের কমিশনার, অল্প কয়েকদিন পরেই তিনি অবসর নেবেন। তাঁরই অধীনে কাজ করেন দামিন-ই-কোহ্'র সুপারিনটেনডেণ্ট্ মিঃ জেমস্ পণ্টেট্। সাঁওতালদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ই তাঁর প্রধান কাজ। সাঁওতালরা তাঁর নাম রেখেছে পাল্টিন সাহেব। পাল্টিন সাহেবকে রাজস্ব আদায়ের কাজে সাহায্য করে দিঘি থানার দারোগা মহেশলাল দত্ত।

ফ্রেডারিক হ্যালিডে (Frederick Halliday) এ সময় বাংলার লেফটে-ন্যাণ্ট্ গভর্নর। বাঙ্গলাদেশে ইংরাজরাজের তিনিই প্রধান কর্তা। বৃটিশ সাম্রাজ্যকে স্থায়ী ও দৃঢ় করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। সাঁওতালদের বাসভূমিকে তিনি সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের ঘাঁটি করতে চাইছেন। সাঁওতালদের জন্য থানা, পুলিস, আইন-আদালত স্থাপন করেছেন। তাদের ফৌজদারী বিষয়ে ভাগলপুর ম্যাজিস্ট্রেটের ও দেওয়ানী বিষয়ে জঙ্গীপুরের মুনসেফের অধীনে আনা হয়েছে। কিন্তু আইনের কেন যে এ রহস্য, তা সাঁওতালরা বুঝতে পারে না। জমিদার-মহাজনদের অত্যাচার তাদের সহ্য করতে হচ্ছে। যত দিন যায়, তত নানারকম অভিজ্ঞতা তাদের চোখে ধরা পড়ে। বিদেশীরাজের আইন বড়ই জটিল। জমিদার-মহাজনরা অমানুষিক অত্যাচার-উৎপীড়ন চালায়, অথচ তাদের শাস্তি হয় না। এ সব দেখে সাঁওতালদের মনে অসন্তোষ বাড়তে থাকে। আর কাস্টেয়ার্স লিখেছেন—

> "সর্বত্রই ঝামেলা দেখা দিল—রাজপথ যারা বানাচ্ছিল সেই সব শ্রমিক উত্তর-পূর্বদিকে লুটপাট অত্যাচার চালাতে লাগল, উত্তর-পশ্চিমে পাহাড়িয়ারা চুরি-ছেঁচড়ামী করছে, কিন্তু সর্বোপরি সমগ্র হড় জাতির ওপর বিপদের যে কৃষ্ণ অপচ্ছায়া গাঢ়তর হয়ে দেখা দিল, তা হল মহাজন ও দারোগার নিপীড়নের ছায়া। পশ্চিমের তুলনায় পূর্বদিকে এই অত্যাচারের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি, যদিও কোন জায়গাতেই এটা কম ছিল না এবং পরিমাণে সর্বত্রই বাড়ছিল।"[১]

১। আর, কাস্টেয়ার্স, 'হারমা'জ ভিলেজ', পৃ-১৭২।

বৃটিশরাজ এই অসন্তোষের আগুনকে বেশিদিন আর চাপা দিয়ে রাখতে পারল না। লর্ড ডালহৌসীর আমলেই বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল দামিন-ই-কোহ্‌তে। ইতিহাসে পাওয়া যায়—

> "লর্ড ডালহৌসীর রাজত্বের শেষ বছরে রাজমহলের পাহাড়ী এলাকার আদিবাসী সাঁওতাল অধিবাসীদের অভ্যুত্থানের ফলে বাঙলার শান্তি বিপর্যস্ত হল।"[১]

এ আগুন নেভাতে যথেষ্ট সময় লেগেছে বৃটিশরাজের, যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে।

১। জন্ মার্শম্যান, 'হিস্টরী অফ ইণ্ডিয়া', পার্ট ১, পৃ-৭২০

ছয়

মহাজন ও ব্যবসায়ীরা দামিন-ই-কোহ্‌তে প্রবেশ করার পর থেকেই সাঁওতাল গ্রামগুলিতে পরিবর্তন দেখা দিল। জানা যায়, এ সময় বেনাগাড়িয়াতে দুর্গা মাঁঝি এবং মাটরু পারগানা, বারোমাসিয়াতে রাম পারগানা, জাম্বড়োতে মনি পারগানা, শিলিংগতে চাম্পাই মাঁঝি, পিপড়াতে হাড়মা মাঁঝি, শালবনিতে মুরুলি মাঁঝি, লিটিপাড়ায় বিজয় মাঁঝি, আমগাছিয়াতে গর্ভু মাঁঝি এবং পাড়ারকোলাতে শ্যাম পারগানা সাঁওতালদের নেতৃস্থানীয় বলে গণ্য হতেন। জমির চেহারা পাল্টে দিয়ে তাঁরাই বিভিন্ন জায়গায় গ্রাম স্থাপন করেছিলেন। কর্মব্যস্ত সাঁওতালরা টেরও পায়নি যে, মহাজন-ব্যবসায়ী ও সুদখোররা এসে ঘাঁটি গেড়েছে তাদেরই আশেপাশে। সুঁড়ি সম্প্রদায়ের লোকেরা গ্রামগুলিতে সুরার দোকান খুলল। এ সম্পর্কে কাস্টেয়ার্স সাহেব তাঁর 'হাড়মা'জ ভিলেজ' পুস্তকে লিখেছেন—

> "হড়রা চিরকালই বেশিমাত্রায় সুরা পান করত; কিন্তু মদের দোকান জিনিসটা এ অঞ্চলে একেবারেই নতুন জিনিস আর সর্বদাই এর মালিক হত কোন 'দিকু' বা সমতলবাসী। টাকা বা শস্যের বিনিময়ে বা ধারে সে কড়া পানীয় বেচত। আমড়াপাড়ার 'কালাল' ছিল বেশ খোলামেলা লোক। সে খুব কড়া পানীয় বেচত এবং নিজেদের খুশিতে হড়রা টাকা না নেওয়া পর্যন্ত কোন কিছু বলত না।"[১]

সাঁওতালরা আজও নিজেদের 'হড়' বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। তারা ফসল আর টাকা নিয়ে দোকানে যেত, সুরা পান করত ও দেনায় পড়ত। এভাবে অজান্তে মৃত্যুর ফাঁস গলায় পরতে লাগল সাঁওতালরা।

আশপাশের অত্যাচারী জমিদাররাও চুপ করে ছিল না, তারাও আস্তে আস্তে সাঁওতাল চাষীদের সমস্ত অধিকার হরণ করে ইচ্ছামত খাজনা ও সঙ্গে সঙ্গে নানা অজুহাতে অবৈধভাবে অর্থ আদায় করতে লাগল। সে সময় 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' হওয়ার ফলে জমির একচ্ছত্র মালিক একমাত্র জমিদাররাই। সাঁওতাল প্রজারা ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত আদালতে অভিযোগ করেও কোনও সুবিচার পেত না, কারণ আদালতে বিচারক থেকে পেয়াদা পর্যন্ত সবাই জমিদারদের হাতের লোক। জমিদাররা আবার চাষের জমি বাড়াবার জন্য বিনা পারিশ্রমিকে সাঁওতালদের খাটাতো, এ থেকে রক্ষা পাবার কোন পথ ছিল না। শুধু তাই নয়, দামিন-ই-কোহ্‌ থেকে কাঠ চালান শুরু হল। সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের উপর তাদের অধিকার লোপ পেল।

সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী সভ্যতা তাদের যেমন বাইরে থেকে আঘাত করছিল, তেমনি আবার মহাজনী-ব্যবসায়ী সভ্যতা ভিতর থেকে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেলছিল। বারহেট ছিল দামিন-ই-কোহ্‌র বড় বাজার। বড় বড় মনোহারী দোকান সেখানে। নুন-মসলা থেকে আরম্ভ করে রুপা, দস্তা ও পেতলের

১। আর, কাস্টেয়ার্স, 'হারমাজ' ভিলেজ', পৃ-৫৬।

নানারকম গয়না পাওয়া যেত সেখানে। সমস্ত দোকানই ছিল হিন্দুদের। কাস্টেয়ার্স সাহেবের কথায়ঃ

> "বাজারে ব্যবসায়ীদের আধিপত্য ছিল। তারা এখন সাঁওতাল গ্রামে গ্রামে দোকান খুলতে শুরু করল। এ সব দোকান থেকে তারা সব ধরনের আকর্ষণীয় জিনিস—রঙিন কাপড়, ধাতু ও লাক্ষার গয়না, পুঁতি বেচতে আরম্ভ করল; জিনিসের দাম দেওয়ার মত টাকা না থাকলেও এখানে ধারে জিনিস পাওয়া যেত। সরল হড়েরা খুবই আনন্দিত হল; গম্ভীর ব্যবসায়ী এগুলো নরম লাল কাপড়ে বাঁধানো লম্বা খাতায় টুকে রাখত। এ খাতাটি সাবধানে গুটিয়ে একটা সুতো দিয়ে বেঁধে সরিয়ে রাখা হত। টাকা আদায় করা হত আস্তে আস্তে।"[১]

এ ছাড়া বারহেটের বাজার নানারকম শস্য গরুর গাড়ি বোঝাই করে প্রথমে মুর্শিদাবাদ ও কলকাতায় এবং পরে ইংলণ্ডে রপ্তানি হত। ফলে, কৃষিজাত পণ্যের দর অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রতি টাকায় এ সময়ে পূর্বের তুলনায় কি পরিমাণ শস্য পাওয়া যেত, তা নীচের তালিকা[২] থেকে জানা যায়ঃ

	চাল	আটা	সরষের তেল
১৭৩৮	২ মণ ৩০ সের	২ মণ ২০ সের	১২ সের
১৭৫০	২ ,, ১০ ,,	২ ,, ১০ ,,	১০ ,,
১৭৫৮	১ ,, ৩০ ,,	১ ,, ৩৫ ,,	৮॥ ,,
১৭৮২	১ ,, ৫ ,,	১ ,, ৫ ,,	৭ ,,
১৮২৫	৫০ ,,	৩৫ ,,	৬ ,,
১৮৫৪	১৫ ,,	১৯ ,,	৫ ,,

এভাবে খাদ্য শস্যের দর বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠতে লাগল। সুযোগ বুঝে নানা জাতের মহাজনরা এসে ঘাঁটি গাড়ল দামিন-ই-কোহ্‌র আশেপাশে বারহেটে, হিরণপুরে। তারা সাঁওতালদের ঋণ দিত। যারা ঋণ নিত তারা মহাজনদের ক্রীতদাসে পরিণত হত। ক্রমে মহাজন-শ্রেণী ব্যাপক ক্ষমতার বলে গ্রামের সর্বেসর্বা হয়ে উঠল। মহাজনরা এক একটি এলাকা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতাল গ্রামসমাজ ভেঙে চুরমার হতে লাগল। জীবন সংগ্রামে বাঁচবার উপায়টুকু নিশ্চিহ্ন হতে লাগল। আর্থিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন উচ্ছন্নে গেল। এই অবস্থার মধ্যে আবার নীলকর সাহেবরা দামিন-ই-কোহ্‌র বিভিন্ন জায়গায় কুঠি স্থাপন করে সাঁওতাল চাষীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাতে লাগল। এতদিন ধান, গম, সরষে প্রভৃতি চাষ করে সাঁওতালরা কোনরকমে জীবিকা নির্বাহ করে আসছিল, কিন্তু নীলকর

১। আর, কাস্টেয়ার্স, 'হারমা'জ ভিলেজ', পৃ-৫৬।
২। জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, 'দেশের ডাক', পৃ-৩৩।

সাহেবরা সাঁওতাল চাষীদের নীল চাষ করতে বাধ্য করল। '১৮৫৫ কা সন্তাল বিদ্রোহ' নামক এক প্রবন্ধে শ্রীউমাশঙ্কর এ সম্পর্কে উল্লেখ করে লিখেছেন—

> "আরম্ভ মে', অংরেজ নীলহো নে সন্তালো কো নীল কি খেতি কর্‌নে কে লিয়ে উৎসাহিত্‌ কিয়া। পহ্‌লে তো উন্‌হে কুছ্‌ লাভ মালুম হুয়া, পর বাদ মে' নীলহে সাহেবো নে সন্তালো কা ইত্‌না শোষণ শুরু কিয়া কি যে উন্‌সে তংগ্‌ আ গয়ে। নীলহো দ্বারা কিয়ে গয়ে অত্যাচার কি কহানিয়া, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাতলা নে—'সমাচার চন্দ্রিকা' আউর 'সমাচার দর্পণ' মে' ছাপা থা। শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্ত নে ভি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' মে' অংরেজ নীলহো কে অত্যাচার কি সম্বন্ধ্‌ মে লিখা থা। সন্তাল পরগনা কে দুমকা অনুমণ্ডল মে' 'কোরাপিয়া' তথা আসনপাট্টি মে নীলহো কি ভারী কোঠিয়া স্থাপিত্‌ হো চুকি থি। সাহেবগঞ্জ আউর রাজমহলকে ইলাকো মে ভি নীলহো কি ভারী কোঠিয়া খুল চুকি থি। পায়লাপুর, বেলবত্‌তা, ডকৈতা তথা গোড্ডা মে ভি উহোনে কোঠিয়া স্থাপিত্‌ কর্‌ লি থি। সন্তালো কা নীলহে শোষণ করতে থে। সরকার কে য়েহা ইস্‌কি কুছ্‌ভি শুনওয়াই নেহি হোতি থি। অন্ত মে' লাচার হো কর্‌ সন্তালো নে নীলহো কে বিরুদ্ধ্‌ ২৫ জুলাই ১৮৫৫ ইং কে এক ঘোষণা-পত্র তেয়ার কিয়া। ঘোষণা-পত্র কি ভাষা সন্তালী থি, পর্‌ উস্‌কি লিপি ক্যায়থি হিন্দি থি।"[১]

এই নীলকর সাহেবদের হাত থেকে রেহাই পাবার কোন উপায়ই ছিল না। নীল বুনতে না চাইলে জোরজুলুম ছাড়া মারধরও করা হত, নীলকুঠির কয়েদখানায় বিদ্রোহী চাষীদের জোর করে কয়েদ করে রাখা হত। কত চাষী যে এভাবে পৈতৃক ভিটেবাড়ি ছেড়েছেন, জীবন বিসর্জন দিয়েছেন তার হিসেব নেই। নীলকর সাহেবদের এ অত্যাচার শুধু সাঁওতাল চাষীদের উপরই সীমাবদ্ধ ছিল না, হিন্দু-মুসলমান চাষীদের উপরও সমানভাবে চলছিল। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় এ সম্পর্কে লেখা হয়—

> "নীলকরদিগের কার্যের বিবরণ করিতে হইলে প্রজা পীড়নেরই বিবরণ লিখিতে হয়। তাঁহারা দুই প্রকারে নীল প্রাপ্ত হয়েন, প্রজাদিগকে অগ্রিম মূল্য দিয়া তাঁহাদের নীল ক্রয় করেন, এবং আপনার ভূমি কর্ষণ করিয়া নীল প্রস্তুত করেন। সরল স্বভাব সাধু ব্যক্তিরা মনে করিতে পারেন, ইহাতে দোষ কি? কিন্তু লোকের কত ক্লেশ, কত আশাভঙ্গ, কতদিন অনশন, কত যন্ত্রণা যে এই উভয়ের অন্তর্ভূক্ত রহিয়াছে, তাহা ক্রমে ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে। এই উভয়ই প্রজা-নাশের দুই অমোঘ উপায়। নীল প্রস্তুত করা প্রজাদিগের মানস নহে; নীলকর তাহাদিগকে বল দ্বারা তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত করেন ও নীল

১। 'বিহার সমাচার, স্বাধীনতা অঙ্ক',

বীজ বপনার্থে তাহাদিগের উত্তমোত্তম ভূমি নির্দিষ্ট করিয়া দেন। দ্রব্যের উচিত পণ প্রদান করা তাহার রীতি নহে, অতএব তিনি প্রজাদিগের নীলের অত্যল্প মূল্য ধার্য করেন। নীলকর সাহেব স্বাধিকারের একাধিপতি স্বরূপ, তিনি মনে করিলেই প্রজাদিগের সর্বস্ব হরণ করিতে পারেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া দাদন স্বরূপে যৎকিঞ্চিৎ যাহা প্রদান করিতে অনুমতি করেন, গোমস্তা ও অন্যান্য আমলাদের দস্তুরি ও হিসাবানাদি উপলক্ষে তাহারও কোন্ না অর্ধাংশ কর্তন যায়? এ কারণ প্রজারা যে ভূমিতে ধান্য বা অন্যান্য শস্য বপন করিলে অনায়াসে সম্বৎসরের পরিবার প্রতিপালন করিয়া কাল যাপন করিতে পারে, তাহাতে নীলকর সাহেবের নীল বপন করিলে লাভ তার দূরে থাকুক, তাহাদিগকে দুশ্ছেদ্য ঋণজালে বদ্ধ হইতে হয়। অতএব তাহারা কোনক্রমেই স্বেচ্ছানুসারে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। বিশেষতঃ কৃষিকার্যই তাহাদের উপজীব্য; ভূমিই তাহাদের একমাত্র সম্পত্তি এবং তাহারই উপর তাহাদের সমুদয় আশা-ভরসা নির্ভর করে। কোন্ ব্যক্তি এমত সঞ্চিত ধনে জলাঞ্জলি দিয়া আত্মবধ করিতে চাহে? প্রবল প্রতাপান্বিত মহাবল পরাক্রান্ত নীলকর সাহেবের অনিবার্য অনুমতির অন্যথাচরণ করা কি দীন দরিদ্র প্রজাদিগের সাধ্য? তাহারা অশ্রুপূর্ণ নয়নে সভয়ে মনের বেদনা নিবেদন করুক বা অতীব কাতর হইয়া আর্তনাদ নিঃসরণ পুরঃসর তাঁহাদের পদানত হউক, কিছুতেই তাঁহাদের চিত্তভূমি কারুণ্য রসে আর্দ্র হয় না। তাঁহারা এইরূপ ব্যবহার করিয়াও আপনারদিগের নির্দয় জ্ঞান করেন না,···দীন দুঃখী প্রজারা এ প্রকার পরুষ বাক্য শ্রবণ করিলে আর কি করিতে পারে? তাহারদিগের স্বীয় ভূমিতেই অবশ্যই নীল বপন করিতে হয়। প্রত্যক্ষ দেখিয়াও স্বহস্তে গরল পান করিতে হয়। এই ভূমির নাম খাতাই জমি—খাতাই জমির প্রসঙ্গ মাত্রে প্রজাদের শোকসাগর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।"[১]

সত্যি, বাঙ্গলা ও বিহারের চাষীদের সেদিন এক ভয়াবহ অবস্থা। নীল চাষ করলেও বিপদ, আবার না করলেও বিপদ। নীলকর সাহেবরা দেশের প্রচলিত আইন-কানুনের ধার ধারত না। নীল চাষে অসম্মত হলেই চাষীকে তারা মাসের পর মাস নীলকুঠিতে বেআইনীভাবে কয়েদ করে রাখত। যে সব চাষী একটু নেতৃস্থানীয় তাদের এক কুঠি থেকে অন্য কুঠিতে প্রায়ই চালান করা হত এবং শেষ পর্যন্ত তাদের খোঁজই পাওয়া যেত না। এর বিরুদ্ধে অভিযোগ বা মামলা-মোকদ্দমা করেও কোন ফল হত না। কারণ, ম্যাজিস্ট্রেট্দের সঙ্গে নীলকরদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকত এবং ম্যাজিস্ট্রেট্রা বাইরে বেড়াতে কিংবা শিকারে গেলে এই সব নীলকরের আতিথ্য গ্রহণ করত। যাই হোক, অন্যান্যদের

১। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', অগ্রহায়ণ, ১৭৭২ শক।

মত সাঁওতাল চাষীদের দুঃখ-দুর্দশা চরমে উঠল। এক সাঁওতাল নীল চাষ সম্পর্কে বলেছেন—

"সাহেব ক যেমন লীল ইরঃক্' ক হুকুমা উন দ লীল কুঠি বাং পেরেচ্'লেন খান বাংক আড়াঃক্'কওয়া। লীল ইর্‌কাতে দাঃক্'রে ক জবেয়া, আরহঁ দাঃক্' খন রাকাপ্'কাতে কুঠিক পেরেজা; বাং পেরেচ্'লেন খান নিস্তার বানুঃক্', ঞিদাহঁ' সিঞ মাশাল লেকাগে ইর্‌কাতে দাঃক্'রে জবে রাকাপ্'কাতে কুঠি পেরেচ্' হোয়োঃক্'আ। ঞিদা অক্ত দ তারুপ রেনাঃক্' বতর। চিকাতেম ইরা? উন দ শশ সুনুম রেনাঃক্' হুলা তলকাতেক জোল ইদিয়া, অনা আর্শাল-মার্শালতে লীল ক ইরা। যাঁহাঁ তিনাঃক্'এ দাগরেহঁয় মেনখান হুলা সেঙ্গেল দ বায় ইঁড়িচ্' দাড়েয়াঃক্'আ।"[১]

অর্থাৎ—

"সাহেবরা যখন নীল কাটার জন্য হুকুম দিত তখন নীলকুঠি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কাকেও ছাড়া হত না। নীল কেটে জলে ভেজানো হত আবার জল থেকে তুলে কুঠি পূর্ণ করা হত। নীলকুঠি পূর্ণ না করলে নিস্তার নেই; রাত্রেও দিনের মত নীল কেটে জলে ভিজিয়ে কুঠি পূর্ণ করতে হত। রাত্রে বাঘের ভয়। কি করে নীল কাটবে? সে সময় ভেলা তেলের মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে যেত এবং সেই আলোতে নীল কাটা হত। যত বৃষ্টিই হোক না কেন এ আগুন নিভত না।"

অমানুষিক বর্বরতার এ এক করুণ ইতিহাস। এ ভাবেই দিন কাটে সাঁওতালদের। কি করবে তারা ভেবে পায় না, সামনে পেছনে মৃত্যুর ছায়া। ইংরাজরাজের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের রহস্য তারা বুঝতে পারে না। বছরের পর বছর যেটুকু অভিজ্ঞতা তারা সঞ্চয় করে, তার সবটুকুই তারা দেখে বঞ্চনা, যন্ত্রণা আর লাঞ্ছনা।

সাত

ইংরাজরাজের শোষণজালে আবদ্ধ হল সাঁওতালরা। জমিদার, মহাজন ও ব্যবসায়ীরা তাদের রক্ত জোঁকের মত শুষে নিতে লাগল। তাদের অর্থনৈতিক জীবনে নেমে এল এক ভয়ঙ্কর দুর্যোগ, শান্তির রাজ্যে বইতে লাগল শোষণ-অত্যাচারের বন্যা। অসহনীয় শোষণ-যন্ত্রণার কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্য সাঁওতাল কৃষক অবশেষে বেছে নিল রক্তরাঙা সংগ্রামের পথ। সাঁওতাল কৃষক শোষণের ভয়ঙ্কর রূপ বর্ণনা করে কালীকিঙ্কর দত্ত লিখেছেন—

> "১৮৫৫-৫৭ খৃস্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহ অর্ধ-বর্বর সাঁওতালদের সহজাত নিষ্ঠুরতার আকস্মিক বিস্ফোরণ মাত্র নয়। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দেই ক্যাপ্টেন শেরউইল লিখেছিলেন 'সাধারণভাবে সাঁওতালরা এক সুশৃংখল মানবগোষ্ঠী। এদের প্রতি শাসকদের কেবল প্রভুত্ব জাহির করা এবং খাজনা আদায় করা ছাড়া আরও কিছু করার আছে।' সমসাময়িক কালের পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যে সাঁওতাল অভ্যুত্থানের কারণ গভীরভাবে নিহিত। এ অভ্যুত্থানের মূলে ছিল সাঁওতালদের গভীর অর্থনৈতিক বিক্ষোভ আর এ বিক্ষোভ সরলমতি সাঁওতালদের উপর পূর্বোক্ত বাঙ্গালী ও পশ্চিমী মহাজন ও ব্যবসায়ীদের উৎপীড়ন ও প্রতারণারই অনিবার্য পরিণতি। উক্ত মহাজন ও ব্যবসায়ীদের শোষণ ক্রমেই ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছিল এবং তারা বিভিন্ন প্রতারণামূলক উপায়ে সাঁওতালদের কাছ থেকে অর্থ ও শস্য হস্তগত করে অবিশ্বাস্য-রূপ স্বল্পকালের মধ্যে বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ সঞ্চয় করেছিল। বর্ষাকালে সাঁওতালদের কিছু অর্থ, কিছু চাউল বা অন্য কোন জিনিস ঋণ দিয়ে তারা সমস্ত-জীবনের জন্য সাঁওতালদের ভাগ্যবিধাতা ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসত; ফসল কাটার সময় আসলেই এই মহাজনরা গরুর গাড়ি ও ঘোড়া নিয়ে বাৎসরিক আদায়ের জন্য বের হত। তারা আসবার পথে একটা পাথর সংগ্রহ করত এবং তার ওজন নির্ভুল দেখবার জন্য সিন্দুর মাখিয়ে রাখত। খাতকদের বাড়িতে উপস্থিত হলে খাতকদেরই মহাজন ও তার লোকজনদের আহারের খরচ বহন করতে হত। মহাজনরা ঐ পাথরের টুকরার সাহায্যে ওজন করে তাদের খাতকদের জমির সমস্ত ফসল হস্তগত করত। কিন্তু তাতেও খাতকদের ঋণের পরিমাণ কিছুমাত্র কমত না। এ ছাড়া, মহাজনরা দু'রকম বাটখারা রাখত—(১) কেনারাম বা বড়বৌ, যেটি সাধারণ ওজনের থেকে সামান্য বড় এবং খাতকদের কাছ থেকে ফসল ওজন করে নেওয়ার জন্যই তারা ব্যবহার করত, (২) বেচারাম বা ছোটবৌ যেটি সঠিক মানের ওজন থেকে কম এবং সাঁওতালদের জিনিস ঋণ দেওয়ার সময় তারা ব্যবহার করত। তারা সুদও অত্যন্ত বেশী হারে

আদায় করত। একজন সাঁওতালকে তার ঋণের জন্য তার জমির ফসল, তার লাঙ্গলের বলদ, এমন কি নিজেকে এবং তার পরিবারকেও হারাতে হত আর সেই ঋণের দশগুণ পরিশোধ করলেও তার ঋণের বোঝা পূর্বে যেরূপ ছিল পরেও সেরূপ থাকত। বারহাইত ও হিরণপুর (পাকুড়ের ১৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত) এ দুটি স্থান ছিল মহাজনদের প্রধান কেন্দ্র। এই দুই কেন্দ্রে সাঁওতালদের দেওয়া সুদে অতি অল্প সময়ে একশ্রেণীর ধনী মহাজন সৃষ্টি হয়েছিল। সংক্ষেপে বলা চলে, এ সকল ব্যবসায়ী বাইরে থেকে এসে পাহাড়ী অঞ্চলে বাসা বাঁধবার পর থেকে সাঁওতালদের অবস্থার ভয়ঙ্কর পরিবর্তন ঘটেছিল। সাঁওতালদের এই চরম দুর্ভাগ্যের উপর আবার দামিন-ই-কোহ্‌র সীমান্তে বসবাসকারী জমিদাররা কিছুকাল থেকে সাঁওতালদের জমির উপর লুব্ধ দৃষ্টি রেখেছিল।"[১]

একই বর্ণনা পাওয়া যায় 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায়—

"জমিদার, আরও সঠিকভাবে বললে, গোমস্তা, সরবরাহকারী, পিওন ও মহাজন প্রভৃতি জমিদারী কর্মচারীরা, পুলিস, রাজস্ব আদায়কারী ও আদালতের আমলা-কর্মচারীরা সকলে একসঙ্গে মিলে সাঁওতালদের উপর একটা ভয়ঙ্কর শোষণ, জোর করে সম্পত্তি হস্তগত করা, সাঁওতাল-দের অপমান করা এবং প্রহার ও অন্যান্য প্রকার উৎপীড়নের জাল বিস্তার করেছে। ঋণের সুদ শতকরা পঞ্চাশ টাকা থেকে পাঁচ'শ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে। হাটে-বাজারে সাঁওতালদের ঠকাবার জন্য ভুয়া দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করা হচ্ছে। সাঁওতালদের জমির শস্য নষ্ট করবার জন্য জমিদার ও মহাজনরা গরুর পাল, গাধা ও ঘোড়া, এমন কি হাতী পর্যন্ত জোর করে শস্যক্ষেত্রে নামিয়ে দেয়। এরূপ আইন-বিরুদ্ধ ও অপরাধজনক কার্যকলাপ সাধারণ দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন কি, যে কোন ব্যক্তি শান্তিরক্ষার জন্য সাঁওতালদের দিয়ে 'মুচলেকা' লিখিয়ে নিয়ে যায়; ঋণের শর্ত হিসেবে দাসত্বের 'বণ্ড' লিখিয়ে নেওয়া উৎপীড়নের আর একটি রূপ।"[২]

বহু ইংরাজ লেখক সাঁওতালদের উপর এই অভাবনীয় অত্যাচার-উৎপীড়নের কথা স্বীকার করে গেছেন। জেমস্ ম্যাকফেল্ সাহেব লিখেছেন—

"আর একটি স্বাভাবিক শত্রু হল জমিদার। তালেটাণ্ডির মানুষেরা বা তাদের পিতৃপুরুষেরা তাদের কৃষিজমির প্রতিটি বর্গফুট জঙ্গল থেকে উদ্ধার করেছে, অথচ যে লোক এজন্য কিছুই করেনি, জমি থেকে আদায় করা সমস্ত সুফল তারই কাছে চলে যাবে এটাকে তারা দারুণ

১। কে. কে. দত্ত, 'দি সান্তাল ইনসারেকশন,' পৃ-৫-৬।
২। 'ক্যালকাটা রিভিউ', ১৮৫৬, পৃ-২৪০-২৫১।

অবিচার বলে মনে করত। কোন জরিপ বা মূল্যায়নের ব্যবস্থা ছিল না, এমন কি রসিদ বলেও কিছু ছিল না। যে লোক খাজনা নিত, সে বাড়ি গিয়ে একটা সুতোয় একটা গিঁট বেঁধে রাখত—সেটাই ছিল একমাত্র দলিল। জমিদার প্রায়ই টাকায় চার আনা বেশী নিত। দুর্গাপূজার সময় প্রত্যেক বাড়ি থেকে একটা ছাগল, এক পাত্র ঘি এবং একটা করে টাকা নিত এবং নিজের পরিবারের মধ্যে বিয়ে, শ্রাদ্ধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠান হলে বার্ষিক লেভি আদায় করা হত। বাজার দামের অর্ধেক দিয়ে সাঁওতাল প্রজাদের যে কোন গৃহপালিত পশু নিয়ে নেওয়ার অধিকার তার ছিল এবং এ টাকা পেলে সকলে কৃতার্থ মনে করত। তা ছাড়া জমিদারের চেলা-চামুণ্ডারা প্রায়ই রায়তদের বাড়ি গিয়ে হাজির হত এবং রায়তকে তাদের খাওয়াতে হত।"[১]

ব্যবসায়ীদের কথা লিখতে গিয়ে তিনি বর্ণনা করছেন—

"সাঁওতালরা যখন দলে দলে দামন এলাকায় আসতে আরম্ভ করল, ব্যবসায়ীরাও তাদের অনুসরণ করল এবং দামনের তীরবর্তী সবুজ মাঠে বাস করতে শুরু করল। সাঁওতালদের কাছ থেকে জিনিস কেনার সময় তারা এক ধরণের ওজন ব্যবহার করত আর বিক্রি করার সময় ব্যবহার করত অন্য ধরনের। দু'ধরনের ওজনই ছিল জাল। তারা যে কুনকে ব্যবহার করত, বাইরে থেকে সেটা যতটা গভীর মনে হত আসলে ততটা গভীর হত না এবং সেগুলোর ভেতরের দেওয়াল-গুলো ছিল অনেক পুরু এবং অনুরূপ নানা কায়দায় তারা সাঁওতাল কৃষকদের কষ্টার্জিত ফসলের বেশির ভাগ থেকে বঞ্চিত করত। সাঁওতালরা সর্বদাই অতীতের স্বপ্ন দেখত যখন তাদের জীবনে ছিল শান্তি ; যে জমির তারা ছিল মালিক, নিজেদের শ্রম দিয়ে যাকে তারা সুফলা করে তুলেছে, এবং নিজেদের খুসিমত জঙ্গল কেটে সাফ করতে করতে গোটা জঙ্গলই সাফ করে ফেলেছে। মাঝে মাঝে একটা জাতিত্বের মনোভাব এদের আচ্ছন্ন করে ফেলে আর তখন কেউ এসে এদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ালে বা এদের প্রাচীন সমৃদ্ধির পুর্ণজাগরণের সম্ভাবনা সামনে তুলে ধরলে ওরা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। ১৮৫৫ সালেই সর্বাত্মকভাবে অশান্তি ও অসন্তোষের মনোভাব ছড়িয়ে দিয়ে এই ধরণের একটা আন্দোলন আসন্ন বলে মনে হয়েছিল।"[২]

সাঁওতালদের চরম দুর্দশা ও দুর্ভাগ্যের কথা বর্ণনা করে জুগিয়া হাড়াম বলেছেন—

"আলে দো বুরু দিশোম আলেয়াঃকু' খরচতেগে ওনকো নাওয়া

১। জে. এম. ম্যাকফেল, 'দি স্টোরী অফ দি সান্তাল', পৃ-৫২।

২। পূর্ব পৃষ্ঠায় উল্লেখিত, পৃ-৫৩।

রাজলে টাণ্ডিয়াৎকোওয়া মাহাজনকাতে, আর ওনকো দো খাজনা কো চাপাও ইদিয়াৎলেয়া। মাহাজনকো দো কাটিচ্' কাটিচ্' কো এমালেয়া, আর ঢের অকচ্‌কো হাতাওআ। বছর রেয়াঃক্' চাষ দো ওনকো গেকো ইদি চাবায়েৎতালেয়া আর আলে দো আরহ্ ওনকো ঠেন ধারকাতে দিনলে টালাওআ। যাঁহাঁ তিনাঃক্'লে উসুলা, এনরেহ্ বাং শোধঃক্'আ। বছর রেয়াঃক্' চাযতে বাকো বি লেনখান মিহ্‌-মেরমকো লাগা ইদিকোতালেয়া ; আর অনাতেহ্ বাকো সাড়লেন খান গোলাম লেকা আকো ঠেন মিৎ-বার্ পাইতে এরা-হপনকো খাটাওলেয়া। উনরে হাকিম মা বাকো তাঁহেকান, অকয় ঠেনলে আরদাশ্'আ? তায়মরে দেকো পুলিশ বলয়েনা, মেনখান ওনকো দো আকো জাত রেয়াঃক্' পো'ড্ পয়সাতে আলেয়াঃক্' মামলাকো ডিসমিস্ তালেয়া। আঁডি জালা তাঁহেকানতালেয়া, দিশোম শুধালে কাউলাউএনা।"[১]

অর্থাৎ—

"ঐ নতুন রাজার জন্য আমরা নিজেদের খরচে বন-জঙ্গল পরিষ্কার করলাম আর তারা মহাজন হয়ে আমাদের উপর খাজনা চাপিয়ে দিল। মহাজনরা আমাদের সামান্য দিত এবং অনেক বেশী পরিমাণে নিত। বৎসরের ফসল তারা নিয়ে শেষ করত এবং আমরা আবার তাদের কাছে ঋণ করে দিন চালাতাম। হাজার চেষ্টা করেও ঋণ শোধ হত না। বছরের ফসলে তারা তৃপ্ত না হলে আমাদের গরু-ছাগল নিয়ে যেত ; আর তাতেও সন্তুষ্ট না হলে আমাদের স্ত্রী-পুত্রদের এক-দু পাই মজুরিতে তাদের কাছে চাকর করে খাটাত। সে সময় হাকিম তো ছিল না, কার কাছে আমরা অভিযোগ করব? পরে হিন্দু পুলিসরা এল, কিন্তু তারা স্বজাতির টাকা-পয়সার জোরে আমাদের মামলা ডিসমিস্ করে দিত। ভীষণ কষ্ট আমাদের হচ্ছিল, দেশসুদ্ধ লোক আমরা অস্থির হয়ে উঠলাম।"

শাসকগোষ্ঠী এই মহাজনগোষ্ঠীর হাতে তুলে দিয়েছিল গরীব সাঁওতাল কৃষক ও শ্রমিককে। ধনতান্ত্রিক শোষণ ও বিশেষতঃ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের যুগে মহাজনই ছিল কৃষকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ও গ্রামের সর্বেসর্বা। ব্রিটিশ শাসনে ফসলের পরিবর্তে নগদ অর্থে রাজস্ব দেওয়ার নিয়ম থাকায় এই মহাজন-শ্রেণীর দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া সাঁওতাল কৃষকের অন্য কোন উপায় থাকত না। মহাজনরাও চড়া সুদে টাকা ঋণ দিয়ে সাঁওতাল কৃষকের শ্রমের ফসল ও সম্পত্তি হস্তগত করত। কারণ নতুন ইংরাজ সরকারের আইনে ঋণগ্রস্ত কৃষকের সম্পত্তি ক্রোক করবার ব্যবস্থা ছিল। সাঁওতাল কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করে হাণ্টার সাহেব লিখেছেন—

১। 'হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃক্. কাথা', পৃ-২৪০।

"যে মুহূর্তে কোন সাঁওতাল, জমিদার বা মহাজনের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করত সে মুহূর্ত থেকেই সেই হতভাগ্য সাঁওতাল, জমিদার-মহাজনের শোষণ-জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ত। সমস্ত বৎসর সে যতই পরিশ্রম করুক না কেন, জমিদার বা মহাজন তার সমস্ত ফসলই নিজের গোলায় তুলত। বৎসরের পর বৎসর এভাবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সাঁওতালটি তার শোষকের জন্য খেটে মরত। যদি কখনও সে অতিষ্ঠ হয়ে জঙ্গলে পালাবার চেষ্টা করত, তখনই পূর্বে কোন রকম সতর্ক না করেই পেয়াদা ও পাইক এসে দরিদ্র সাঁওতালের গরু-মহিষ, বাসন-কোসন ও অন্যান্য গৃহস্থালির জিনিসপত্র লুঠ করে নিয়ে যেত। এমন কি স্ত্রীলোকের সম্মানের চিহ্ন লোহার বালাও বাদ যেত না। স্ত্রীলোকের হাত থেকে সেগুলি জোর করে কেড়ে নেওয়া হত।"[১]

সবচেয়ে হৃদয়হীন আচরণ করা হত সাঁওতাল শ্রমিকের উপর। সামান্য ঋণ শোধ করতে না পারলে সাঁওতাল শ্রমিক আজীবনের জন্য মহাজন বা জমিদারের ক্রীতদাস হয়ে যেত। তার জন্য বরাদ্দ হত এক টুকরো কাপড় ও এক মুঠো অন্ন। মরলেও তার ঋণ পরিশোধ হত না, তার ছেলেপিলেদের ক্রীতদাস হয়ে ঋণ শোধ দিতে হত। পালাবার জো ছিল না, আদালতে নালিশ হলেই পরওয়ানা বের হত ; সাঁওতালটিকে তখন জেল খাটতে হত। এ সম্বন্ধে হাণ্টার সাহেব আবার লিখেছেন—

"অধিকাংশ সাঁওতালেরই সামান্য ঋণ পরিশোধ করবার মত জমি ও ফসল থাকত না। কোন সাঁওতালের পিতার মৃত্যু হলে মৃতদেহ সৎকারের জন্য সেই সাঁওতালকে হিন্দু জমিদার বা মহাজনের কাছ থেকে কিছু টাকা ঋণ করতে হত। কিন্তু ঋণের জামিন রাখবার মত জমি বা ফসল না থাকায় সেই সাঁওতালটিকে লিখে দিতে বাধ্য করা হত যে, ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত সে তার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার জমিদার ও মহাজনের দাস হয়ে থাকবে। এ কথা লিখে দেবার পরদিনই সাঁওতালটিকে সপরিবারে জমিদার বা মহাজনের গোলামী করতে যেতে হত। অবশ্য এ জীবনে তার ঋণ শোধ হত না। কারণ, শতকরা তেত্রিশ টাকা চক্রবৃদ্ধিহার সুদের ঋণ কয়েক বৎসরের মধ্যেই দশগুণ হয়ে উঠত এবং মৃত্যুর সময় সাঁওতালটি তার বংশধরের জন্য রেখে যেতে কেবল পর্বত প্রমাণ ঋণের বোঝা। যদি কোন ক্রীতদাস সাঁওতাল কখনও তার প্রভুর জন্য সমস্ত সময় কাজ করতে অস্বীকার করত, তাহলে মহাজন তার আহার বন্ধ করে ও জেলের ভয় দেখিয়ে সাঁওতালটিকে বশে আনত।"[২]

১। ডব্লু. ডব্লু. হাণ্টার, 'দি অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল,' পৃ-২৩০।

২। ঐ বই পৃ-২৩৩।

আশ্চর্য লাগে যে, 'সভ্য' ইংরাজ শাসনেও এরকম জঘন্য নিয়ম এ অঞ্চলে চালু ছিল এবং বৃটিশ আইনের ব্যবস্থা থেকে মহাজন এ ধরনের কাজে পুলিস ও আইনের সক্রিয় সমর্থন লাভ করত। এই নিষ্ঠুর উৎপীড়ন থেকে রক্ষা পাবার কোন উপায় ছিল না। তাই এক ইংরাজ লেখক এ সমস্ত হতভাগ্য সাঁওতালদের সম্বন্ধে লিখে গেছেন—

> "এরা জানে না যে এদের দাসত্ব বে-আইনী এবং যদি তারা জানেও, তা হলেও এদের অনেকেই তা থেকে মুক্তি চাইবে না। এরা জানে যে, যতদিন তারা গোলাম থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের মালিকদের স্বার্থেই তাদের বাঁচিয়ে রাখা হবে। এদের জাগতিক উচ্চাকাঙ্খার এই ছিল চরমসীমা।"[১]

হিন্দু জমিদাররাও সাঁওতাল গ্রামগুলি মহাজনদের কাছে ইজারা দিয়েছিল, ফলে সাঁওতালদের মধ্যে অসন্তোষের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল। শ্রীখণ্ডের (তিন-পাহাড়ের কাছে) সহকারী কমিশনার মিস্টার টেলর ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী ডেপুটি কমিশনার মিঃ থম্পসনকে জানিয়েছিলেন যে, মহেশপুর ও পাকুড়ের রাজারা সাঁওতাল গ্রামগুলি মহাজনদের কাছে ইজারা দেওয়ায় সাঁওতালরা ঐ রাজাদের উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে।[২] চতুর মহাজনরা চাষের ভাল ভাল জমি দখল করেছিল। আর সাঁওতালরা অনুর্বর জমিতে প্রাণপণে চাষ করেও বছরের খোরাক যোগাতে পারছিল না। বাধ্য হয়ে তারা মহাজনদের কাছে অল্প মজুরিতে পরিশ্রম করতে যেত, কখনও বা নিজস্ব লাঙ্গল নিয়ে মহাজনদের জমি চাষ করে আসত। এভাবে পরিশ্রম করতে করতে সাঁওতাল-দের মনের কোণে ক্ষোভ জমে উঠেছিল।

তার ওপর, রেলপথে যে সমস্ত ইংরাজ কর্মচারী নিযুক্ত ছিল, তারাও সাঁওতালদের উপর অত্যাচার শুরু করেছিল। তারা সাঁওতালদের বাড়ি থেকে জোর করে বিনামূল্যে ছাগল, মুরগী প্রভৃতি কেড়ে নিয়ে যেত। তাদের লোভ এতদূর পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল যে তারা সাঁওতাল স্ত্রীলোকের উপরও নজর দিয়েছিল। 'ক্যালকাটা রিভিউ'তে পাওয়া যায়—

> "রেলপথে যে সমস্ত ইংরাজ কর্মচারী কাজ করত, তারা বিনা-মূল্যে সাঁওতাল আদিবাসীদের কাছ থেকে জোর করে ছাগল, মুরগী প্রভৃতি কেড়ে নিয়ে যেত এবং সাঁওতালরা প্রতিবাদ করলে তাদের উপর অত্যাচার করত। দুজন সাঁওতাল স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার ও একজন সাঁওতালকে হত্যা করাও হয়েছিল।"[৩]

১। জে. এম. ম্যাকফেল, 'দি স্টোরী অফ্ দি সান্তাল', পৃ-৫০।
২। রেকর্ড রুম অফ দি ডেপুটি কমিশনার অফ্ সান্তাল পরগনা।
৩। 'ক্যালকাটা রিভিউ,' ১৮৫৬।

এসব বিবরণ থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, ইংরাজ-শাসনের মহিমায় জমিদার, নায়েব, গোমস্তা, পেয়াদা, মহাজন, পুলিস, আমলা, এমন কি ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত সকলে একসঙ্গে মিলে নিরীহ ও দরিদ্র সাঁওতালদের উপর নিদারুণ অত্যাচার-উৎপীড়ন চালিয়েছিল। এরাই ছিল বিদেশী ইংরাজ শাসকের ভারত শোষণের খুঁটি। এই বিরাট শোষণ-যন্ত্রের নীচে পড়ে সাঁওতাল সমাজ ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়ছিল।

আট

ইংরাজরাজের মারাত্মক পেষণযন্ত্রের নীচে পড়ে তিলে তিলে মারা পড়েছিল সরল শান্তিপ্রিয় সাঁওতালরা। অসহনীয় শোষণ-উৎপীড়নের হাত থেকে রক্ষা পাবার কোন উপায় ছিল না। মাঝে মাঝে তারা শুধু চিৎকার করে বলত: 'ঈশ্বর মহান, কিন্তু তিনি থাকেন বহু—বহু দূরে! আমাদের রক্ষা করবার কেউ নেই।'[১] এই অবস্থায় কয়েকটা ঘটনায় সাঁওতালদের মনের মধ্যে বিদ্রোহের চাপা আগুন ধীরে ধীরে জ্বলতে শুরু করল।

১৮৫৪ সালের প্রথম দিকে লছিমপুরের পরগনাইৎ বীরসিং মাঁঝি গ্রামের সাঁওতালদের নিয়ে একটা দল তৈরি করেছিল। কিছুদিন পরেই তাদের দলে যোগ দিয়েছিল বোরিওর বীরসিং মাঁঝি, সিন্দ্রির কাওলে পারানিক্, হাটবান্দার ডমন মাঁঝি প্রভৃতি অনেকে। এ সময় লিটিপাড়ার ইশ্বরি ভকত ও তিলক ভকত, বাগসীসার জিতু কলু এবং দরিয়াপুরের আরো কয়েকটি ধনী মহাজনের বাড়িতে ডাকাতি হয়। মহাজন-ব্যবসায়ীর দল এমনিতেই সব সময় সন্ত্রস্ত থাকত। তারা এ সমস্ত সাঁওতালদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দিঘি থানার দারোগা মহেশলাল দত্তের কাছে আবেদন জানাল। কিন্তু দারোগা তাদের কথায় কর্ণপাত না করায় তারা দলবদ্ধ হয়ে পাকুড়ের (অম্বর পরগনা) জমিদার রানী ক্ষেমাসুন্দরীর কাছে আবেদন করল। মহাজনদের বাড়িতে ডাকাতি করার অভিযোগ কতখানি সত্য, এ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত করে এক ইংরাজ পরবর্তীকালে লিখেছেন:—

> "সাঁওতালরা ছিল একটি পৃথক জাতি; বাঙ্গালীর থেকে তারা সম্পূর্ণ আলাদা। কোন জাত-পাতের পার্থক্য তাদের মধ্যে ছিল না। বংলাদেশে যে সামান্য কটি অপরাধপ্রবণ জাতি ছিল, তাদের মতো দুর্নীতি পরায়ণতা, ছলচাতুরী ও অপরাধমূলক কার্যের বিভিন্ন পদ্ধতি তারা জানত না; সততা, শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা নির্বাহ, ভদ্র ব্যবহার ও চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য তাদের প্রসিদ্ধি ছিল। সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাবে একটি পূর্ণ ও প্রশংসাসূচক সমীক্ষা ছিল, যাহা এই জাতি সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চ প্রশংসিত মূল্যায়ন। তাহলে, যে জাতির কাছে ডাকাতি দূরের কথা চৌর্যবৃত্তিও অজ্ঞাত ছিল তাদের চরিত্র হঠাৎ কী করে বদলে গেল এবং মাত্র দু একটি নয় ধারাবাহিকভাবে ডাকাতি বা দলগতভাবে রাহাজানি করে খোলাখুলি সন্ত্রাস সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে কি করে সম্ভব হল? জেলা জজের এবং সদর আদালতের ছাপানো রায়ে খুব পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে যে, মহাজনদের অত্যাচারই বিরোধের আসল কারণ এবং এ ব্যাপারে

১। 'ক্যালকাটা রিভিউ', ১৮৫৬

> সন্দেহের কোন কারণই থাকতে পারে না যে, এদের অপরাধের বিশেষ চরিত্র রায়ের মধ্য দিয়ে এবং এদের শাস্তিদানের মধ্য দিয়ে স্বীকৃত হওয়া উচিত ছিল। জেলাশাসক কমিশনারের কাছে এটাই স্পষ্টভাবে লিখেছেন এবং কমিশনার আবার সরকারের কাছে ঠিক এইভাবেই রিপোর্ট পাঠিয়েছেন।"[১]

যাহোক, সে সময় পাকুড় রাজ এস্টেটের দেওয়ান ছিলেন জগবন্ধু রায়। তিনি জমিদারির অন্তর্গত সাঁওতাল মহলের নায়েব-মহাজনদের সঙ্গে যুক্তি করে বীরসিং মাঁঝিকে কাছারি-বাড়িতে ডেকে পাঠালেন এবং মোটা টাকা জরিমানা করলেন। বীরসিং মাঁঝি নিজেকে নির্দোষ বলে টাকা জরিমানা দিতে অস্বীকার করল। ফলে, তিনি তার অনুচরদের সামনে তাকে নির্দয়ভাবে জুতো পেটা করলেন। এ ঘটনায় বীরসিং মাঁঝির দল ক্ষিপ্ত হয়ে বড় বড় মহাজনদের বাড়ি লুঠ করতে লাগল। কুসমা গ্রামের এক ধনী মহাজনের বাড়ি আক্রমণ করা হল। মহাজনের নিযুক্ত পাহাড়িয়া তীরন্দাজরা পালিয়ে গেলে মহাজনের বাড়ি ও সেই সঙ্গে আরো কয়েক জনের বাড়ি লুঠ হল। সাঁওতাল মহলের নায়েব তখন ভীষণ ভয় পেয়ে কাছারি-বাড়ি রক্ষার জন্য বহুসংখ্যক পাঠান লাঠিয়াল ও পাহাড়িয়া তীরন্দাজ নিযুক্ত করলেন।

এবার মহেশ দারোগার উপর কর্তৃপক্ষের নির্দেশ এল সাঁওতালদের দমন করার জন্য। তিনি একদল পুলিস নিয়ে সাঁওতালদের গ্রেপ্তার করতে এলেন। সাঁওতাল মহলে সে সময় গোচ্চো নামে একজন ধনী সাঁওতাল বাস করতেন। মহাজনরা বহু চেষ্টা করেও তাঁর ধন-সম্পদ হস্তগত করতে পারেনি। মহাজনদের পরামর্শে লুণ্ঠন ও ডাকাতির অভিযোগে নির্দোষী গোচ্চোকে গেপ্তার করে নির্মমভাবে বেঁধে চাবুক মারা হল। এভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে সেদিন গোচ্চো চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন—"আমি দেখতে চাই, এই শয়তান দারোগাটা সাঁওতাল পরগনায় সমস্ত শান্তিকামী সাঁওতালকে বাঁধবার মত দড়ি কোথায় পায়!" শেষ পর্যন্ত প্রমাণের অভাবে দারোগা তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন; কিন্তু এ ঘটনা সমস্ত সাঁওতাল মহলে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করল।

অল্পদিন পরে আর একটি ঘটনা ঘটল। লিটিপাড়া গ্রামের বিজয় মাঁঝি ছিল সৎলোক। অভাবের সময় সে আমড়াপাড়ার কেনারাম ভকতের কাছ থেকে বারো ঝুড়ি ধান ঋণ নিয়েছিল। একশ' ঝুড়ি ধান দেনা ও ঋণের জন্য সে কেনারামকে দিয়েছিল। এর পর কেনারাম পুনরায় যখন দেনা আদায় করতে এল, বিজয় মাঁঝি দেনা শোধ হয়ে গিয়েছে বলে তাকে তাড়িয়ে দিল। সে বৎসর ফসল খুব ভাল হল। কেনারাম ভকত তার হিন্দুস্থানী বরকন্দাজ ও লাঠিয়াল নিয়ে বিজয় মাঁঝির দুয়ারে উপস্থিত হল। এবার কিন্তু সঙ্গে আর একজন চাপরাসী—মাথায় লাল পাগড়ি ও বুকে লাল ফিতা বাঁধা একটা চাপরাস। চাপরাসী বিজয় মাঁঝির গরু-মহিষ, ধন-সম্পত্তি ক্রোক করার

১। 'ক্যালকাটা রিভিউ', ১৮৫৬, পৃ-২৫৫।

পরওয়ানা কাগজ বের করল। চাপরাসী জঙ্গিপুরের মুনসেফের লোক। সম্পত্তি ক্রোক করা নিয়ে বিজয় মাঁঝির সঙ্গে চাপরাসীর কথা কাটাকাটি শুরু হল। ইতিমধ্যে কেনারাম চাপরাসীকে বলল যে, ক্রোক পরওয়ানা অনুসারে বিজয় মাঁঝির গরু-মহিষ সনাক্ত করা হয়েছে এবং সেগুলি ক্রোক করা যেতে পারে। বিজয় মাঁঝিই বা এত সহজে তার সম্পত্তি ক্রোক করতে দেবে কেন? বিজয় মাঁঝি বাধা দিতে গেল। তারপরই ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি। এদিকে গ্রামের মধ্যে রটে গেছে সমস্ত ব্যাপারটা, লোকজন আসতে শুরু করেছে, তাই আর ব্যাপারটা সেদিন বেশিদূর গড়াল না, এ পর্যন্তই ঘটল। কেনারামের দল ফিরে গেল।

দু'সপ্তাহ পরেই মহেশ দারোগার আবির্ভাব হল গ্রামে, সঙ্গে সেই চাপরাসী ও কেনারাম ভকত। চাপরাসীকে আঘাত করা ও সরকারী কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে মহেশলাল দারোগার লোকজন বিজয় মাঁঝিকে ধরে দড়ি দিয়ে বাঁধল। খবর শুনেই গ্রামের লোক তাদের মাঁঝিকে জোর করে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য হাজির হল, কিন্তু মহেশ দারোগার চোখ রাঙানো কথায় কেউ আর এগুতে সাহস করল না। বিজয় মাঁঝির স্ত্রী-পুত্র দারোগার পায়ে পড়ে বিজয় মাঁঝিকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ করল, কিন্তু কোন ফল হল না। মহেশ দারোগার লোক "সরকার বাহাদুরের জয়" এবং কেনারামের লোক "কেনারামের জয়" ধ্বনি দিতে দিতে রাস্তার ধুলো উড়িয়ে বিজয় মাঁঝিকে নিয়ে অদৃশ্য হল।

বিজয় মাঁঝিকে ভাগলপুরে আনা হল। ভাগলপুর জেলে বন্ধ হয়ে শারীরিক ও মানসিক কষ্টে বিনা বিচারে বিজয় মাঁঝি মারা গেল।

আমগাছিয়ার মাঁঝিকেও একই ফাঁদে ফেলা হল। কেনারাম ভকত একদিন পেয়াদা নিয়ে গর্ভু মাঁঝির গরু-মহিষ ক্রোক করতে এল, কিন্তু গর্ভু মাঁঝি তাদের তাড়িয়ে দেওয়ায় কেনারাম ভকত মহেশ দারোগাকে সঙ্গে নিয়ে এল। অভিযোগ একই, যে সরকারী পেয়াদাকে মারা হয়েছে সুতরাং তারা গর্ভু মাঝিকে বেঁধে নিয়ে যাবে ও জেলে দেবে। জেলে যাওয়া মানেই মৃত্যু। কোন উপায় না দেখে গর্ভু মাঁঝি দারোগাকে একটা গরু, পেয়াদাকে একটা বাছুর এবং বরকন্দাজদের কিছু কিছু টাকা দিতে বাধ্য হল। এ টাকা কেনারামই ঋণ দিল, কিন্তু তার বদলে কেনারামের দেওয়া কাগজে টিপ সই দিতে হল। তারপর থেকেই গর্ভু মাঁঝি কেনারামের ক্রীতদাস।

এ ভাবে, জমিদার, নায়েব, গোমস্তা, পেয়াদা, মহাজন আর ইংরাজ সরকারের পুলিস, আমলা সকলেই সাঁওতালদের উপর অত্যাচার চালাত। এ অত্যাচার বন্ধ করার কোন উপায় ছিল না। হাণ্টার সাহেব লিখেছেন—

> "ইংরাজ বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটরা রাজস্ব আদায়েই এরূপ মত্ত থাকতেন যে, এ সমস্ত ছোট ছোট বিষয়ে মনোনিবেশ করবার মত সময়

তাঁদের থাকত না। দেশীয় আমলারা ছিল জমিদার-মহাজনদের হাতের পুতুল, আর পুলিস পেত লুটের অংশ।"[১]

ইংরাজ লেখক কিন্তু সাঁওতালদের এই দুঃখ-দুর্দশার জন্য কোথাও ইংরাজ শাসনব্যবস্থাকে দায়ী করেন নি, কিংবা শাসনব্যবস্থার দুর্বলতার কথাও বলেন নি। তিনি সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিয়েছেন জমিদার ও মহাজন-গোষ্ঠীর ওপর। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী নিজেদের কায়েমী স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ভারতের গ্রাম-সমাজকে ধ্বংস করে জমিদার-মহাজনশ্রেণী সৃষ্টি করেছিল। শাসকশ্রেণী একদিকে যেমন কৃষি-জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে জমিকে ক্রয়-বিক্রয়ের সামগ্রী করেছিল, অন্যদিকে তেমনই ইংলণ্ডের ভূস্বামীগোষ্ঠীর অনুকরণে ভারতে ইংরাজ শাসনের সুদৃঢ় স্তম্ভরূপে এই ভূস্বামীগোষ্ঠীকে তৈরি করেছিল। তাই, কার্ল মার্কস ভারতের এই ভূমিব্যবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—

> "পৃথিবীর সমস্ত জাতির ইতিহাসের মধ্যে একমাত্র ভারতের ইংরাজ শাসনের ইতিহাসই অর্থনীতির ক্ষেত্রে ক্রমাগত নিষ্ফল ও সম্পূর্ণ অবাস্তব (প্রকৃতপক্ষে শয়তানী) পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইতিহাস। তারা বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ভূমি-ব্যবস্থার এক অদ্ভুত প্রহসন সৃষ্টি করেছে; দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে ছোট ছোট জমির বণ্টন-নীতির হাস্যকর বিকৃতি ঘটিয়েছে; আর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে জমির উপর যৌথ-অধিকারমূলক গ্রাম-সমাজকে তার এক ব্যঙ্গাত্মক বিকৃতিতে রূপান্তরিত করেছে।"[২]

এ ব্যবস্থাই সাঁওতাল কৃষককে জমিদার-মহাজনের শোষণের শিকারে পরিণত করেছিল। সাঁওতালদের দেখাশুনা করার জন্য যে একজনমাত্র ইংরাজ কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছিলেন, তিনি রাজস্ব আদায়ের কাজ সম্পন্ন করতে পারলেই কৃতার্থ মনে করতেন। সাঁওতালদের অবস্থা অনুসন্ধান করবার চেষ্টা তিনি কখনও করেননি। ম্যাকফেল্ সাহেবের লেখা থেকে জানতে পারা যায়—

> "এটা স্বীকার করতেই হবে যে সরকার সাধারণভাবে সাঁওতাল অঞ্চলের ঘটনাবলী সম্পর্কে অন্যায়ভাবে অজ্ঞ ছিলেন। এতখানি জঙ্গল পরিষ্কার করে জমি যে উদ্ধার করা হয়েছে এবং অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই দামনের রাজস্ব ঘাটতি থেকে বাড়তে বাড়তে ৮০,০০০ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে সেটা সাঁওতালদের পক্ষে আত্মশ্লাঘার বিষয়। সেই টুকুতেই যেন তাদের পাওনা শেষ হয়ে গেছে।"[৩]

হাণ্টার সাহেবের বিবরণেও পাওয়া যায়—

> "সাঁওতাল এলাকার শাসন-ব্যবস্থায় যে সকল কাজে ব্যয় আছে কিন্তু

১। ডব্লু, ডব্লু হাণ্টার, 'দি অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল', পৃ-২৩০।
২। কার্ল মার্কস, 'ক্যাপিটাল', তৃতীয় খণ্ড, পৃ-৩২৮।
৩। জে. এম. ম্যাকফেল, 'দি স্টোরী অফ্ দি সান্তাল', পৃ-৫৩-৫৪।

আর নেই, সে সকল কাজ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলা হত। সাঁওতাল আদিবাসী সম্বন্ধীয় কোন জ্ঞান লাভের জন্য একটি পয়সাও ব্যয় করা হয়নি। সুপারিনটেনডেণ্ট ছিলেন কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষ, তিনি তাঁর কর্তব্য (রাজস্ব আদায়) ছাড়া আর কিছুই করতেন না। সুতরাং দেখা গেল ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা শান্ত প্রদেশটিতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে। সে জায়গায় এমন কেউ ছিল না যে পূর্বে সতর্ক করে দিতে বা প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়ে দিতে পারে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চারদিকের বেষ্টনীর মধ্যে বসবাসকারী সাঁওতালদের হয় হিন্দু সুদখোরদের ভূমিদাস হয়ে জীবনযাপন করা নতুবা যে অনুর্বর ও অত্যধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত স্থান থেকে তারা এ অঞ্চলে এসেছিল সেই পূর্বস্থানে ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনটি গ্রামের সাঁওতালরা দ্বিতীয় পন্থাই গ্রহণ করেছিল এবং তারা তাদের নিজেদের পরিষ্কার করা অঞ্চল ত্যাগ করে হতাশ হয়ে জঙ্গলে পলায়ন করেছিল। কিন্তু অধিকাংশই বন-জঙ্গলে পলায়ন করে সে-স্থানে সপরিবারে উপবাস করার চেয়ে অর্ধদাস বা ভূমিদাস হয়ে পরিষ্কার অঞ্চলে বাস করাই স্থির করেছিল।"[১]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাঁওতালরা আর সহ্য করতে পারে না। তাদের বুকের ভিতরে কি যেন গর্জাতে থাকে। মহাজন-সুদখোরদের জুলুম কি ভাবে বন্ধ করা যায়, তা আলোচনার জন্য তারা গ্রামের মাঝিদের কাছে হাজির হয়। রাত্রে গোপনে গোপনে নানা জায়গায় বৈঠক বসে। চারদিকে কানা-ঘুসাও শোনা যায় যে, দামিন-ই-কোহ্‌তে একটা কিছু ঘটতে পারে।

১। হাণ্টার, 'অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল', পরিশিষ্ট, ৫ম খণ্ড এর সন্ধানুসারে উদ্ধৃত, 'সান্তাল রিবেলিয়ন ১৮৫৫'।

নয়

শাসন ও শোষণে জর্জরিত সাঁওতালদের চোখ-মুখের চাউনি পাল্টে যেতে লাগল দিনের পর দিন। নানারকম গুজব রটল সাঁওতালদের গ্রামগুলিতে। জুগিয়া হাড়াম বলেছেন—

"পাহিল দো লাগ লাগিন বিঞ দারাকিন কানা, হড় কিন উংকোওয়া। ওনা বেদ গুচাও লাগিৎ মঁড়ে আতোরেন জার্‌ওয়াকাতে এটাঃক্‌' মঁড়ে আতোকো দাঁড়ায়েয়া মিৎ ঞিদা মতরে, আঁড়ি নেও ধরমকাতে। আলেয়াঃক্‌' আতোরেন অড়াঃক্‌' অড়াঃক্‌' মিৎ হড় কাতেকো হেচ্‌'লেনা। মাঁঝি ছাট্‌কারেকো এনেচ্‌' আচুরকেৎআ টামাক রুইতে। ডাণ্ডারে টট্‌কো, ঘাণ্টকো তল্‌ আকাৎআ। হিলাউঃক্‌' হিলাউঃক্‌'তে ওনা দো আঁড়ি বাঁড়িচ্‌' সাডেয়েনা। বার্‌য়া ডাঙ্গুয়া কড়াকিন পৈতা আকাওয়ানা, আর বার্‌য়া হপন হপন সিন্দুর আকাওয়াৎ নাহেল, নিম আর সিঞ্জো রেয়াঃক্‌'কিন আঃক্‌'সেন কানা মিৎটেচ্‌' ডালিচ্‌'রে ভরাওকাতে। আকোওয়াঃক্‌' মঁড়ে আতো দাঁড়াঁ পুরাওকাতে মুচাৎ আতো টাঁণ্ডিরে আলে মঁড়ে আতোরেনকো জারওয়াকেৎলেয়া। অণ্ডে দো লাগ লাগিন এঞ্‌তুমতে সিঞ্জো সাকাম, আদ্‌ওয়া চাওলে আর সুনুম সিন্দুরকো বঙ্গাকেৎআ। ওনাকাতে হেচ; ইদিঃক্‌'কান সেরেঞকো চেং ওটোআংলেয়া, আদো আলেরেন বার্‌য়া ডাঙ্গুয়া কড়া পৈতা হরঃক্‌'কাতে আর নাহেলকিন চাল ওটোয়াংকিনতে আকো আকোওয়াঃক্‌' অড়াঃক্‌'তেকো চালাওএনা। খানগে আলে হঁ ওনকো লেকা মঁড়ে আতোলে দাঁড়ায়েয়া।"[১]

অর্থাৎ—

"প্রথমতঃ, নাগনাগিনী আসছে মানুষ গিলবার জন্য। এ বিপদ কাটাবার জন্য পাঁচ গ্রামের লোক জমায়েত হয়ে আর পাঁচ গ্রামে যেত, এক রাত ভক্তিভরে দেবতার আরাধনা করত। আমাদের গ্রামে প্রতি বাড়িতে একজন করে তারা এসেছিল। গ্রামের মাঝির উঠানে ঘুরে ঘুরে নাগরা বাজিয়ে তারা নাচ শুরু করল। তাদের কোমরে ঘুঙুর ও ছোট ঘণ্টা বাঁধা, নাচবার সময় সেগুলি খুব জোরে শব্দ হচ্ছিল। দুটি অবিবাহিত ছেলে পৈতা পরে, একটি ডালাতে নিম ও বেলকাঠের দুটি ছোট সিন্দুর মাখানো লাঙ্গল নিয়ে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। পাঁচটি গ্রাম ঘুরে শেষ করে তারা শেষের গ্রামের এক ফাঁকা মাঠে আমাদের ডেকে জড় করল। সেখানে বেলপাতা, আতপ চাল ও সিন্দুর দিয়ে নাগনাগিনীর নামে পুজা করল। এ সমস্ত করে তাদের গানগুলি আমাদের শিখিয়ে দিল। তারপর আমাদের দুটি অবিবাহিত

১। 'হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াক্‌' কাথা', পৃ-২৪০।

ছেলেকে পৈতা পরিয়ে লাঙ্গল দুটি দিয়ে তারা যে যার বাড়িতে ফিরে গেল। আমরাও তাদের মত পাঁচটি গ্রামে ঐভাবে ঘুরে বেড়ালাম।"

জুগিয়া হাড়াম আরো লিখেছেন—

"ওনাকাতে আরহ° মিৎটেচ্'কো উনান:কেৎআ বাংমা, মিৎ বারাবারিকো গিদরা আকাওয়ান মাইজুকো সাইহাকো পাতাওমা বাবার হড় কাতে। কিচ্‌রিচ্‌কো এপেমা, আরকো জম এঞুয়আ। চেৎ ইয়াতে চং। জানিচ্' জতকো পেড়াঃক"তে মিৎ মন তাহেনতাকো, যাঁহাঁ লেকাতে হুল যাঁহানলেন খান আলকো চুপ্‌গালিঃক্' আর যাঁহান কাথা হোয়লেনরেহ° ওকোন বাড়ে তাহেন।

এনে বার্ উফার হোয়এনা। আরহ° মিৎ গটেচ্' উডাওএনা কাথায়, মিৎটেন বিত্‌কিল দারায়কানা। যাঁহাঁয় ছাট্‌কারে ঘাঁস এ এাম, অ্‌ডেগে আঁতিএঞকাতেয় বুরুমা। ওনা অড়াঃক্'রেন হড় আটরীকো গচ্' চাবাঃক্' ধাঁবিচ্' বায় বেরেৎআ। ওনা বতরতে গোটা দিশম কুল্‌হিকো লাঃক্'কেৎআ। আদো ডোমকো রেয়াঃক্' উফার জানামলেনা, বাংমা গাঙ নাইরে সোনা লাউকা উনুমেনা, ওনাতে জত ডোমকো মাঃক্' গচ্'কোওয়া। ডোমকো দো ওনা বতরতে বির্ জেল লেকাকো এঞর্ বাড়ায়কান তাঁহেকানা, হড় লেকাকো সাজলেনা, আর হড় অড়াঃক্' রেকো তাহেনা।

খান্‌গে উফারেনা, বাংমা, লায়ো গাড়রে ডাঙ্গুয়া কুড়িরে সুবাই জানামেনা, জত হড় অ্‌ডে সেন্দরা লাগিৎকো চালাঃক্'মা। লায়ো গাড় দো হাজারীবাগ খন চেতান। আদোম হড় দোকো সেনলেনা, সুবা হ°কো এঞলকেদেয়া, আর উনি তুলুচ্' কাঞ্চন বির্ হ°কো সেন্দরাকেৎআ। গচ্'কেৎকো জেল্ দো মিৎ ঠেন জার্-ওয়াকাতেকো গেৎকেৎকোওয়া। আর হড় দো জোড়ো হাতাও লাগিৎ হেড়ো হোড়ো মিমিৎ গটেচ্ সাকামকো ইদিয়ানা। ওনাকো সাকামকো লেখাকেৎআ; এঞলকেৎআকো তিনাঃক্' হাজার দিশম হড়কো জার্‌ওয়া আকানা। সুবা দো জত খরচ্ এ এমকেৎআ।"[১]

অর্থাৎ—

"এর পর আরো একটি গুজব রটল যেমন এক ছেলের মায়েরা সই পাতায়। কাপড় দেওয়া-নেওয়া ও খাওয়া-দাওয়া হত। কি কারণে যাহোক! হয়তো আত্মীয়তার বন্ধনে পড়ে যেন সবাই এক হয়। কোন রকম বিদ্রোহ ঘটলে পরস্পরের নামে যেন কেউ কথা না লাগায় এবং কোন কথাবার্তা হলেও তা যেন গোপন থাকে।

এ দুটি গুজবের পর আর একটি গুজব রটল যে, একটা মহিষ আসছে। যার বাড়ির উঠানে ঘাস দেখতে পাবে সেখানে চরে বসবে।

১। 'হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃক্' কাথা,' পৃ-২৪১।

সে বাড়ির লোক মরে শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে উঠবে না। এই ভয়ে সবাই রাস্তাঘাট পরিষ্কার করল।

ডোমদের সম্বন্ধে এক গুজব রটল যে, কোন এক ডোমের ছোঁয়া লেগে গঙ্গা নদীতে সোনা বোঝাই নৌকা ডুবে গেছে। সেজন্য সমস্ত ডোমকে হত্যা করে শেষ করা হবে। ডোমরা ভয়ে বনের শিকারী পশুদের মত পালাতে লাগল। সাঁওতালদের মত তারা পোশাক পরত আর সাঁওতাল বাড়িতে থাকত।

আরো রটল যে, লায়ো গড়ে এক কুমারী মেয়ের গর্ভে নেতা জন্মগ্রহণ করেছেন, সমস্ত সাঁওতালরা যেন সেখানে শিকারের জন্য যায়। হাজারীবাগের উত্তরে লায়ো গড়। কিছু লোক গেছল এবং নেতাকে দেখল, তাঁর সঙ্গে কাঞ্চন জঙ্গলে শিকার করাও হল। শিকার করা জীবজন্তুর মাংস কেটে এক জায়গায় রাখা হল। প্রত্যেকেই ভাগ নেওয়ার জন্য একটি করে পাতা নিয়ে এল। সমস্ত পাতা গুণে দেখা হল যে কত হাজার লোক জমায়েত হয়েছে। সমস্ত খরচ ঐ নেতা দিলেন।"

শেষে তিনি বলেছেন—

'ইনাকাতে উনানএনা বাংমা চেলে চো দারাকো কান দেকো হপন গচ্'কো লাগিৎ। আপে দো কুল্হি মুচাৎরে মিৎটেচ্' ডাঙরা হার্তা আর মিৎ জোড় তিরিয়ো আকায়পে, যাঁহা লেকাতেকো বাডায় হড় কানাপে মেন্তে, বাংখান আপে স্থধাগেকো মাঃক্'পেয়া। ওনা খতরতে আতো আতোলে আকাকেৎআ।"[১]

অর্থাৎ—

"এর পর রটল যে, কে একজন দেকোদের মারবার জন্য আসছে। তোমরা রাস্তার মোড়ে একটা গরুর চামড়া ও এক জোড়া বাঁশী টাঙ্গিয়ে রাখবে যেন তিনি বুঝতে পারেন যে তোমরা সাঁওতাল, না হলে তোমাদেরও সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হবে। ভয়ে আমরা গ্রামে গ্রামে তা টাঙ্গিয়ে দিলাম।"

ছটরায় দেশমাঁঝিও সমস্ত গুজবের কথা উল্লেখ করে গেছেন। রাস্তার মোড়ে মোড়ে সাঁওতালরা ঝাণ্ডা পুঁতে, ঘণ্টা, ভাঙ্গা কুলো ও ঝাঁটা ঝুলিয়ে দিল। আস্তে আস্তে ঝড় উঠতে লাগল। সাঁওতাল এলাকাগুলিতে নানারকম গান শোনা গেল। গ্রামের প্রান্তে, নদীর ধারে, জঙ্গলের অন্ধকারে সে সমস্ত গান ভেসে বেড়াতে লাগল। অধিকাংশ গানই আমড়াপাড়ার মহাজন কেনারাম ভগতকে উদ্দেশ করে। কেনারামই ছিল ব্যবসাদার ও মহাজনদের মাথা, তারই পরামর্শ অনুযায়ী সবাই চলত। প্রথমে তার সম্বন্ধেই গান শোনা গেল—

"দে বয়হা হিজুঃক্'পে, দেলা বয়হা নাতেন পে,
হায়রে হায়রে! ভগত কেনারাম,

১। 'হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃক্' কাথা', পৃ—২৪২।

ঘোড়া উপর পালান উপর সাওয়ারালাং কেনারাম
কুলি কুলি যাইছে টাপ টাপ।

অর্থাৎ—

"এস ভাই এস শুন,
হায় হায়! ভগত কেনারাম,
ঘোড়ার পিঠে জিনের উপর সওয়ারী কেনারাম,
রাস্তায় রাস্তায় টগবগিয়ে যায়।"

তারপরই শোনা গেল মহাজন, পেয়াদা, দারোগা পুলিসের অত্যাচারের কথা—

"পারগানা ইঞ দাহ্‌নাউকেদে পারগানা ইঞ দাঁড়েকেদে,
হায়রে হায়রে! মিছাপুর মেলা,
কেনারাম দরোগা পেয়াদা নুপারতে,
হায়রে হায়রে! মিছাপুর মেলা।

কাটজাঁবা দরোগা কুরমুটাহা পেয়াদা
জিউয়ীরে দো সুকগে দো বাং!
দরোগা ঘোড়া উপর টাপ টাপ—৩
কোমরপেটে পিত্তর পাটা পেয়াদা ঝাক ঝাক—৪
জিউয়ীরে দো সুকগে দো বাং।

দে বয়হা হিজুঃক্'পে দেলা বয়হা নাতেনপে,
হায়রে হায়রে! ভগত কেনারাম,
পারগানা বঙ্গা হ্ঁঞ দাহ্‌নাউকেদে বাঁখেড়াদে,
হায়রে হায়রে! ভগত কেনারা……ম।

বাকো লুতুরাঃক্' খান বাকো হেতাওয়াঃক্' খান,
হায়রে হায়রে! ভগত কেনারা……ম
নোয়ারাবোন নুসাঁসাবোন বাংগেকো তেঙ্গোন,
দঃক্'বোন দানাংবোন বাংগেকো রেবেন,
তবে দো বোন হুলগেয়া হো।

নেরা নিয়া নুরু নিয়া,
ডিঁডা নিয়া ভিটা নিয়া,
হায়রে হায়রে! মাপাঃক্' গপচ্' দো।
নুরিচ্' নাঁড়াড় গাই-কাডা, নাচেল লাগিৎ পাচেল লাগিৎ,

সোদায় লেকা বেতাবেতেৎ গ্রাম র‍ুওয়াড় লাগিৎ
ভবে দো বোন হ‍ুল গেয়াহো।"

অর্থাৎ—

"পারগানার কাছে প্রার্থনা উৎসর্গ করলাম,
হায় হায়! মিছাপ‍ুর মেলায়,
কেনারাম দারোগা পেয়াদার জন্য
হায় হায়! মিছাপ‍ুর মেলায়!

নির্দয় দারোগা প্রতিহিংসাপরায়ণ পেয়াদা,
মনে প্রাণে সুখ নেই,
দারোগা ঘোড়ার উপরে টাপ টাপ যায়······৩
কোমরে পেতলের বেল্ট পেয়াদাদেরও উজ্জ্বল পোশাক····· ৪
মনে প্রাণে সুখ নেই।

এস ভাই শ‍ুনে যাও
হায় হায়! ভগত কেনারাম,
পারগানা দেবতার কাছে প্রার্থনা স্তব নিবেদন করলাম,
হায় হায়! ভগত কেনারা—ম।

কেউ না শ‍ুনলে কেউ না গ্রাহ্য করলে,
হায় হায়! ভগত কেনারাম,
আমরা নিজেরাই বাঁচব কেউ পাশে দাঁড়ায় না,
আমাদের সাহায্য আশ্রয় দিতে কেউ রাজী নয়,
তবে আমরা বিদ্রোহ করব।

স্ত্রী-প‍ুত্রের জন্য,
জমি-জায়গা বাস্তু ভিটার জন্য,
হায় হায়! এ মারামারি, এ কাটাকাটি।
গো-মহিষ, লাঙ্গল, ধন-সম্পত্তির জন্য,
প‍ূর্বের মত আবার ফিরে পাবার জন্য
আমরা বিদ্রোহ করব।"

দেখতে দেখতে দামিন-ই-কোহ্‌র প্রতিটি এলাকায় গানগ‍ুলি আগ‍ুনের মত ছড়িয়ে পড়ল। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর এগ‍ুলি শ‍ুনতে শ‍ুনতে এক অস্থির যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে তারা। শেষ পর্যন্ত আর স্থির থাকতে না পেরে শোষণ ও উৎপীড়নের বির‍ুদ্ধে তারা গেয়ে উঠল ঃ

"ন‍ুসাসাবোন, নওয়ারাবোন চেলে হ' বাকো তেঙ্গোন,
খাঁটি গেবোন হ‍ুলগেয়া হো,

খাঁটি গেবোন হুলগেয়া হো,
দিশম দিশম দেশমাঞ্জহি পারগানা
নাতো নাতো মাপাঞ্জিকো
দঃক্‌'বোন দানাংবোন বাং গোকো তেঙ্গোন,
তবে দোবোন হুলগেয়া হো।"

অর্থাৎ—

"আমরা নিজেরাই বাঁচব, কেউ আমাদের পাশে দাঁড়াবে না,
আমরা সত্যিই বিদ্রোহ করব,
আমরা সত্যিই বিদ্রোহ করব,
দেশের মাঝি ও পারগানারা,
গ্রামের মোড়লরা,
আমাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে, কেউ পাশে দাঁড়াবে না,
তবে আমরা নিশ্চয় বিদ্রোহ করব।"

বিদ্রোহ তারা করবেই কবে। তাদের সামনে মৃত্যু আছে, কারাবাস আছে, দুঃখ আছে, যন্ত্রণা আছে। কিন্তু তা বলে আর এভাবে তারা পড়ে পড়ে মার খাবে না। সংগ্রাম তো মানুষের জন্মগত অধিকার। সংগ্রাম করেই তারা মরবে, কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশধরদের তারা দাসত্ব শৃংখলে আবন্ধ করে যাবে না।

দশ

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক। ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে ওয়াহাবী বিদ্রোহের আগুন সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতের বুক থেকে বিদেশী শাসন লুপ্ত করার জন্য ওয়াহাবী বিদ্রোহীরা প্রাণপণে যুদ্ধ করছে। সারা উত্তর ভারত, বাংলা ও বিহার ওয়াহাবীদের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। দামিন-ই-কোহ্‌র দু'দিক থেকে ওয়াহাবী বিদ্রোহের দামামাধ্বনি সাঁওতালদের কানে এসে বাজছে। সাঁওতালরা আর স্থির থাকতে পারল না. ইংরাজ রাজের অবাধ শোষণ-উৎপীড়ন এবং জমিদার-মহাজনদের সীমাহীন অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারাও গর্জে উঠল। তাদের দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ বিদ্রোহের আকারে ফেটে পড়ল। হাজার হাজার সাঁওতাল শহীদের রক্তে রচনা হল স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। সাঁওতাল-বিদ্রোহের নাগড়া ও ধামসার আওয়াজে সেদিন শাসকগোষ্ঠীও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতৃত্ব নিয়ে এগিয়ে এলেন চার ভাই— সিদু, কানহু, চাঁদ ও ভৈরব। বারহাইত্ থেকে প্রায় দু' মাইল দূরে ভগনাডিহি গ্রামে তাঁদের বাস। তাঁদের পিতা চুনার মুর্মুই গ্রামের মোড়ল। সিদু ও কানহু উভয়েই জানতেন যে যুদ্ধ বা বিদ্রোহের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে ধর্মের ধ্বনিই সর্বাপেক্ষা কার্যকরী; তাই তাঁরা সাঁওতালদের বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্য ঠাকুরের নির্দেশ লাভের কথা চারদিকে প্রচার করলেন। ঠাকুরের নির্দেশ লাভের কাহিনী সম্বন্ধে 'ক্যালকাটা রিভিউ'তে পাওয়া যায়—

> "একদিন রাত্রে সিদু ও কানু তাঁদের বাড়িতে বসে নানা বিষয় চিন্তা করছিলেন, তাঁদের দু ভাই চাঁদ ও ভৈরব দশ মাইল দূরে শিমুলহুপ নামক জায়গাতে গেছল। এমন সময় সিদুর মাথার উপর এক টুকরা কাগজ পড়ল, সেই মুহূর্তেই ঠাকুর (ভগবান) সিদু ও কানুর সামনে উপস্থিত হলেন। ঠাকুর শ্বেতাঙ্গ মানুষের মত হলেও সাঁওতালদের মত পোশাক পরেছিলেন। তাঁর প্রতি হাতে দশটি করে আঙুল, হাতে ছিল একটা সাদা রঙের বই এবং তাতে তিনি কি যেন লিখেছিলেন। বইটি এবং সেই সঙ্গে ৪টি করে কাগজের ৫টি বাণ্ডিলে বিশ টুকরা কাগজ তিনি দু ভাইকে দিলেন, তারপর তিনি উপরের দিকে শূন্যে মিলিয়ে গেলেন! আর এক টুকরা কাগজ সিদুর মাথার উপর পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে দুজন মানুষ উপস্থিত হলেন, তাঁদের প্রতি হাতে ছ'টি করে আঙুল। তাঁরা দু ভাইয়ের কাছে ঠাকুরের নির্দেশ ব্যাখ্যা করেই অদৃশ্য হলেন। এভাবে একদিন নয়, সপ্তাহের প্রতি দিনই ঠাকুর আবির্ভূত হয়েছিলেন।"[১]

১। 'ক্যালকাটা রিভিউ', ১৮৫৬।

ব্রাড্‌লি বার্ট লিখেছেন—

"প্রথমে তিনি আবির্ভূত হলেন আকাশ থেকে নেমে আসা মেঘের আকারে, তারপর একটি অগ্নিশিখার রূপে ; তৃতীয় বার তাঁর আবির্ভাব ঘটল আবৃতমস্তক এক মূর্তির রূপ ধরে, মুখখানি তাঁর ঘন কুয়াসায় ঢাকা ; চতুর্থবার তাঁর প্রকাশ ঘটল পূর্ণ সূর্যালোকে এক ছায়ামূর্তি রূপে, কোন পার্থিব ছায়া সেখানে পড়ে না ; পঞ্চমবারে তাঁর অভ্যুদয় হ'ল ভূগর্ভ থেকে হঠাৎ উত্থিত এক পর্বতের মত ; ষষ্ঠবার তিনি এলেন এক শাল তরুর মত, কোন গাছ সেখানে জন্মায়নি ; এবং সর্বশেষে তিনি দেখা দিলেন সাঁওতালদের মত পোশাক পরে এক শ্বেতাঙ্গের মূর্তি ধরে, কোমরে তাঁর একখণ্ড মাত্র বস্ত্র।"[১]

পরবর্তীকালে বইয়ের পৃষ্ঠায় এবং কাগজের টুকরাগুলিতে যা লেখা ছিল তার অর্থ উদ্ধার করা হয়েছিল এবং জানা গেছল যে এগুলি ছিল বাইবেলেরই অংশ। 'ক্যালকাটা রিভিউ' লিখেছে—

"এটা এক অসাধারণ ও অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে, এটা সত্য সত্যই এবং বাস্তবিকই ঈশ্বর-প্রেরিত প্রত্যাদেশ। এতে আছে প্রাচ্যদেশীয় এক ভাষায় লেখা একটি লিপি ; কিন্তু সেই লিপিটিও সেণ্ট্ জন কথিত খৃষ্টধর্মালম্বীদের সুসমাচার ছাড়া আর কিছুই নয় !"[২]

যাহোক, এ ঘটনার পরই সিদু-কানু তাঁদের বাড়ির উঠানে ঠাকুরের মূর্তি তৈরি করে পূজার আয়োজন করলেন। 'সংবাদ প্রভাকরে' পাওয়া যায়, ক্যাপ্টেন মিডিলটন লিখেছেন—"কানু-সিধুর বাড়িতে প্রবেশ করিয়া আমি সাঁওতালদের ঠাকুর পাইয়াছি। ঐ ঠাকুর একখানা মৃত্তিকানির্মিত চাকার মত—তাহার দুই স্থানে ছিদ্র আছে। তাহাতে দুগ্ধ প্রদান করিলে ফুলিয়া উঠে।"[৩]

কয়েকদিনের মধ্যেই সিদু-কানু গ্রামে গ্রামে পবিত্র শালগাছের ডাল 'গিরা' পাঠালেন। 'গিরা' হল সাঁওতালদের কাছে এক ধর্মীয় আহ্বান, সমগ্র জাতিকে সম্মিলিত করার জন্য এ ডাক। অরণ্যভূমির গ্রামে গ্রামে, বনে বনে, পাহাড়ে পাহাড়ে, মাঠে ঘাটে ছড়িয়ে পড়ল গিরার আহ্বান ; চল চল ভগনাডিহি। "দেলা দোমেল দোমেল, দেলা লগন লগন।" সিদু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব ঠাকুর বাবার নামে ডাক দিয়েছেন সমগ্র সাঁওতালজাতিকে। অরণ্যভূমির অরণ্য-সন্তানরা উপেক্ষা করতে পারে না এ ডাক। তাই, সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা ডিঙ্গিয়ে এই ধর্মীয় আহ্বানে তারা ছুটে এল ভগনাডিহি গ্রামে। সঙ্গে তাদের তীর-ধনুক, টাঙ্গি-কুড়াল, ধামসা, মাদল, বাঁশী ইত্যাদি। রক্তের আগুনে তারা উত্তপ্ত।

১। এফ. বি ব্র্যাডলি বার্ট, 'দি স্টোরি অফ এন ইণ্ডিয়ান আপল্যাণ্ড', পৃ-১৮৬।
২। 'ক্যালকাটা রিভিউ', ১৮৫৬।
৩। 'সংবাদ প্রভাকর', ৫৩০৮ সংখ্যা।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৩০ শে জুন বৃহস্পতিবার ভগনাডিহি গ্রামে প্রায় দশ হাজার সাঁওতাল এসে উপস্থিত হল। ম্যাক্‌ফেল সাহেব লিখেছেন—

> "কেবল দামন-এর প্রতি অংশ থেকেই নয়, বীরভূম, ভাগলপুর হাজারীবাগ ও মানভূম থেকেও হাজার হাজার সাঁওতাল এসে সিদো ও কানহুর পাশে জমায়েত হল।"[১]

বিরাট জনসভা ভগনাডিহি গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এক পুরানো বটগাছের সামনে বসল। সবাই ঠাকুরের নির্দেশ শুনবার জন্য উদ্‌গ্রীব। কোথাও টুঁ শব্দ নেই। সভার কাজ আরম্ভ হল। সিদু-কানু দু'ভাই একে একে বললেন সাঁওতালজাতির আদি-কাহিনী, হিহিড়ি-পিপিড়ি থেকে আরম্ভ করে চায়-চাম্পা, সাতভুঁই শিখরভুঁই, হাজারিবাগ হয়ে কি ভাবে তাদের পূর্ব-পুরুষরা দামিন-ই-কোহ্‌তে প্রবেশ করে বন কেটে, পাথর ভেঙ্গে জমি তৈরি করেছিল সে কাহিনী। অনেক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তারা জমিকে ফসল ফলানোর উপযোগী করেছে, কিন্তু সে জমি গেছে আজ জমিদার-মহাজনদের কবলে। সমস্ত অরণ্যরাজকে গ্রাস করছে তারা, লোভের আগুন জেবলে তছ্‌নছ্‌ করে দিচ্ছে সাঁওতালদের জীবন-যাত্রাকে, হিংস্র পশুর মত তারা আক্রমণ চালাচ্ছে সর্বত্র, সাঁওতালদের চিরজীবনের জন্য ক্রীতদাস করে রাখছে। ইংরাজ সরকারের দারোগা-পুলিস ওদের হয়ে সাঁওতালদের গলা টিপছে, মাঝিদের লাঠিপেটা করছে, এমন-কি, রেলপথের সাহেবরা পর্যন্ত সাঁওতাল নারীর ইজ্জত নাশ করছে। বলতে বলতে তাদের এতদিনের সঞ্চিত ক্রোধ ফেটে পড়ল।

এরপর সভাকে আর শান্ত রাখা গেল না। উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল সবাই। অভিযোগের পর অভিযোগ তুলে সবাই একসঙ্গে বলতে চাইল। সব কথা শোনবার প্রয়োজন নেই কারুর। সবাই ভুক্তভোগী। কিন্তু সিদু সবাইকে শান্ত হতে বললেন। ঠাকুর সমস্ত উৎপীড়নকারীকে উচ্ছেদ করে সাঁওতালদের স্বাধীন জীবন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। দশ হাজার সাঁওতাল সেদিন এক বাক্যে শপথ গ্রহণ করল যে তারা জমিদার-মহাজনদের অত্যাচার আর সহ্য করবে না। দামিন-ই-কোহ্‌ থেকে সমস্ত শোষক-উৎপীড়ককে বিতাড়িত করে জমি দখল করবে ও স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। প্রত্যক্ষভাবে ইংরাজ কোম্পানী সাঁওতালদের স্বার্থে হস্তক্ষেপ না করলেও তারাও কিন্তু বাদ যাবে না। কারণ, তারাও জমিদার-মহাজনদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তাদের থানা পুলিস জমিদার-মহাজনদের ঘুষ খেয়ে, টাকা খেয়ে পোষা কুকুর হয়ে আছে। তাদের সাহায্য নিয়েই তো জমিদার-মহাজনরা লাঠিপেটা করছে সাঁওতালদের। এতদিন তারা সহ্য করেছে, কিন্তু আর নয়, আর সহ্য করা চলে না। হাজার হাজার অরণ্যসন্তানের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল ঃ "দেলায়া বিরিদ্‌ পে, দেলায়া তিঙ্গুন পে।" "জাগো, ওঠো, সাঁওতালরাজ কায়েম কর।"

১। জে. এম. ম্যাকফেল, 'দি স্টোরি অফ দি সান্তাল', পৃ-৫৪।

সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "সাঁওতাল নেতারা ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা বাঙ্গালী ও পশ্চিমী মহাজনদের উচ্ছেদ করে এবং সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চল দখল করে নিজস্ব স্বাধীন শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন করবেন। কুমার (কুম্ভকার), তেলী, কর্মকার, মোমিন (মুসলমান তাঁতী), চামার (চর্মকার), ডোম প্রভৃতি কয়েকটি সম্প্রদায়ের লোকদের কোনরকম আক্রমণ করা হবে না বলে স্থির করা হল। কারণ, সাঁওতালদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; তারা সাঁওতালদের নানাভাবে সাহায্য করে থাকে।"[১]

সভার পর সিদুর নির্দেশে কির্তা, ভাদু ও সুন্নো মাঝি ইংরাজ সরকার, ভাগলপুরের কমিশনার, কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট, বীরভূমের কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট, দিঘি থানা ও টিকাড় থানার দারোগা এবং কিছু সংখ্যক জমিদারের কাছে চিঠি পাঠালেন। দারোগা ও জমিদারের কাছে পনের দিনের মধ্যে চিঠির উত্তর দাবি করা হল।[২]

হাণ্টার সাহেবের মতে, ৩০শে জুন তারিখের সমাবেশ থেকেই 'সমতল-ভূমির উপর দিয়ে কলিকাতাভিমুখে অভিযানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন কলিকাতার দিকে এই বিপুল অভিযান আরম্ভ হয়। এই অভিযানে কেবলমাত্র নেতৃবৃন্দের দেহরক্ষী বাহিনীর সংখ্যাই ছিল ত্রিশ হাজার। সাঁওতালরা বাড়ি থেকে যে খাবার সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, তা যতদিন ছিল ততদিন অভিযান সুশৃঙ্খলভাবেই চলেছিল। কিন্তু খাবার ফুরিয়ে যাওয়ার পর পরিচালকহীন ছোট ছোট সশস্ত্র দলগুলি অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠে, এর পর লুণ্ঠন কিংবা জোরপূর্বক খাদ্য সংগ্রহ অপরিহার্য হলে নেতারা দ্বিতীয় পন্থাই উচিত বলে মনে করেন, কিন্তু সাধারণ সাঁওতালরা অবলম্বন করে প্রথম উপায়টি।'[৩]

ম্যাকফেল সাহেবও সাঁওতালদের এ অভিযান বর্ণনা করতে গিয়ে একই কথা লিখেছেন—

> "তারপর অভিযান শুরু হল। অভিযানের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য যদি প্রথমদিকে কিছু থেকেও থাকে, ইতিমধ্যে তা প্রায় বিলীয়মান হয়ে গেছে; কিন্তু নেতারা এর পরে ঘোষণা করলেন যে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল দলবদ্ধভাবে কলকাতা অভিযান করা। অন্য জায়গায় সাহায্য চেয়ে তারা ব্যর্থ হয়েছে, তাই কলকাতা গিয়ে সকলে গভর্ণর জেনারেলের সামনে সাক্ষাৎ করলেই তারা সাহায্য পাবে এই ভরসাতেই তারা কলকাতা যাচ্ছে। প্রথমদিকে তাদের পরিবারের

১। কে. কে দত্ত, 'দি সাঁওতাল ইনসারেকশন অফ ১৮৫৫-৫৭', পৃ-১৬।
২। 'ক্যালকাটা রিভিউ', ১৮৫৬
৩। ডব্লু. ডব্লু. হাণ্টার, 'দি অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল', পৃ-৩১৩।

মেয়েরা ও শিশুরা যে তাদের সঙ্গে ছিল এবং সেই জনসমাবেশের মনোভাব যে লড়ুয়ে না হয়ে মোটামুটি আনন্দময় ছিল এটা ঠিক। খাদ্য সরবরাহ যতদিন অক্ষুণ্ণ ছিল ততদিন পর্যন্ত এটা ছিল সঠিক। এর পরে নেতাদের চেষ্টা সত্বেও যথেষ্ট লুটতরাজ হয়েছিল, নেতারা সকলের কাছ থেকে চাঁদা নেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন।"[১]

কলিকাতা অভিযানের কাহিনী বর্ণনা করে সেদিন সাঁওতালী গান রচিত হয়েছিল—

"সিঞ বির্ সেন্দরাক সেনক্'আ
রমঝম তালা ঞিদা,
কাল্কাটা দরবার ক সেনক্'আ
সিঙ্গে সিঞ সিঙ্গে ঞিদা।"

অর্থাৎ—

"সিঞ জঙ্গল শিকারে যায়
সরগরম মাঝরাত
কলকাতা দরবারে যায়
সারাদিন সারারাত।"

ভারতের ইতিহাসে এটাই প্রথম গণ-পদযাত্রা। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার নিজের স্বার্থে হাজার হাজার সাঁওতাল কৃষক ও শ্রমিককে ঘরছাড়া করে তার অর্থনীতি ও জীবনযাত্রার ছন্দ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল, তারই প্রতিবাদে এই মিছিল। গ্রামাঞ্চলের ওপর দিয়ে সেদিন হাজার হাজার মানুষের অন্তহীন মিছিল চলেছিল বিদ্রোহের মাদল বাজাতে বাজাতে।

১। জে. এম. ম্যাকফেল, 'দি স্টোরি অফ দি সান্তাল', পৃ-৫৫।

এগারো

১২৬২ বাংলা সনের ১৮ই আষাঢ় শনিবার সাঁওতালরা ভগনাডিহি গ্রাম থেকে যাত্রা শুরু করল। কাছেই পাঁচক্ষেতিয়া বাজার। সেখানে ঠাকুর দেবতার পূজা করে তারা ইংরাজ সরকারের কাছে তাদের অভিযোগ জানাতে যাবে। সাঁওতালদের দুঃখে ঠাকুর দেখা দিয়েছেন সিদু-কানুকে। সিদু-কানু জানিয়েছে, এবার তাদের দুঃখ দূর হবে, এ দেশ তাদের হবে। পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, নদী-নালা, মাঠ-ঘাট, ক্ষেত-খামার, গাছ-পালা, জন্তু-জানোয়ার সব কিছু তাদের হবে। হ্যাঁ, সব তাদের হবে। সবাই কম-বেশী উত্তেজিত। পাঁচক্ষেতিয়ার বাজারে তারা উপস্থিত হল। কিন্তু ঠিক এ সময় খবর এল যে, আমগাছিয়ার গর্ভু মাঝি ও পীপড়ার হাড়মা মাঝিকে মহেশ দারোগা ও কেনারাম ভকত গ্রেপ্তার করে ভাগলপুর নিয়ে যাচ্ছে। বারুদে আগুন ধরতে আর এতটুকু দেরী হল না। সমস্ত অরণ্য প্রদেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে।

আমড়াপাড়ার কেনারাম ভকত নিজেকে রাজাধিরাজ মনে করত। মহেশ দারোগার সঙ্গে চক্রান্ত করে সে গর্ভু মাঝি ও হাড়মা মাঝিকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল। কারণ গর্ভু মাঝি আর তার দাসত্ব স্বীকার করতে চায় না। সে বলে, সারাজীবন খেটেছি। এত দিনেও যদি দশ টাকা ঋণ শোধ না হয়ে থাকে তো হল না। ও ঋণ আর নেই। কেনারামের দাসত্ব আর সে করবে না। আর হাড়মা মুমু মানী লোক। তার জমি আছে, ঘরে ধান-চাল আছে, ঋণ করতে চায় না। কেনারামের লোভ হাড়মার জমির উপর, কিন্তু হাড়মা তা কিছুতেই বিক্রি করবে না। কেনারামকে তার গ্রামে জায়গা দেবে না। তাই জঙ্গীপুর থেকে হাড়মা মাঝির সব কিছু ক্রোক করার পরোয়ানা নিয়ে এসেছিল কেনারাম। আদালতের পেয়াদা ও কেনারামের লোকজনকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য মহেশ দারোগা এবার তার সব কিছু ক্রোক করে তাকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে, এমন-কি, তার ছেলে চাম্পাই মুর্মুকে পর্যন্ত। অবশ্য এ ব্যাপারে কেনারাম যথেষ্ট সাহায্য করেছে, হাড়মা মাঝির গরু-মহিষ কিনে নিয়ে নগদ টাকা মহেশ দারোগা ও তার লোকজনদের দিয়েছে।

সিদু-কানু সমস্ত ব্যাপারটা শুনল চাঁদ মাঝির কাছে। আরো শুনল মহেশ দারোগা বারহেট থেকে ভগনাডিহি হয়ে উত্তর মুখে ভাগলপুর যাবে। আর দেরী নয়—যা করবার এ সময়ই করতে হবে, সাঁওতাল বন্দীদের ছিনিয়ে আনতে হবে।

বারহেটের খুব কাছেই ভগনাডিহি গ্রাম; তার কিছু দূরেই মোরেল ও গুমানি নদী মিশেছে, এখানেই এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছের নীচে সিদু-কানু তার অনুচরদের নিয়ে মহেশ দারোগার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। এ খবর পেয়ে সেদিন রাত্রেই প্রায় দু'হাজার সাঁওতাল সেখানে উপস্থিত হল।

বারহেটে কেনারামের জ্ঞাতিভাই মহিন্দর ভকতের বাড়িতে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে মহেশ দারোগা তার কয়েদীদের নিয়ে উপস্থিত হল নদীর ঘাটে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল সিদু-কানুর লোকজন। হাতে তাদের তীর-ধনুক, টাঙ্গি-কুড়াল, বাইরে শান্ত দেখালেও চোখের চাউনি তাদের ভয়ঙ্কর। মহেশ দারোগা চমকে উঠল। স্বপ্নেও সে কল্পনা করেনি যে শান্তিপ্রিয় সাঁওতালরা তার পথ আটকাবে। মহেশ দারোগা বাইরে কোনরকম ভয়ের চিহ্ন প্রকাশ করল না, সরকারী ক্ষমতায় বলীয়ান সে ; তার আবার ভয় কি ? দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভয় করলে তো চলে না। ঘোড়ার পিঠে অগ্রসর হল—পাশে কেনারাম, পিছনে কয়েদী আসামী ও পাহারাদারদের দল। সবাই সাঁওতাল জনতার মধ্যে এসে পড়ল, সাঁওতালরা কোনরকম বাধা দিল না। কিন্তু নদীর ঘাটে সাঁওতাল জনতায় পথ বন্ধ। অগত্যা দারোগা ও তার লোকজন থামতে বাধ্য হল। চারপাশে সাঁওতাল জনতা, সবাই নিস্তব্ধ। দারোগা বুঝল, পরিস্থিতি খারাপ ; কিন্তু সাহসই একমাত্র পরিত্রাণের উপায়। ধমকে উঠল—"কারা তোরা ? সরকারী কাজে বাধা দিচ্ছিস কেন ? পথ ছাড়।"

জবাব দিল কানু, বলল ঃ "আমার বিনা অনুমতিতে স্বাধীন সাঁওতালদের এ ভাবে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেন ? ওদের বাঁধন কেটে দাও।"

দারোগা ক্রোধে চিৎকার করে উঠল ঃ "কে তুই ? সরকারী কাজে বাধা দিস ?"

নির্ভয়ে কানু উত্তর দিল ঃ "আমি কানু, এ আমার দেশ।"

সিদুও বলল ঃ "আমি সিদু, এ আমার দেশ।"

জনতার ভিতর থেকে কে একজন বলে উঠল ঃ "হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওঁরা দেবতার নির্দেশ পেয়েছে।"

সিদু-কানুর নির্দেশে হাড়মা মাঝি, গর্ভু মাঝি ও চাম্পাইকে মুক্ত করা হল। দারোগা ও কেনারামকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে দিয়ে তাদের ছাতা কেড়ে নেওয়া হল। দারোগার তখনও চৈতন্যোদয় হয়নি, সে আসামীদের ফেরত চাইল এবং চিৎকার করে বলল, সরকারী কাজে বাধা দিলে সবাইকে চাবুক মারা হবে।

কানু শান্তভাবেই বলল ঃ "চুপচাপ চলে যাও। এরা আমাদের লোক, আমরাই এদের মালিক। যদি এদের বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিযোগ থাকে তাহলে আমাদের কাছে তার সন্তোষজনক প্রমাণ দাও।"

দারোগা ঃ "আমি সরকারের আদালতে তা প্রমাণ করব—আর কারও কাছে নয়।" মহেশ দারোগা এভাবে যতই বিপদকে তাচ্ছিল্য করতে লাগল, কেনারামের ভয় ততই বাড়তে লাগল।

দারোগা এবার দু ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে শেষ কথা বলল ঃ "আমি জানি কারা আসামী ছিনিয়ে নিয়েছে, কারা সরকারের অপমান করেছে—যেমন আমার আসামীদের বেঁধেছিলাম, তাদেরও সে রকম বাঁধব।"

সিদ্-কান্ বলল ঃ "আমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে তুমি আমাদের গ্রেপ্তার করতে পার।" নির্বোধ দারোগা সাঁওতালদের নিরীহ স্বভাবের কথা স্মরণ করে সিদ্-কানুকে বাঁধবার জন্য সিপাহীদের হুকুম দিল।

মুহূর্তে আগুন ধরল, বারুদে আগুন ধরে বিস্ফোরণে যেমন বিকট শব্দ হয়, তেমিদ প্রচণ্ড শব্দ হল হুল-হুল'! গভু মাঝি বাঁধনমুক্ত হয়েছিল অনেক আগেই। কেনারামের উপর তার ভীষণ রাগ। কেনারামই তাকে ঋণে জড়িয়ে তার সর্বনাশ করেছে ও গত কয়েকদিন ধরে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়েছে। রাগে ও উত্তেজনায় সে স্থির থাকতে পারল না। জনতার একজনের হাত থেকে একটা কুড়ালি ছিনিয়ে নিয়ে 'হুল, হুল' বলে বীভৎস চিৎকার করে অত্যাচারী কেনা-রামের দিকে ছুটে গেল এবং তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে এক আরণ্যক হিংস্রতায় তার ঘাড়ে কুড়ালির এক মারাত্মক কোপ বসিয়ে দিল। মানব প্রকৃতির আদিম রুদ্র প্রকাশ। এখানে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার অচল। আদিম ক্ষুব্ধ প্রকৃতি রুদ্ধ আক্রোশে কোন বিধান মানে না। কেনারামের দেহের উপর বার বার আঘাত করতে লাগল গভু। জনতাও হঠাৎ ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি, শেষে তারাও উত্তেজনায় উত্তেজিত হয়ে 'হুল, হুল' বলে চিৎকার করে উঠল। কয়েকজন নিদারুণ আক্রোশে কেনারামের মৃতদেহ ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগল। কেনারামের রক্তে স্নান করে গভু হঠাৎ দারোগার দিকে ফিরল। দারোগা তখন ভয়ে কম্পমান, পালাবার পথ নেই, চারপাশে জনতা। গভু চিৎকার করে উঠল ঃ "দারোগাকে বধ কর" বলেই সে রক্তাক্ত কুড়ালি নিয়ে দারোগাকে আক্রমণ করল। প্রতিহিংসায় মত্ত সাঁওতালরা চিৎকার করতে করতে ছুটে গেল দারোগার দিকে। দারোগা এবং তার লোকজনদের একের পর এক হত্যা করা হল, চারপাশে পড়ে রইল তাদের ধড় ও মুণ্ড। ভাগলপুরের কমিশনার সেদিনের ঘটনা বর্ণনা করে লিখেছেন—

> "দিঘী থানার দারোগা মহেশলাল দত্ত ৫ জুলাই ১৮৫৫ তারিখে সদলে এখানে উপস্থিত হল ; কিন্তু অনতিবিলম্বেই আরো কয়েকজনের সঙ্গে (মোট ১৯ জন) সিধু তাকেও হত্যা করল। যারা খুন হল তাদের মধ্যে ছিল একজন মহাজন, দু'জন বরকন্দাজ এবং কয়েকজন চৌকিদার।"[১]

এই কি সেই শান্তিপ্রিয় সদানন্দ সাঁওতাল জাতি? মহাজনদের নৃশংস অত্যাচারের মার যারা নির্বিবাদে সহ্য করে যাচ্ছিল তারা এতখানি নির্মম ও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে কি করে? আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত বেদনা যখন আগুনে রূপায়িত হয় তখন সে আগুন হিংসার ইতিহাসে চরম। অরণ্য সন্তানরা ইতিহাসের পাতায় সে চিহ্নই রেখে দিল।

১। সেক্রেটারী, গভর্নমেণ্ট অফ বেঙ্গল-এর নিকট প্রেরিত ভাগলপুরের কমিশনারের পত্র, ৯ জুলাই, ১৮৫৫, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জনতা রক্তাক্ত কলেবরে প্রতিহিংসার চোখে দু'ভায়ের সামনে এসে দাঁড়াল। তৎক্ষণাৎ দুভাই মন স্থির করে ফেললেন। কানু সজোরে ঘোষণা করলেন ঃ

> "হুল! হুল! দিশমরে ঢারওয়াঃক্' আসেনপে, দারোগা বানুঃক্'কোওয়া, হাকিম বানুঃক'কোওয়া, সরকার বানুগেয়া। নিঃঃক্' দ হড় হপন রেয়াঃক্' রাজ হেচ' সেটেরএনা।"[১]

অর্থাৎ—

> "হুল আরম্ভ হল। চারদিকে শালগাছের ডাল পাঠাও, দারোগা নেই, হাকিম নেই, সরকার নেই। এবার সাঁওতালদের রাজত্ব এসেছে।"

জনতা চিৎকার করে উঠল ঃ "হুল! হুল! দারোগা নেই, পেয়াদা নেই, অত্যাচারী মহাজন নেই। সাঁওতালদের রাজা সিদু-কানু। জয় সিদু কানুর জয়!"

আর দেরী করা চলে না। সাঁওতালরা নিজস্ব স্বাধীন রাজ্যের জন্য উম্মত্ত। সাঁওতাল রাজ্য স্থাপনের জন্য গোরা সৈন্যদের সঙ্গে লড়তে হবে। ওদের হাতে বন্দুক আছে, কামান আছে। তা থাক। সাঁওতালদেরও আছে তীর-ধনুক, টাঙ্গি ও তরোয়াল। ভয় করলে চলে না। সিদু-কানু নির্দেশ দিলেন—"রাজা ও মহাজনদের সবাইকে আমরা খতম করব, হিন্দু ব্যবসায়ীদের গঙ্গার ওপারে আমরা তাড়িয়ে দেব, আমাদেরই রাজ্য হবে।"

জনতা তীর-ধনুক, টাঙ্গি-তরোয়াল হাতে তুলে সায় দিল। এভাবে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই সাঁওতাল বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল।

এরপর জনতা পাঁচক্ষেতিয়ার বাজারে এসে উপস্থিত হল। এ বাজারে মানিক চৌধুরী, গোরাচাঁদ সেন, সার্থক রক্ষিত, নিমাই দত্ত ও হিরু দত্ত নামে পাঁচজন কুখ্যাত বাঙ্গালী মহাজন ব্যবসা স্থাপন করে সাঁওতালদের উপর শোষণ ও উৎপীড়ন চালাচ্ছিল। জনতা তাদের পাঁচজনকেই হত্যা করে প্রতিশোধ নিল।

মহেশলালের পর হত্যা করা হল গোড্ডা মহকুমার কুরহুরিয়া থানার বড় দারোগা প্রতাপনারায়ণকে। বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রতাপনারায়ণ সাঁওতালদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছিল। বিদ্রোহী সাঁওতালরা তাকে আটক করে সোনারচকে (গোড্ডা মহকুমার কেরওয়ারের নিকটবর্তী চুনাচক নামে খ্যাত) ঠাকুরের নামে বলি দিল। বাবুপুর থেকে পাঁচক্ষেতিয়া যাবার পথে খানসাহেব নামে আর একজন দারোগাও কানুর হাতে নিহত হল।

এবার বিদ্রোহীরা বারহেট বাজার আক্রমণ করল। বারহেটের হিন্দু মহাজন ও ব্যবসায়ীরা পূর্বেই খবর পেয়েছিল যে সাঁওতালরা দল বেঁধে এগিয়ে আসছে। তাই তারা অনেকেই প্রাণের ভয়ে ধনসম্পত্তি, আসবাবপত্র ফেলে পলায়ন করেছিল। বাজার জনশূন্য, কেউ কোথাও নেই। সাঁওতালরা তবু তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল মহাজন-ব্যবসায়ীদের, বিশেষভাবে মহিন্দর ভকতকে, কিন্তু তার কোন

১। চৈতন্য হেম্ব্রম কুমার, 'সান্তাল পারগানা, সান্তাল আর পাহাড়িয়াকোওয়াঃক্' ইতিহাস', পৃ-৫৭-৫৮।

পাত্তা নেই। অন্যান্য যাদের পাওয়া গেল তাদের নির্দয়ভাবে হত্যা করে শোষণ ও অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া হল। সিদু-কানুর নির্দেশে সাঁওতালরা বারহেট বাজার লুট করল, মহাজনদের ঘরবাড়ি, নীলকুঠি, রেশমকুঠি জ্বালিয়ে দিল।

বারহেটের সমস্ত সাঁওতাল 'কামিয়া'রা আজ মুক্ত। মহাজন, ব্যবসায়ী ও সুদখোরদের বাড়িতে আর তাদের ক্রীতদাস হয়ে পড়ে থাকতে হবে না; ছেলে-মেয়েরাও আজ থেকে মুক্ত। মুক্তি পেয়ে তারা স্বজন পরিজনদের জড়িয়ে ধরে—কেউ বা কেঁদে ফেলে আনন্দে।

সাঁওতাল বিদ্রোহীরা পুনরায় জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে: "জয় সিদু-কানু জয়!"

বারহেট্ সাঁওতালদের দখলে এল।

বারো

বারহেট দখলের পরই সাঁওতালরা দলে দলে এসে সিদ্-কানুকে অভিবাদন জানিয়ে তাদের নেতা বলে স্বীকার করল। সিদু-কানু ভালভাবেই জানতেন যে, এরপর ইংরাজরাজের পুলিস ও ফৌজের সঙ্গে তাঁদের রীতিমত যুদ্ধ করতে হবে। তাই, তাঁরা অবিলম্বে সাঁওতাল-বাহিনী গড়ে তুললেন। জানা যায়, সে সময় রেলপথ তৈরি হচ্ছিল বলে জোয়ান জোয়ান সাঁওতাল ছেলেরা কাজে গিয়েছিল। অবিলম্বে লোক পাঠিয়ে তাদের আনা হল এবং যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত করা হল।"[১] কামান বন্দুক প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র তো তাদের নেই, তীর-ধনুক, টাঙ্গি-তরোয়ালই তাদের সম্বল। এ সমস্ত অস্ত্র নিয়েই তারা স্বাধীন ও শোষণমুক্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত হল। এ ছাড়া, সাঁওতাল নেতারা গ্রামে গ্রামে শালডাল পাঠিয়ে সাঁওতালদের কাছে আবেদন জানালেন। শালডাল হল একতার প্রতীক। যুদ্ধ আসন্ন। সংঘবদ্ধ ঐক্যই এ সময় সবচেয়ে বড় অস্ত্র। দেশব্যাপী সেই ঐক্য গড়ে তোলা প্রয়োজন। ছটরায় দেশমাঝি লিখেছেন ঃ

> "আদো হুল এহপ্ পাহিলরে দো সিদো-কানহু ঠেন খন আদ্ওয়া চাওলে, সুনুম সিন্দুরকো আসেন আচুরকেৎআ আতো আতো ডাউটিচ্তে নওয়া মেনকাতে, বঙ্গাকো দড়্হকো লাগিৎ যেমন লাড়্হাইরেকো সাহাইআকো।"[২]

অর্থাৎ—

> "বিদ্রোহ শুরু হওয়ার আগে সিদো-কানহু প্রেরিত আতপ চাল, তেল, সিন্দুর শালপাতার তৈরী বাটিতে করে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে লাগল, এ সঙ্গে বলা হল দেবতারা লড়াইয়ে সাঁওতালদের সহায় হয়ে শক্তি বৃদ্ধি করবেন।"

বিদেশী ইংরাজরাজ ও তাদের সহচর জমিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য এগিয়ে এল হাজার হাজার সাঁওতাল। বাঙ্গলা ও বিহারের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত জমিদার-মহাজন-ইংরাজ বিরোধী সংগ্রামের ধ্বনিতে কেঁপে উঠল। তীর-ধনুক, টাঙ্গি তরোয়াল নিয়ে বিদ্রোহী সাঁওতালরা দামিন-ই-কোহ্র জমিদার-মহাজন-সুদখোরদের ঘর-বাড়ি, শস্য-গোলা, ধন-সম্পত্তি সমস্ত কিছু পুড়িয়ে দিয়ে তাদের হত্যা করতে লাগল। নীলকর সাহেবদের কুঠিগুলি আক্রমণ করে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হল। বিদ্রোহীরা চারদিকে ঘোষণা করে দিল যে কোম্পানীর রাজত্ব শেষ হয়েছে এবং তাদের স্বাধীন

১। চৈতন্য হেম্ব্রম কুমার, 'সান্তাল পারগানা, সান্তাল আর পাহাড়িয়াকোওয়াক্' ইতিহাস', পৃ-৬১।

২। 'ছটরায় দেশমাঞ্জ্হি রেয়াঃক্' কাথা,' পৃ-৭-৮।

সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এ দেখে বহু মহাজন-সুদখোর প্রাণের দায়ে সিদু-কানুর শরণাপন্ন হল। চৈতন্য হেমব্রম কুমার লিখেছেন ঃ

> "বারহাইত তাপলরেন দেকো মহাজন দো মঞ্জ্ মঞ্জ্ দামান সান্দেশ-আনতে সিদো-কানহুতেকিন ঠেনকো হেচ্‌এনা, আর জোড়হাত-কাতে নেহর বিন্তিআতেকো আরজ্‌এনা, যেমন জিউয়ী দো বাঞ্চাওঃক্'তাকো। ইকা দকো ঞামকেৎগেয়া, মেনখান ওনকোওয়াঃক্' হিসাব বাহি আর এমানতেয়াঃক্' দলিল কাগজ দকো জেরেৎ গিডিকেৎতাকোওয়া আর ওনকোওয়াঃক্' ধন-দুরীব দো লাড়হাই ফাঁদ লাগিৎ রসদ মেনকাতেকো এম ওচোকেৎকোওয়া!"[১]

অর্থাৎ—

> "বারহাইতের আশপাশের হিন্দু মহাজনরা ভাল ভাল দামী মিষ্টি নিয়ে সিদু-কানুর কাছে এল এবং হাত জোড় করে নিবেদন করল যেন তাদের প্রাণ রক্ষা হয়। মাফ তাদের করা হল, কিন্তু হিসাবের খাতা ও অন্যান্য দলিল কাগজপত্র পুড়িয়ে দেওয়া হল এবং তাদের ধন-সম্পত্তি থেকে সাঁওতাল সেনাবাহিনীর জন্য রসদ দিতে তারা বাধ্য হল।"

ভাগলপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এইচ. এইচ. রিচার্ডসন প্রথমে সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা বিশ্বাস করতে পারেননি। এত শান্ত, নিরীহ মানুষেরা যে সশস্ত্র বিদ্রোহ করতে পারে এ তাঁর কল্পনার বাইরে ছিল। বিদ্রোহ ক্রমেই ভীষণ আকার ধারণ করল। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় এক ইংরাজ লেখক লিখেছিলেন—'এরূপ আর কোন অদ্ভুত ঘটনা ইংরাজদের স্মরণকালের মধ্যে নিম্নবঙ্গের সমৃদ্ধিকে বিপদগ্রস্ত করে তোলে নাই।' লেখক স্পষ্টভাবেই স্বীকার করে লিখেছেন ঃ—

> "যে উপলক্ষ নিয়ে সাঁওতাল বিদ্রোহের উদ্ভব হয়েছিল, তার অনুরূপ কোনও আন্দোলন ইংলণ্ডে কখনও হয়নি।"[২]

ভাগলপুরের নতুন কমিশনার মিঃ সি. এফ. ব্রাউন ৮ই জুলাই দারোগা হত্যার খবর পেলেন। তিনি আরও শুনলেন যে, বোরিও ও কলগাঁর মাঝে কয়েকটি গ্রাম লুট করে সাঁওতালরা রাজমহলের পথে ভাগলপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ভাগলপুর জেল থেকে সাঁওতাল কয়েদীদের মুক্ত করাই তাদের উদ্দেশ্য। খবর পেয়েই ব্রাউন সাহেব জেলখানার চারদিকে ও সমস্ত শহরের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বন্দুকধারী সিপাহী মোতায়েন করলেন আর এ অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার এফ. ডব্লিউ. বারোজকে অবিলম্বে ভাগলপুর ও রাজমহল রক্ষার

১। চৈতন্য হেম্ব্রম কুমার, 'সান্তাল পারগানা, সান্তাল আর পাহাড়িয়া কোওয়াক্' ইতিহাস', পৃ-৭২।
২। 'ক্যালকাটা রিভিউ', ১৮৫৬

জন্য নির্দেশ দিলেন। এতেও তিনি নিশ্চিন্ত হতে না পেরে পাহাড়িয়া সর্দারদের এবং এ অঞ্চলের জমিদার ও থানার দারোগাদের বিদ্রোহ দমন করতে অনুরোধ জানালেন। এ ছাড়া, মেজর বারোজের কাছ থেকে একশটি গাদা বন্দুক নিয়ে ঘোঘা ও চন্দন এ দুটি নালার ঘাট পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন, যেন সাঁওতাল বিদ্রোহীরা শহরে প্রবেশ করতে না পারে।

১১ই জুলাই মেজর বারোজ সৈন্য বাহিনীসহ রাজমহলের পথে কলগাঁ এসে পেঁছিলেন এবং ঐ দিনই ভাগলপুরের কমিশনারকে লিখে জানালেন ঃ

> "আমরা সংবাদ পাচ্ছি যে, বিদ্রোহীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের মাদলের শব্দ শোনামাত্র দশ হাজার সাঁওতাল লুটপাটের জন্য সমবেত হয়। আমার অধীনস্থ সৈন্যদল এত ক্ষুদ্র যে একে আরো ছোট দলে বিভক্ত করলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার ক্ষমতা থাকবে না। আমি মনে করি, পাশাপাশি অঞ্চলে কিংবা তাদের ভাগলপুর যাওয়ার পথে বাধা দিবার জন্য একদল সৈন্য প্রস্তুত রাখা প্রয়োজন।"[১]

ভাগলপুরের কমিশনার অবিলম্বে দানাপুর সেনানিবাস থেকে আরো সৈন্য পাঠাবার অনুরোধ জানালেন। বীরভূম, বাঁকুড়া, ছোটনাগপুর, সিংভূম, হাজারিবাগ, মুঙ্গের ও পূর্ণিয়ার ম্যাজিস্ট্রেটদেরও সাধ্যমত সৈন্য পাঠাবার জন্য লেখা হল।

প্রতিদিন নতুন নতুন অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়তে লাগল, বিদ্রোহীদের সংখ্যাও ক্রমে বেড়ে চলল, নির্মমভাবে তারা প্রতিশোধ নিতে লাগল। এ সময়ের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় পাওয়া যায় ঃ

> "ভাগলপুর, বীরভূম, রাজমহল, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জিলার পর্ব্বতবাসী অসভ্য লোকসকল একত্র দলবদ্ধ হইয়া রাজবিদ্রোহ উপস্থিত করাতে চারিদিগে হাহাকার শব্দ উঠিয়াছে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবরা ভীত হইয়া একত্র বাস করিতেছেন, প্রজাদিগের ধন প্রাণ রক্ষা দূরে থাকুক, তাহারা আপনাপন প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সঙ্কুচিত হইয়াছেন, দুরাত্মারা যেখানে গমন করিতেছে সেইখানেই নির্দ্দয়রূপে স্ত্রী-পুত্র বালক বালিকার প্রাণবিনাশপূর্ব্বক সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিতেছে, প্রায় বিংশতি ক্রোশ পর্য্যন্ত দেশ তাহারদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছে, তাহারদিগের সংখ্যা অন্যূন ষোল হাজার হইবেক, ব্রিটিশ অধিকার মধ্যে এরূপ ঘটনা কোন কালেই হয় নাই, বর্গির হেঙ্গামা অপেক্ষা এই ব্যাপারকে অতি ভয়ানক বলিতে হইবেক।"[২]

১। কে. কে. দত্ত, 'দি সান্তাল ইনসারেকশন অফ ১৮৫৫-৫৭', পৃ-২১।
২। 'সংবাদ প্রভাকর', ৪ শ্রাবণ ১২৬২, ১৯শে জুলাই. ১৮৫৫।

তবে সেদিন 'সংবাদ প্রভাকর' সাহসের সঙ্গে এ মন্তব্যও করেছিল—

"রাজমহল, ভাগলপুর, মুরশিদাবাদ, জঙ্গিপুর, অরঙ্গাবাদ, আমড়া, জিয়াগঞ্জ ইত্যাদি স্থান হইতে আমরা যে সকল পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি এবং ইংরাজী পত্রে যাহা প্রকাশ হইয়াছে, তদ্দারা নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে যে সাঁওতাল-জাতিরা কোন কালে রাজবিরুদ্ধাচরণ করে নাই তাহারা চিরকাল রাজানুগত ও পরিশ্রম তৎপর, তাহারদিগের পরিশ্রমে রাজমহলের পর্ব্বতোপরি বিচিত্র উদ্যান ও নগর নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহারা কৃষিকার্য্যের দ্বারা প্রচুর শস্য উৎপন্ন করিতেছে, মেং পণ্টেট সাহেব যে সময়ে ঐ পর্ব্বতের রাজস্ব বিষয়ের ভার গ্রহণ করেন সে সময়ে কেবল ৩০০ মাত্র সাঁওতাল জাতি তথায় বাস করিয়াছিল। এইক্ষণে তাহারদিগের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ হইয়াছে এবং দক্ষিণ পর্ব্বত হইতে সাঁওতাল জাতি অধিক পরিমাণে আগমন করিতেছে, তাহারা বাঙ্গালীর ন্যায় ভীরু স্বভাব নহে, বলবান ও সাহসিক। রেইলওয়ে সংক্রান্ত কর্ম্মচারীরা তাহারদিগের প্রতি নানা বিধায়ে অত্যাচার করাতে তাহারা অস্ত্রধারণ করিয়াছে।

'রেইলওয়ে কর্ম্মচারিগণ হুগলি ও বর্দ্ধমানে যে প্রকার অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহাতে আগেকার ভীরুস্বভাব লোকেরা কোন আপত্তি না করাতে তাঁহাদিগের সাহস বৃদ্ধি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বলবান লোকেরা কেন তাহা সহ্য করিবেক? আমরা অবগত হইলাম যে রেইলওয়ের কর্ম্মচারিরা সাঁওতালজাতির যুবতি স্ত্রীলোকদিগকে ধরিয়া বলাৎকার করিয়াছেন, কোন কোন স্ত্রীলোকদিগকে ধরিয়া পাঁচ সাত দিবস আপনাদিগের নিকট রাখিয়াছেন, তাহারদিগের উদ্যান হইতে বল দ্বারা ফল কাষ্ঠাদি লইয়াছেন তাহার মূল্য দেন নাই, সাঁওতাল লোকদিগকে পরিশ্রম করাইয়াছেন অথচ মূল্য কিছুই দেন নাই, বলবান জাতি এত অত্যাচার কেন সহ্য করিবেন? এই বিষয়ের বিশেষ তদন্ত অতি আবশ্যক, যাহারা চিরকাল রাজানুগত তাহারা বিনা কারণে রাজ বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে এ কথা কে বলিবেন?

"আমাদিগের কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে প্রায় ৩০০০ পর্ব্বতীয় লোক একত্র দলবদ্ধ হইয়া অস্ত্র ধরিয়াছে, তাহারা দুই দলভুক্ত হইয়াছে, একদল বীরভূমাভিমুখে গিয়াছে, অপর একদল সম্মুখস্থ সকল গ্রাম দগ্ধ করিয়া প্রজাদিগের প্রাণ বিনাশ ও দ্রব্যাদি লুঠ করিতে জঙ্গিপুরাভিমুখে আগমন করিতেছে, তাহারদিগের এমত প্রত্যাশা আছে যে জিয়াগঞ্জ ও মুর্শিদাবাদ লুঠ করিবেক, কিন্তু এতদিনে বোধহয় রাজসেনারা তাহারদিগের আগমনের পথ রুদ্ধ করিয়াছে, কয়েকজন বিবির প্রতি দুরাত্মারা যে প্রকার অত্যাচার করিয়াছে তাহা লিখিয়া বর্ণনা করা যায় না, কয়েকজন সাহেব হত—হইয়াছে।

"কমিস্যনর সাহেব এক পল্‌টন সিপাহী লইয়া বীরভূমাভিমুখে গিয়াছেন, বোধহয় বিদ্রোহকারিরা তথায় উপস্থিত হইবার পূর্বে তিনি উত্তীর্ণ হইবেন।"[১]

বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য মুর্শিদাবাদ থেকে ৫০০ অশ্বারোহী সৈন্য, ৪০টি হাতী ও ২টি কামান পাঠান হল ঔরঙ্গবাদে জরুরী সভা বসল, বিভিন্ন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টররা সবাই উপস্থিত হলেন সেই বৈঠকে। বিদ্রোহী-দের ভয়ে সবাই আতঙ্কগ্রস্ত, কারো চোখে ঘুম নেই। ইংরাজ রাজত্ব কায়েম রাখবার জন্য সব রকম আলোচনা হল। অন্যদিকে, ইংরাজরাজের শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তির আনন্দে বাঙ্গলা ও বিহারের দিনমজুর ও গৃহহারা জমিহারা সাধারণ কৃষক সবাই উল্লসিত হয়ে উঠল, পরাধীন ভারতের বুকে স্বাধীনতার প্রদীপ জ্বালাবার জন্য তারাও এগিয়ে এল, যোগ দিল বিদ্রোহীদের সঙ্গে। সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে একসূত্রে বাঁধবার জন্য সাঁওতাল বিদ্রোহীরা রচনা করল বাংলা গান ঃ

"সিদো কানহু খুড়খুড়ি* ভিতরে
চাঁদ ভায়রো ঘোড়া উপরে
দেখ সে রে! চাঁদরে! ভায়য়োরে!
ঘোড়া ভায়য়োরে মুলিনে মুলিন"

সিদু-কানু পাল্কিতে এবং চাঁদ-ভৈরব ঘোড়ায় চড়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে তাঁদের উৎসাহ দিলেন। দেখতে দেখতে মুক্তি সংগ্রামের উদাত্ত আহ্বান ছড়িয়ে পড়ল দামিন এলাকার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত।

১। 'সংবাদ প্রভাকর', ৫ শ্রাবণ ১২৬২, ২০ জুলাই ১৮৫৫।
* খুড়খুড়ি—পাল্কি।

তেরো

বিদ্রোহের আগুন ভাগলপুর-মুর্শিদাবাদ-বীরভূম সীমান্তে অল্প কয়েক-দিনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ল। বিদ্রোহী সাঁওতালরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন জায়গার ওপর আক্রমণ শুরু করল, প্রতিশোধ নিতে লাগল নির্মমভাবে। এতদিন তারা শুধু পেয়েছে অত্যাচার, অবিচার, শোষণ ও উৎপীড়ন। এবার প্রতিশোধ নেওয়ার সময় এসেছে। বিদ্রোহীরা জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী ও সুদখোরদের ঘরবাড়ি, শস্যগোলা, দোকানবাড়ি সমস্ত কিছু জ্বালিয়ে দিতে লাগল, দোষী নির্দোষ কাউকেও রেহাই দিল না। প্রাণের ভয়ে সবাই পালাতে লাগল এদিক ওদিক। সেকালের 'সংবাদ প্রভাকরে'র ৫৩০০ সংখ্যায় লেখা আছে—

> "বাসেন্দা লোকেরা আপন ২ গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট স্কুল বন্ধ হইয়াছে। কালেক্টর সাহেব সরকারী টাকার সিন্ধুক স্থানান্তরে রাখিয়াছেন! সাঁওতাল জাতিরা যদ্যপি অত্যাচারী সাহেবদিগের অত্যাচারের প্রতিফল দিয়া ক্ষান্ত হইত তবে ক্ষতি ছিল না। কারণ যাহারা বলপূর্ব্বক স্ত্রীলোক-দিগের সতীত্ব নাশ করে তাহাদিগের প্রাণ বধ করিলেও ক্রোধানল শীতল হয় না। কিন্তু অসভ্য জাতিরা প্রজাপুঞ্জের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিতেছে! তাহারা যে গ্রাম দিয়া আসিতেছে, সেই গ্রাম লুট ও অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিতেছে, শত শত মনুষ্যের প্রাণ নষ্ট করিতেছে।"[১]

জানা যায়, দারোগা হত্যার পরই সাঁওতালরা ভাগলপুর জেলার গোড্ডা অঞ্চলের কুখ্যাত নীলকর জন ফিজ্ প্যাট্রিকের জমিদারীর ওপর আক্রমণ চালাল। প্যাট্রিক সাহেব ১১ জুলাই ভাগলপুরের কমিশনারকে জানান যে, 'গোচ্চো মাঝির নেতৃত্বে কয়েক হাজার সাঁওতাল ঐ অঞ্চলের পলাতক মহাজন-ব্যবসায়ীদের খুঁজে খুঁজে বের করে হত্যা করছে এবং তাঁর জমিদারীর ওপরও আক্রমণ চালাচ্ছে।'[২] এর ফলে চারদিকে একটা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। বিদ্রোহীরা পাকুড় জমিদারীর অন্তর্গত অম্বর পরগনার নিকটবর্তী হ'লে লক্ষ্মণপুরের সিংরাই মাঝি সদলবলে গোচ্চোর সঙ্গে যোগ দিল এবং তারা লক্ষ্মণপুর গ্রামখানি লুণ্ঠন করল। এরপর তারা লিটিপাড়ার দিকে অগ্রসর হল। লিটিপাড়ার ইশ্রি ভকত ও তিলক ভকত এ খবর পেয়ে গোমস্তা তুতা ভকতের উপর সমস্ত কিছুর ভার ছেড়ে দিয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য পালিয়ে গেল। সাঁওতালরা ভকতের দোকানবাড়ী লুট করে এবং গোমস্তাকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিল। নিকটবর্তী জিতপুর গ্রামের দোকানদার ও মহাজনরা একটা মহুয়া গাছের কোটরে

১। 'সংবাদ প্রভাকর', ৫৩০০ সংখ্যা।

২। কে. কে. দত্ত. 'দি সান্তাল ইনসারেকশন অফ ১৮৫৫-৫৭', পৃ-৩০।

আত্মগোপন করলে, দরিদ্র গ্রামবাসীরা তাদের খ‍ুঁজে বের করে হত্যা করল। ইতিহাসে পাওয়া যায়, সাঁওতাল-বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে বাংলা ও বিহারের গরীব জনসাধারণ সাঁওতালদের পাশে এসে দাঁড়াতে লাগল। সরকারী গেজেটিয়ার রচয়িতা হাণ্টার সাহেব লিখে গেছেন—

> "সাঁওতাল ও হিন্দ‍ু সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী আধা-আদিবাসী শ্রেণী সম্প্রদায় এবং এমন কি নিম্নবর্ণের দরিদ্র হিন্দ‍ুরাও সাঁওতালদের বিদ্রোহে যোগদান করেছিল।"[১]

সাঁওতাল-বিদ্রোহের স্বর‍ূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুপ্রকাশ রায় বর্ণনা করেছেন—

> "সাঁওতাল বিদ্রোহ কেবল সাঁওতালদেরই বিদ্রোহ নয়, অথবা সামান্য একটা স্থানীয় ঘটনাও নয়, এই বিদ্রোহ ইংরেজ শাসনে ও শোষণে ভারতের প‍ূর্বাঞ্চলের দলিত পিষ্ট দিনমজ‍ুর গরীব চাষী ও কর্মহারা কারিগরদের মিলিত বিদ্রোহ। আর বিদেশী ইংরেজ-শাসন ও জমিদার মহাজনগোষ্ঠী এই বিদ্রোহের সাধারণ শত্র‍ু।"[২]

গ্রামের পর গ্রাম প‍ুড়ল, ল‍ুট হল। খেলা সাঁওতালের তীরে করণঘাটি গ্রামের মানিক শ‍ুঁড়ি এবং তার ছেলে নিহত হল। বিদ্রোহীরা হিরণপ‍ুর বাজার ল‍ুট করে সেখানের কয়েকজন স্থানীয় মহাজনকে হত্যা করল। এর পর তারা মানসিংহপ‍ুরের দিকে অগ্রসর হল এবং বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক ত্রিভুবন সাঁওতালের দলে যোগ দিল।

বিদ্রোহীদের এই মিলিত বাহিনী পাকুড়ের প্রায় দ‍ু' মাইল উত্তরে সংগ্রামপ‍ুরে উপস্থিত হল। এখানে আরো বহ‍ুসংখ্যক নিম্নশ্রেণীর হিন্দ‍ু এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল এবং তারা রহমদি মণ্ডল নামে এক ম‍ুসলমান জোতদারের বাড়ি ল‍ুট করে ভস্মীভূত করল। এবার পাকুড় আক্রমণের আয়োজন চলল। পাকুড়ের সমস্ত মহাজন ও ধনী ব্যক্তিরা এ খবর পেয়ে পাকুড় জমিদারীর অন্তর্গত অম্বর পরগনার দেওয়ান জগবন্ধ‍ু রায়ের আশ্রয় প্রার্থনা করল। তিনি অবিলম্বে স্ত্রীলোক ও শিশ‍ুদের স্থানীয় জমিদার-বাড়িতে আশ্রয় নিতে বললেন এবং রোশন নামে এক মাহ‍ুতকে জঙ্গীপ‍ুর পাঠালেন সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে বন্দ‍ুকের গ‍ুলি কিনে আনবার জন্য; কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে বন্দ‍ুকের গ‍ুলি না পাওয়াতে তিনি অগত্যা সবাইকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোর পরামর্শ দিলেন। ফলে, চারদিকে দার‍ুণ আতঙ্ক দেখা দিল। সমসাময়িক কালের এক গ্রন্থকার লিখেছেন—

> "তখন নারীদের কান্নার রোল উঠল, শিশ‍ুদের চিৎকার ও আর্তনাদ শোনা গেল, প‍ুর‍ুষেরা আবোল-তাবোল বকতে শ‍ুর‍ু করল এবং দিশেহারা হয়ে এদিক-ওদিক ছ‍ুটাছ‍ুটি করতে লাগল; পিতা তার সন্তানের কান্না শ‍ুনেও শ‍ুনল না; ব‍ৃদ্ধ, অক্ষম ও অসুস্থদের কথা

১। স‍ুপ্রকাশ রায়, 'ম‍ুক্তিয‍ুদ্ধে ভারতীয় কৃষক', প‍ৃ-৭৯।
২। ডর‍ু. ডর‍ু. হাণ্টার, 'দি অ্যানালস অফ র‍ুরাল বেঙ্গল', প‍ৃ-২৫০।

কেউ ভাবল না। বোঁচকা-বুচকি বাঁধাছাঁদা চলছিল, সমস্ত কিছু উল্টোপাল্টা অবস্থায় এলোমেলোভাবে মিলেমিশে ছিল। মোট কথা, এমন এক বিশৃঙ্খল এবং হৃদয়-বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হল, যা বর্ণনা করার চেয়ে কল্পনা করাই ভাল। আমাদের বয়স তখন ছ'বৎসর মাত্র, তবুও সেই সময়ের সর্বাত্মক দুঃখ ও অস্থিরতার কথা স্পষ্ট স্মরণে আছে এবং মনে যে ছাপ পড়েছে, তা কোনদিন মুছবে না। এই ভয়ঙ্কর দীর্ঘ রাত যে কি ভয় ও উদ্বেগের মধ্য দিয়ে কাটল তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু ভোর হওয়ার বহু পূর্বেই সমস্ত গ্রাম জনশূন্য হয়ে গেল। এই দুরবস্থার মধ্যে গ্রামবাসীরা ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গেল ; তারা কোথায় যাচ্ছে, ছেলেমেয়েরা ক্ষিদের জ্বালায় কাঁদলে তাদের কি খেতে দেবে, তারা তা জানত না। সমস্ত খাদ্যদ্রব্য, টাকা-পয়সা, বাসনপত্র, আসবাবপত্র, এক কথায় তাদের যা কিছু ছিল, সব তারা ফেলে রেখে গেল। সাঁওতালদের কাছ থেকে নিজেদের যতদূর সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল।"[১]

ইতিমধ্যে সিদু, কানু, চাঁদ ও ভৈরবের নেতৃত্বে এক বিরাট সাঁওতাল বাহিনী এসে উপস্থিত হল। ১১ই জুলাই সিদু-কানু পাকুড়ের রাজবাড়ি আক্রমণ করল। পূর্বেই রাজবাড়ি জনশূন্য হয়ে গেছল। পাকুড়রাজ সপরিবারে মূল্যবান অলঙ্কার ও দেবতা মদনমোহনের মূর্তি সঙ্গে নিয়ে সরে পড়েছিলেন। বিদ্রোহীরা রাজবাড়ি দখল করে ধন-সম্পত্তি ও অন্যান্য জিনিসপত্র লুট করল, এবং মহাজন ও সুদখোরদের খুঁজে খুঁজে বের করে নির্দয়ভাবে হত্যা করে প্রতিশোধ নিল। পাকুড় বিধ্বস্ত হওয়ার খবর সরকারের নিকট জানান হল—

"ধর্ম্মাবতার জয়তি।

পাহাড়ীয়া সাঁওতালগণ জমা হওয়া বিষয় বিস্তারিত গতকল্য হুজুরে নিবেদন করিয়াছি—অদ্য থানা নুরাইর গণেশ সিংহ বরকন্দাজ পাকুর মোকাম হইতে অত্র থানায় পঁহুছিয়া বরাবর কাছারির মধ্যে অধিন নিকট বাচনিক অদ্য দিবা একপ্রহর সময় আন্দাজ ৫০০০ সাঁওতাল তির খামচা টেঙ্গা তলওয়ার ডঙ্কা দিয়া চারিখানা পাল্কী সঙ্গে পাকোরী রাজধানীতে পহুঁছিয়া রাজধানী ও পাকুরী গ্রাম লুট করা সচক্ষে দেখাদী প্রকাশ করিল—কিন্তু পাকোরী মোকাম অত্র থানা হইতে ৫ ক্রোশ ব্যবধান—এদেশে আই যাই অধিক নাই এবং রেলওয়ে সাহেব লোক যে প্রকার ব্যস্ত হইয়া জিনিসপত্র লইয়া পলাইতেছে তাহা দেখিয়া এ দেহাতের প্রজালোক অনেক পলাইতেছে—এমত অবস্থায় উক্ত কাকেলা সাঁওতাল এদেশে পহুঁছিলে লুট হওয়া সম্ভব—অধিন শকল শহীত শতক্য থাকায় হুজুরের গোচরার্থে নিবেদন করিল ধর্ম্মাবতার কর্ত্তা নিবেদনমিতি

১৮৫৫/১২ জুলাই।"[২]

১। কে. কে. দত্ত. 'দি সান্তাল ইনসারেকশন অফ ১৮৫৫-৫৭', পৃ-৩২

২। কে. কে দত্ত, উপরে উল্লেখিত, পৃ-৮৫-৮৬।

বিদ্রোহীরা পাকুড় ত্যাগ করার পরই সেখানের সবচেয়ে ধনী মহাজন দীনদয়াল রায় ও তাঁর ভাই নন্দকুমার রায় ও অনুচরবর্গ সৃষ্টিধর পোদ্দার, নীলকমল মণ্ডল, নিতাই মণ্ডল ও যাদব মণ্ডল পাকুড়ে ফিরে এলেন। পলায়নের পূর্বে দীনদয়াল তাঁর ধনরত্ন মাটির নীচে লুকিয়ে রেখে গেছলেন। তিনি ফিরে এসে তাঁর লুকানো ধন যথাস্থানে দেখে যারপরনাই আনন্দিত হলেন এবং সদম্ভে ঘোষণা করলেন যে পাকুড়ের জমিদারের অবর্তমানে তিনিই এখন পাকুড়ের জমিদার। তিনি ও তাঁর অনুচরবর্গ প্রতিদিন নিকটবর্তী সাঁওতাল গ্রামগুলিতে গিয়ে সাঁওতালদের অনুপস্থিতির সুযোগে তাদের স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের উপর উৎপীড়ন চালাতে লাগলেন। কিন্তু এভাবে জমিদারগিরি তাঁকে আর বেশীদিন চালাতে হল না, কয়েকদিন পরই তার ফল পেলেন।

একদিন তিনি, তাঁর ভাই নন্দকুমার ও ভগ্নী বিমলার সঙ্গে পাকুড় রাজবাড়ির পূর্বদিকের পুকুরে স্নান করতে গেছলেন, এমন সময় অকস্মাৎ বিদ্রোহীদের কয়েকজন সেখানে এসে উপস্থিত হল। নন্দকুমার ও বিমলা কোনরকমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো, কিন্তু দীনদয়ালের পক্ষে পালানো সম্ভব হল না। সাঁওতালরা তীর-ধনুক, টাঙ্গি-তরোয়াল নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করল। দীনদয়াল ধরা পড়লেন এবং অত্যন্ত নৃশংসভাবে তাঁকে হত্যা করা হল। জগন্নাথ সর্দার নামে দীনদয়ালের এক সাঁওতাল ভৃত্য বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিয়েছিল। জগন্নাথই এগিয়ে গিয়ে টাঙ্গির এক একটি কোপে দীনদয়ালের এক একটি অঙ্গচ্ছেদ করল। হাতের আঙ্গুলগুলো এক কোপে কেটে নিয়ে জগন্নাথ চিৎকার করে বলেছিল: 'এই আঙ্গুল দিয়ে তুমি শোষণের টাকা গুনেছিলে!' হাত দুটো কেটে ফেলে চিৎকার করে বলেছিল: 'এই হাত দিয়ে তুমি দীন-দুঃখীর অন্ন কেড়ে নিয়েছিলে।' এভাবে দীনদয়ালের এক একটি অঙ্গ কেটে তবে তাঁকে শেষ করেছিল জগন্নাথ। পরে তাঁর মাথাটা নিকটস্থ শিবমন্দিরের কুলঙ্গিতে সাঁওতালরা রেখে দিয়েছিল।

পাকুড় লুট করার পর সাঁওতালরা কালিকাপুর,, বল্লভপুর, বালিহারপুর, সাহাবাজপুর, নবিনগর প্রভৃতি গ্রামের মহাজন ও নীলকর সাহেবদের কুঠি, কাছারি, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে লুট করে মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তে উপস্থিত হল। মুর্শিদাবাদ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ টুগুড পূর্বেই সাঁওতাল বিদ্রোহীদের খবর পেয়েছিলেন। তিনি সেভেন্‌থ্ রেজিমেণ্টের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে বিদ্রোহীদের বাধা দেবার জন্য অগ্রসর হলেন। ইতিমধ্যে সাঁওতালরা কদমসায়ের গ্রামের কুখ্যাত নীলকর মাসেইক্ সাহেবের কুঠি আক্রমণ করল। কুঠি রক্ষার জন্য মাসেইক্ সাহেবের ভাই বহু লাঠিয়াল ও বরকন্দাজ পাঠিয়েছিলেন ধুলিয়ান থেকে; তারা প্রাণপণে বাধা দেওয়ায় সাঁওতালরা মহেশপুরে গিয়ে হাজির হল এবং মহেশপুরের রাজবাড়ি আক্রমণ করে বহু ধনরত্ন লুট করল।

> "পৌঁছিল সাঁওতাল সবে কলরবে মহেশপুর গিয়ে,
> লুটিল দুষ্টাচয় রাজালয় ধনরত্ন নিল,
> নিল সব রেশমীবসন স্বর্ণভূষণ।"[১]

---

১ কে. কে. দত্ত, উপরে উল্লেখিত, পৃ-৩৫।

বহরমপুর থেকে সেভেন্থ্ রেজিমেন্টের এক বিরাট বাহিনী ১৩ জুলাই কদমসায়েরে এসে পেঁছাল। সাঁওতাল বিদ্রোহীরা তখন মহেশপুরের পথে। ১৫ জুলাই পাকুড়ের নিকট তরাই নদীর তীরে সাঁওতাল বিদ্রোহীদের সঙ্গে সেভেন্থ্ রেজিমেন্টের সাক্ষাৎ হল। সাঁওতালরা এ আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না, তবুও তারা তীর-ধনুক, টাঙ্গি-তরোয়াল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুশিক্ষিত ইংরাজ সৈন্যবাহিনীর উপর। কিন্তু বন্দুকের সঙ্গে সেকেলে অস্ত্রশস্ত্র আর কতক্ষণ টিকে থাকতে পারে? কিছুক্ষণের মধ্যেই অসংখ্য রক্তাক্ত দেহ মাটিতে পড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। এ যুদ্ধে দু'শতাধিক সাঁওতাল নিহত ও সিদু, কানু ও ভৈরব আহত হলেন।

অন্যদিকে ত্রিভুবন সাঁওতাল ও মানসিং মাঝির নেতৃত্বে সাঁওতালরা দুমকার আশেপাশে বহু নীলকুঠি ধূলিসাৎ করল এবং জমিদার মহাজনদের ধন-সম্পত্তি, গরু-মহিষ লুট করে তাদের ঘরবাড়ি সব জ্বালিয়ে দিল। দু'জন ইংরাজ মহিলা মিসেস টমাস ও মিস্ পেল এবং হেনেসি সাহেব ও তাঁর দুই পুত্র মহারাজপুরের কাছে নিহত হলেন। জানা যায়, ত্রিভুবন সাঁওতাল, বোরিওর মানসিং মাঝি, মজুরহাটির রূপু মাঝি, বারোমাসিয়ার মেঘু মাঝি তাদের দলবল নিয়ে ভুইপাড়ার দিকে যাচ্ছিল। সাহেব ও মেমরা এ সময় হাতী ও ঘোড়ায় চড়ে বিলের মধ্যে দিয়ে মহারাজপুরের দিকে পালাবার চেষ্টা করছিল। জনকয়েক সাঁওতাল তাদের দেখতে পেয়ে ঘেরাও করে হত্যা করল। সিদু-কানু কিন্তু নারী হত্যা সমর্থন করেন নি। দিগম্বর চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, সিদু-কানু নারীহত্যা সমর্থন তো দূরের কথা, বরং অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন।

আর একদল সাঁওতাল সাহেবগঞ্জের দিকে গেল। সেখানে অনেক নীলকর সাহেবের বাস। সাহেবরা পূর্বেই সরে পড়েছিল। সাঁওতালরা সাহেবদের শূন্য কুঠিগুলিতে আগুন লাগিয়ে দিল। পরে তারা দেখতে পেল যে, অনেক-গুলি নৌকার উপর লোকজন ও জিনিসপত্র নিয়ে সাহেবরা নদী থেকে তাদের গৃহদাহ দেখছে। কয়েকজন সাঁওতাল তখন কোমর পর্যন্ত জলে নেমে সাহেবদের দিকে তীর ছুঁড়তে লাগল, কিন্তু তীর সাহেবদের নৌকায় পেঁছাল না বরং সাহেবদের বন্দুকের গুলিতে কিছু সাঁওতাল নিহত হল। অগত্যা সাঁওতালরা তীরে ফিরে এসে সাহেবদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল, কিন্তু সাহেবরা আর ফিরল না, অন্য দিকে পালিয়ে গেল।

ফুদীকপুরে লারকিনস্ নামে এক কুখ্যাত নীলকর সাহেব বাস করত। চাঁদরাই তার দল নিয়ে আসছে শুনে সাহেব তার লোকজনদের নিয়ে বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত হল। সর্বাগ্রে বন্দুক নিয়ে হাতীর পিঠে লারকিনস্ সাহেব, তার দু'পাশে ঘোড়ায় চড়ে তার দুই ছেলে, পিছনে লোহাবাঁধা লাঠি নিয়ে প্রায় একশ পশ্চিমী লাঠিয়াল। এক বাঁশবনের কাছে দু'দলের সাক্ষাৎ হল। সাহেব ভেবেছিল যে, তাকে দেখে সাঁওতালরা পালিয়ে যাবে। কিন্তু যখন দেখল যে

সাঁওতালরা পালাল না তখন সাহেব রাগে লাঠিয়ালদের আক্রমণ করতে হুকুম দিল। লাঠিয়ালরা ভয়ঙ্কর চিৎকার করে লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে অগ্রসর হল। সাঁওতালরাও তীর ছুঁড়তে লাগল এবং তাদের তীরের আঘাতে কিছু লাঠিয়াল মারা পড়ল। লাঠিয়ালরা আর এগুতে চাইল না। লারকিনস্ সাহেব তখন নিজেই অগ্রসর হল। সাহেবের গুলিতে দুজন সাঁওতাল নিহত হল। সাঁওতালরা ক্ষিপ্ত হয়ে সাহেব ও দুই ছেলেকে তীরবিদ্ধ করে হত্যা করল। লাঠিয়ালরাও যেদিকে পারল পালাতে লাগল। সাঁওতালরা জয়ধ্বনি দিতে দিতে, সাহেব ও তার দলের লোকদের অস্ত্রশস্ত্র, বন্দুক, বর্শা ও লাঠি দখল করল।

রেলপথের সাহেবরাও বাদ পড়ল না, সাঁওতালরা তিনজন সাহেবকে হত্যা করে সাঁওতাল স্ত্রীলোকদের উদ্ধার করল। 'সংবাদ প্রভাকর'-এ পাওয়া যায়—

> "অতি অল্প দিবস হইল রাস্তাবন্দি সাহেবরা রাজমহলের নিকট ঐ বন্য জাতিদিগের তিনজন স্ত্রীলোককে বলপূর্বক অপহরণ করাতে তাহারা কতকগুলি লোক একত্রিত হইয়া উক্ত সাহেবদিগের প্রতি আক্রমণ করতঃ তিনজন সাহেবকে হত্যা করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে উদ্ধার করে।"[১]

বিদ্রোহের খবর বর্ধমানেও এসে পড়ল। সেখানের অধিবাসীরা তো তখন ভয়ে অস্থির। এক সংবাদদাতা বর্ধমানের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন—

> "আমারদিগের এই বর্দ্ধমানবাসি ধনি ও দুঃখি সকলেই অতিশয় ত্রাসযুক্ত হইয়াছেন, তদ্দেতু এই ধনি লোকেরা আগত রাজবিদ্রোহী পর্ব্বতীয় সাঁওতালগণের দৌরাত্ম সংবাদ শ্রুত হইয়া ধন, মান, প্রাণ রক্ষার বিবিধ প্রকার উপায় চিন্তা করিতেছেন, যথা কেহ বা দ্বারদেশে নিয়মিত প্রহরির দশ গুণ বৃদ্ধি করিয়াছেন, কেহ বা মৃত্তিকা খননপূর্ব্বক অর্থ লুক্কায়িত করিয়া কেবল ত্রাহি মধুসূদন ত্রাহি মধুসূদন এই শব্দ করিতেছেন, কেহ বা সংবাদপত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্থির রহিয়াছেন, কেহ বা কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্য কতগুলিন গেল তাহারি সংবাদ রেইলওয়ে ষ্টেশনে জানিতেছেন, ইত্যাদি প্রকারে মহা কোলাহল রব উঠিয়াছে, ধবল রাজপুরুষেরা অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া বন্দুক ও বারুদ আদি আগ্নেয়াস্ত্র সুশোভন করিতেছেন, সাঁওতাল জাতীয়দের গুরুতর কোপ কেবল তাঁহারদের উপর, বীরভূম রাজমহল আদি অনেক জিলায় রেইলওয়ে সংক্রান্ত কয়েকজন সাহেব ও বিবিকে অস্ত্রের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়াছে এবং বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অতিশয় বিপদাপন্ন হইয়াছেন।"[২]

১। 'সংবাদ প্রভাকর', ১২ই শ্রাবণ, ১২৬২ সাল।
২। বিনয় ঘোষ, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', চতুর্থ খণ্ড, পৃ-৭৯১।

বীরভূমের অবস্থা সর্বাপেক্ষা শোচনীয় হয়ে উঠল। বিদ্রোহীরা গ্রামের পর গ্রাম দখল করল এবং নলহাটি, রামপুরহাট, নাগোর, সিউড়ি, লাঙ্গুলিয়া, গুর্জোরি প্রভৃতি জায়গা থেকে ইংরাজ শাসন প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলল। বিদ্রোহীদের আক্রমণ প্রতিদিনই বৃদ্ধি পেতে লাগল। জমিদার, মহাজন, নীলকর সাহেব ও তাদের কর্মচারীরা প্রাণের ভয়ে সব কিছু ফেলে পালাল। সমসাময়িক কালের এক বিবরণ থেকে জানা যায়—"২০শে জুলাইয়ের মধ্যে বীরভূমের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর তালডাঙ্গা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সাঁইথিয়া পর্যন্ত এবং উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গার তীরবর্তী ভাগলপুর ও রাজমহল থেকে ভাগলপুর জেলার উত্তর-পূর্বভাগ পর্যন্ত বিদ্রোহীদের আধিপত্য অব্যাহত ছিল।"[১]

১। 'ক্যালকাটা রিভিউ', ১৮৫৬।

চৌদ্দ

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ জুলাই। বর্ষা তখনও আরম্ভ হয়নি। মেজর বারোজ এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে পিয়ালাপুরে উপস্থিত হলেন, সঙ্গে আরো বহু সামরিক অফিসার। তাঁদের মধ্যে আছেন বিশেষভাবে মেজর স্টুয়ার্ট ও কর্নেল জোন্স্। এ ছাড়া আর তিনজন ইংরাজ অফিসার চার্লস ইজারটন, জেমস্ পন্টেট্ ও অ্যাসলী এডেন উপস্থিত হয়েছেন ভাগলপুর কমিশনারের নির্দেশে মেজর বারোজকে সাহায্য করার জন্য। এখানে বলে রাখা ভাল যে, ইজারটন সাহেব হলেন পুলিসের প্রধান কর্তা ও এডেন সাহেব জঙ্গিপুরের হাকিম। তাঁদের সঙ্গে আছেন ডাক্তার এডমণ্ড রোপার। সাঁওতাল বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার জন্য বিপুল আয়োজন চলছে ইংরাজ শিবিরে।

পিয়ালাপুরের কিছু দূরেই পীরপৈঁতি গ্রাম, আর তার কাছেই একটা গিরিসঙ্কট। দিনের বেলাতেই জায়গাটা ছমছমে। দু'ধারে বন ও কাঁটাগাছের ঝোপঝাড়, এদিক-ওদিকে বড় বড় পাথর ছড়ানো। এই বন ও ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে রসদপত্র নিয়ে এগিয়ে যাওয়াই কণ্টকর। কিন্তু তা হলে কি হবে! সাঁওতালদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতেই হবে। কারণ, কোম্পানিব রাজত্বকে ধ্বংস করার জন্য তারা হামলা চালাচ্ছে সর্বত্র। গিরিসঙ্কটের ওপাশে পাহাড়ের উপর সাঁওতালদের শিবির। পাহাড়ের নীচে একটা গভীর নালা। বৃষ্টি হলেই নালা কানায় কানায় ভরে ওঠে, তখন নালার চেহারা হয় মারাত্মক, ভয়ঙ্কর। নালা পার হওয়ার কোন উপায় আর থাকে না। এই নালার ওপাশে কিছু দূরে সাঁওতালরা তিনটি ঘাঁটি তৈরি করেছে। প্রথম ঘাঁটির ভার পড়েছে চাঁদরাই মাঝির উপর। পাড়ারকোলার শ্যাম পরগনাইৎ ও পীপড়া গ্রামের সাঁওতালরা চাঁদরাই মাঝিকে সাহায্য করার জন্য নিযুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘাঁটির ভার যথাক্রমে গর্ভু ও বিক্রম মাঝির উপর। তৃতীয় ঘাঁটির ওপাশে সিদু-কানুর প্রধান সৈন্যদল। সাঁওতালদের ঘাঁটিগুলো থেকে গুমগুম নাগড়ার আওয়াজ ভেসে আসছে।

দুপুরবেলা মেজর বারোজ সৈন্যদল ও বহু কামান-বন্দুক নিয়ে গিরিসঙ্কটে প্রবেশ করলেন। কোন দিক থেকে কোন রকম আক্রমণের লক্ষণ দেখা গেল না। সৈন্যদল বীরদর্পে মার্চ করে এগিয়ে চলল। কিন্তু সাঁওতালরা প্রথম থেকেই সমস্ত কিছু লক্ষ্য করে আসছিল। ইংরাজ সৈন্যরা গিরিসঙ্কট ও নালা পেরিয়ে সামান্য অগ্রসর হতেই কয়েক ঝাঁক তীর এসে পড়ল তাদের উপর। ইংরাজ সৈন্যদের বন্দুকগুলোও গর্জে উঠল, সেই সঙ্গে কামানগুলো থেকে প্রচণ্ড গোলা-বর্ষণ শুরু হল। সাঁওতালরাও গোলাগুলি উপেক্ষা করে গাছের আড়াল থেকে তীর ছুঁড়তে লাগল, তীরের আঘাতে ইংরাজপক্ষের অনেকে ঘায়েল হল। জঙ্গলের আড়াল থেকে অগণ্য তীর সাঁই সাঁই করে ছুটে আসছে। সামনে এগোনো আর মোটেই নিরাপদ নয়। মেজর স্টুয়ার্ট ও তাঁর দলের অবস্থা

শোচনীয় হয়ে উঠল। দুধারে উঁচু পাহাড় ও জঙ্গল, কোনদিকে সরে পড়বার উপায় নেই, পালাবার পথটুকুই শুধু খোলা। কিন্তু যুদ্ধ না করে পালানো ইংরাজের রীতি-বিরুদ্ধ। স্টুয়ার্ট সাহেব অবিলম্বে সাহায্য পাঠাবার জন্য কর্নেল সাহেবকে খবর পাঠালেন। এর পর, তিনি সৈন্যদলকে দু'ভাগে ভাগ করলেন। অর্ধেক সৈন্যকে নালার মুখে রেখে তাদের পাহাড়-জঙ্গলে গুলি চালিয়ে তীরবৃষ্টি থামাবার নির্দেশ দিলেন এবং বাকী অর্ধেক সৈন্য নিয়ে তিনি সাঁওতালদের ঘাঁটি আক্রমণ করলেন। বিদ্রোহীরা তৈরিই ছিল! চাঁদ-রাইয়ের নেতৃত্বে হাজার হাজার সাঁওতাল তীর-ধনুক, টাঙ্গি ও কুড়াল নিয়ে মূর্তিমান ধ্বংসের মত বন্দুকধারী সুশিক্ষিত ইংরাজ সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আধুনিক মারণাস্ত্রের সঙ্গে সরাসরি পাল্লা দিয়ে চালাতে লাগল প্রাচীন তীর-ধনুক, টাঙ্গি ও কুড়াল। সাঁওতালদের এই দুঃসাহস দেখে কোম্পানির হোমরা-চোমরা অফিসাররা পর্যন্ত চমকে উঠল। তুমুল যুদ্ধ চলতে লাগল।

এদিকে স্টুয়ার্ট সাহেবের কথামত কর্নেল সাহেব ইজারটন ও এডেন সাহেবের অধীনে আরো সৈন্য পাঠালেন। পথে কোন বাধা নেই। বন্দুকের গুলি ও উভয়পক্ষের চিৎকারে শুধু জানা যাচ্ছে সাঁওতালদের ঘাঁটিতে তুমুল যুদ্ধ চলছে। নালার কাছে বহু সিপাহী তীরবিদ্ধ হয়ে ছটফট করেছে। ইজারটন সাহেব সৈন্যদের তাড়াতাড়ি অগ্রসর হওয়ার জন্য হুকুম করলেন।

শ্যাম পরগনাইৎ ও তাঁর দল খুব সাহসের সঙ্গে ঘাঁটি রক্ষা করছিল। ইংরাজ সৈন্যরা পাড়ারকোলার সাঁওতালবাহিনীর উপর গিয়ে পড়ল। পীপড়ার সাঁও-তালরা সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাহায্য করার জন্য ছুটে এল। ধোঁয়ায় কিছু দেখা যায় না, ইংরাজ সৈন্য আক্রমণের পর আক্রমণ চালাতে লাগল। শ্যাম পরগনাইৎ নিহত হলেন, ফলে অরণ্যের দাবানলের মত জ্বলে উঠল অরণ্য-সন্তানরা।

> "জানাম দিশম্ লাগিৎতে হো,
> দোলায়া পায়রঃক্'তাবেন পে।"

অর্থাৎ—

> "এস জন্মভূমির জন্য
> আমরা এগিয়ে যাই।"

ইংরাজ সেনানায়করা ভেবেছিল যে, অশিক্ষিত সাঁওতাল বাহিনীর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালালে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য দেখে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ল। মেজর-জেনারেল লয়েডের কাছে সেদিনের যুদ্ধের বিবরণ দিতে গিয়ে ভাগলপুরের কমিশনার লিখেছেন—

> "বিদ্রোহীরা নির্ভীকভাবে প্রাণপণে যুদ্ধ করেছিল। তাদের যুদ্ধাস্ত্র কেবল তীর-ধনুক আর এক প্রকারের কুড়াল (টাঙ্গি); তারা শুধু হাত দিয়েই তীর ছুড়ছিল না, মাটির উপর বসে পায়ের সাহায্যে ধনুক থেকেও তীর ছুড়ছিল।"[১]

১। কে কে. দত্ত, 'দি সান্তাল ইনসারেকশন অফ ১৮৫৫-৫৭', পৃ-২৬।

চারদিক থেকে সাঁওতালরা ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুড়ছে, মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে তারা টাঙ্গি আর কুড়াল নিয়েই ক্ষিপ্ত মোষের মত আঘাত হানছে শত্রুপক্ষের উপর। ইংরাজ সৈন্যরা বন্দুকে গুলি ভরবার সময়টুকু পাচ্ছে না, কাটা গাছের মত লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে। এমনভাবে যুদ্ধ করা সম্ভব নাকি? দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা বিদ্রোহীদের সঙ্গে ইংরাজ বাহিনীর তুমুল যুদ্ধ চলল। মেজর স্টুয়ার্ট আহত, সৈন্যরা তীরের আঘাতে জর্জর, তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ছে। ওদিকে নাগড়া বাজছে। নাগড়ার আওয়াজে পিঁপড়ের সারের মত পিল পিল করে সাঁওতাল বিদ্রোহীরা নেমে আসছে পাহাড়ের গা বেয়ে। চোখে-মুখে তাদের আরণ্যক হিংস্রতা, চিৎকার করতে করতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে ইংরাজ সৈন্যদের উপর। রক্তবীজের মত ক্রমেই তারা দলে ভারী হচ্ছে। এভাবে সাঁওতাল বিদ্রোহীদের সামনে দাঁড়ানো আর সম্ভব নয়, পশ্চাদপসরণ করাই শ্রেয়।

এদিকে দক্ষিণ-পূর্ব আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। গুড় গুড় করে মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ঝড়ে পাহাড়ের গাছ-পালা দুলতে শুরু করেছে। মেজর সাহেব বুঝলেন যে বৃষ্টি সন্নিকট। এ সুযোগে তিনি যুদ্ধ বন্ধ করে সৈন্যদের ফিরবার জন্য হুকুম দিলেন। নালার কাছে ইংরাজসৈন্যরা এক হাঁটু জল ঠেলে পার হল। ইংরাজ সৈন্যদের ভাগ্য ভাল যে সাঁওতালরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেনি। কারণ, শ্যাম পরগনাইতের মৃতদেহ দেখতে পেয়ে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মৃতদেহ নিয়ে তারা ফিরে গেল তাদের শিবিরে। এদিকে, কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ী নালা পাহাড়ী অজগরের মত গর্জন করতে করতে সমস্ত মৃতদেহ, ও অস্ত্রশস্ত্র কাঠের টুকরার মত ভাসিয়ে নিয়ে গেল। পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে মেজর বারোজ নীরবে, নিঃশব্দে ভাগলপুরে ফিরে এলেন। কারস্টেয়ার্স সাহেবের কথায়:

> "রেজিমেণ্টের পক্ষে এর বেশী আর কিছু করার ছিল না। অসম্মানের ডালি মাথায় করে আহতদের বয়ে নিয়ে তারা ভাগলপুরে ফিরে এলো, সারা দুনিয়াকে বলল কি প্রলয়ঙ্করী এক বন্যার মুখে পড়ে এরা নিশ্চিত বিজয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে।"[১]

১। আর. কারস্টেয়ার্স, 'হারমাজ ভিলেজ', পৃ-৩০৩।

পনেরো

সদ্য জয়লাভের উল্লাসে সাঁওতালরা বেপরোয়া হয়ে উঠল এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন জায়গার উপর আক্রমণ চালাতে লাগল। ২০শে জুলাই একদল বিদ্রোহী মিহিজানপুর ও নারাণপুর গ্রাম দুটি লুট করল। ছটুরায় দেশমাঞ্জহি নারাণপুর আক্রমণের ঘটনা বর্ণনা করে লিখেছেন ঃ

"আদো সিদো কানহু মহেশপুর লুট লাগিৎ কিন সেটেরেনলে আঁঞমকেৎ খান, নানকাররে হঁ বারয়া সুবা ঠাকুরকিন জানামএনা, মিৎ দো জাম্বড়োরেন মনি পারগানা আর মিৎ দো বারোমাসিয়ারেন রাম পারগনা। নুকিন হঁ নতেরে ফাদাকিন জুটাওকেৎলেতে নারায়ণপুর লুলুটলে চালাওএনা। আদো মোস্টেন সাহেবে নীল কুঠিলেৎ অনা টাণ্ডিরেলে ডেরাএনা, আর এন হিলোঃক্' দো গোটা ঞিদা ডুবু টামাক্ রুরু আর তুতু তুতু সাক্ওয়া অরংতেলে আঙ্গাকেৎআ ; অনা বতরতে দেকো কো দো ঞিদা ভিত্রিরেগে ধন-দুরীব, মিহু-মেরম্ অড়াঃক্'-দুওয়ার বাগিকাতে জিউয়ী বাঞ্চাও লাগিৎ জান্দে মান তান্দে বির্ পাকাড়রেকো দাড় ওকোএনা।

দসার হিলোক্' আঙ্গা তরা খান্গে ফাদ দো টামাক্ রুরুতে আর সাক্ওয়া তুতু অরংআতে নারাণপুর বাজার লুলুটলে বলএনা, আর চেলেগে বালে এ্যামলেৎকোওয়া। তবে মিৎটাং হাড়াম আর মিৎটাং বুড্হিকিন তাঁহেকানা আর জিউয়ী বাঞ্চাও লাগিৎ আঁড়ি কাঁউয়াঁরি কাতেকিন দোহায় দোহায়কেৎআ ; এনরেহঁ উনকিনাঃক্' দোহায় দো বাকো আঞমলাঃক্'আ ; অকয় কুরমুটাহা হড় চকো মাঃক্' গচ্কেৎকিনগেয়া। আদো লুলুট্লে পরতন্এনা, যাঁহাঁয়গে যাঁহাঁনাঃক্'কো হাত দাড়োয়াৎ। আদো লুট মোকাএকাতে ডেরাতেলে রুওয়াড় হেচ্'এনা!"[১]

অর্থাৎ—

"সিদো-কানহু মহেশপুর লুট করতে গেছে শুনে এদিকেও দুজন নেতা আবির্ভাব হল ; একজন জাম্বড়োর মনি পরগনাইৎ, অন্য জন বারোমাসিয়ার রাম পরগনাইৎ। তারা এক সাঁওতাল-বাহিনী সংগ্রহ করলে পর আমরা নারাণপুর লুট করতে গেলাম। মোস্টন সাহেব যেখানে নীলকুঠি তৈরি করেছিল, সেই মাঠে আমরা আস্তানা গাড়লাম এবং সারারাতই ঢাক বাজিয়ে ও শিঙ্গাধ্বনি দিয়ে কাটালাম। আর দিকুরা ভয়ে রাতের মধ্যেই ধন-সম্পত্তি, গরু-ছাগল, ঘর-বাড়ি সব ছেড়ে যেদিকে পারল বনে-জঙ্গলে প্রাণ বাঁচানোর জন্য আত্মগোপন করল।

১। 'ছটরায় দেশমাঞ্জহি রেয়াঃক্' কাথা', পৃ-৯-১০।

পরদিন সকাল হতেই সাঁওতাল বাহিনীসহ আমরা ঢাক বাজাতে বাজাতে ও শিঙ্গাধ্বনি দিতে দিতে নারাণপুর বাজারে প্রবেশ করলাম, কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলাম না। এক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা কেবল ছিল। তারা প্রাণের জন্য বহু কাকুতি মিনতি করল, কিন্তু কেউ তাদের কথা শুনল না। কে একজন নির্দয়ভাবে তাদের হত্যা করল। তারপর আমরা লুটপাট শুরু করলাম এবং যে যা পারলাম লুট করে বাড়িতে ফিরে এলাম।"

পরে নারায়ণপুরের জমিদারকে সাঁওতালরা নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। প্রথমে হাঁটু পর্যন্ত পা দুটো কেটে তারা বলেছিল—এ লে, চার আনা শোধ হল। তারপর কোমরে কেটে বলেছিল লে, আট আনা হল। তারপর হাত দুটো কেটে তারা বারো আনা শোধ করেছিল। সবশেষে মাথা কেটে তারা চিৎকার করে বলেছিল—ফারকাটি, অর্থাৎ সব শোধ হল।

আর এক ঘটনার কথাও উল্লেখ করতে হয়। নারাণপুরের এক মহাজন প্রাণের ভয়ে পুকুরের জলে লুকিয়েছিল। সাঁওতালরা দেখতে পেয়ে চারদিক থেকে তীর ছুড়ে নির্দয়ভাবে তাকে হত্যা করেছিল।

২১ শে জুলাই বাঙ্গালী মহাজন ও ঘাটোয়ালদের নিয়ে এক সশস্ত্র পুলিস বাহিনী কাতনা গ্রামে একদল বিদ্রোহীর গতিরোধ করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুলিস-বাহিনী পরাজিত হল। ২৩শে জুলাই বিদ্রোহীরা আরো কয়েকটি গ্রাম ও বিখ্যাত গণপুর বাজার ধ্বংস করল। গণপুর ছিল ব্যবসায়ীদের এক বিরাট কেন্দ্র, এখানে দেশীয় প্রক্রিয়ায় লৌহ নিষ্কাশন করা হত। গণপুর আক্রমণের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে ছটুরায় দেশমাঞ্জহি লিখেছেন ঃ

"আদো সুবা ঠাকুরকিন নেণ্ডাকেৎতালেয়া, মেয়াঙ দো গুনপুরা বাজার লুলুটবোন চালাঃক্'আ। আদো নেণ্ডা বাড়াকাতে আয়ুপ্' বের্ আপান আপিন অড়াঃক্'তেলে চালাওএনা, আর সুবাকিন দো বারোমাসিয়ারেকিন তাঁহেয়েনা। আদো নেণ্ডা দিনরে গুনপুরা লুলুটলে চালাওএনা আর অণ্ডে হঁ টামাক রেয়াঃক্' ডুবু ডুবু সাডে আর সাক্ওয়া রেয়াঃক্' তুতু তুতু সাডেতে দেকো হপন দো বতরতে ফাদকো আউরীলে সেটেরঃক্'তেগে অন্তে নতে জিউয়ী তেওয়েএকাতেকো দাড়কেৎআ, অণ্ডে হঁ খাতিরজমালে লুটকেৎআ। আদো লুট মোকোএ বাড়াকাতে আপান-আপিন অড়াঃক্'তেলে রুওয়োড় চালাওএনা আর সুবাকিন হঁ আপান-আপিন অড়াঃক্'তেকিন রুওয়াড় চালাওএনা।"[১]

অর্থাৎ—

"এবার দুই নেতাই ঠিক করলেন যে পরশু আমরা গণপুর বাজার লুট করতে যাব। দিন ধার্য করে আমরা রাত্রে যে যার বাড়িতে

১। 'ছটরায় দেশমাঞ্জহি রেয়াঃক্' কাথা', পৃ-১০।

এলাম এবং নেতারা বারোমাসিয়াতে থাকলেন। নির্দিষ্ট দিনে আমরা গণপুর লুট করতে গেলাম। ঢাকের শব্দ ও শিঙ্গাধ্বনি শুনে দিকুরা আমাদের সাঁওতাল-বাহিনী পেঁছিবার পূর্বেই প্রাণের ভয়ে এদিক ওদিক পালাল। এখানেও আমরা প্রচুর লুট করলাম। তারপর আমরা যে যার বাড়িতে ফিরে এলাম ; নেতারাও তাদেব বাড়িতে ফিরে গেলেন।”

এরপর বিদ্রোহীদের আক্রমণ হয়ে উঠল দুর্বাব। দীর্ঘদিনের শোষণ ও উৎপীড়নের জাল থেকে মুক্তির আনন্দে তারা আর কোন বাধাই মানতে চাইল না। সাঁওতাল পরগনার গোড্ডা, পাকুড়, মহেশপুর, মুর্শিদাবাদের বহু গ্রাম, বীরভূমের নলহাটি, রামপুরহাট, রাজনগর ও অন্যান্য এলাকার বহু গ্রাম বিদ্রোহীদের দখলে এল। লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌ টোলমেইন এক বিরাট সৈন্যদল নিয়ে বিদ্রোহী-দের বাধা দিতে এলেন, কিন্তু বিদ্রোহীদের ঠেকাবার মত ক্ষমতা ছিল না ইংরাজ সৈন্যদলেব। খয়রাশোলের কাছে প্রচণ্ড যুদ্ধে ইংরাজ সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণ-রূপে পরাজিত হয় এবং লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌ টোলমেইন ও বহু সৈন্য নিহত হল।

বিদ্রোহীদের শক্তি দেখে ইংরাজ শাসকবর্গ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। ইংরাজ শাসনকে রক্ষা করার জন্য বড়লাট লর্ড ডালহৌসির নির্দেশে পূর্বাঞ্চলের সমগ্র সামরিক শক্তি নিয়োগ করা হল। নীলকর সাহেবরা তাদের ধনবল ও জনবল ইংরাজ সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিল। বাঙ্গলা ও বিহারের জমিদাররা অস্ত্র, পাইক-বরকন্দাজ ও অর্থ দিয়ে ইংরাজ শাসকগোষ্ঠীকে সাহায্য করল। মুর্শিদা-বাদের নবাব সৈন্য, রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র তো দিলেনই, উপরন্তু পঞ্চাশটি হাতী পাঠালেন সাঁওতালদের ঘরবাড়ি ধূলিসাৎ করে দেওয়ার জন্য। হাণ্টার সাহেবের বিবরণে পাওয়া যায়—

> “সৈন্যবাহিনী দলে দলে পশ্চিমদিকে যাত্রা করল। দেশভক্ত জমিদার ও মহাজনরা এই সকল বাহিনীর জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ সংগ্রহ করে দিল। নীলকর সাহেবরা প্রচুর সাহায্য করল এবং মুর্শিদাবাদের মহামান্য নবাব বহু সৈন্য ও একদল শিক্ষিত হাতী পাঠিয়ে তাদের খরচ দেবার সংকল্প ঘোষণা করলেন। আর বিদ্রোহ যে কোন ভাবেই দমন করার জন্য বিশেষ ক্ষমতাসহ একজন স্পেশ্যাল কমিশনার নিযুক্ত হলেন।”[১]

জুলাই মাসের মধ্যেই হাজার হাজার সৈন্য এল দানাপুর সামরিক ঘাঁটি থেকে। ছোটনাগপুর, সিংভূম, হাজারীবাগ এবং মুঙ্গেরের ম্যাজিস্ট্রেট্‌রাও তাদের সাধ্যমত সৈন্য ও বহু হাতী পাঠালেন। এভাবে ইংরাজ সেনানীদের নেতৃত্বে পনেরো হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য উপস্থিত হল সাঁওতাল বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য। জুলাই মাসের শেষভাগে মেজর-জেনারেল লয়েড স্বয়ং সৈন্য পরিচালনের দায়িত্ব নিলেন। তিনি বিভিন্ন সৈন্যাধ্যক্ষদের সাহায্যে

১। ডব্লু. ডব্লু. হাণ্টার, ‘দি অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল’, পৃ-২৪৬।

বিদ্রোহীদের দমনের জন্য ব্যাপক অভিযান শুরু করলেন। অন্যদিকে সাঁওতাল নেতারাও কিছুমাত্র ভয় না পেয়ে তীর-ধনুক, টাঙ্গি, তরোয়াল ও বর্শা নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল।

এবার ইংরাজ সেনাপতি মেজর বারোজ এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে পিয়ালাপুরের দিকে অগ্রসর হলেন। পিয়ালাপুর তখন সাঁওতালদের একটা বড় ঘাঁটি। মেজর বারোজ পিয়ালাপুর ও আরো কয়েকটি সাঁওতাল গ্রাম আক্রমণ করে ধ্বংস করলেন। সাঁওতালদের কুঁড়েঘরগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল, হাজার হাজার সাঁওতাল বৃদ্ধ, শিশু ও নারী নিহত হল। ২৯শে জুলাই লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌ কাহিলের নির্দেশে ক্যাপ্টেন শেরউইল ৪০শ নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী নিয়ে বারোখানি সাঁওতাল গ্রাম ধ্বংস করলেন। সাঁওতাল বিদ্রোহীরা কামান-বন্দুকে সুসজ্জিত ইংরাজ বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পেরে বনে-জঙ্গলে পলায়ন করল। কিন্তু পলায়নের সময়ও তারা বলবাদ্দা গ্রামের নীলকুঠি ধ্বংস করে গেল। সাঁওতালদের জব্দ করতে না পেরে ইংরাজ সেনানায়করা পাইকারি-ভাবে নরহত্যা শুরু করল। এ অবস্থার মধ্যেও বিদ্রোহীরা সুযোগ বুঝে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ইংরাজ সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালাতে লাগল। লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌ বার্নের সৈন্যবাহিনীর উপর অতর্কিতে আঘাত হেনে বিদ্রোহীরা উধাও হল। এ রকম ঘটনা আরো কয়েক জায়গায় ঘটতে দেখে ইংরাজ সেনানায়করা নগ্ন বর্বরতার আশ্রয় নিল। সাঁওতালদের গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করে তারা ধ্বংসের তাণ্ডব আরম্ভ করল। কত যে নিরীহ আদিবাসী প্রাণ হারাল, কত যে আদি-বাসী কুটির ধূলিসাৎ হল তার হিসেব নেই। মেজর শাকবার্গ পনেরোটি সাঁওতাল গ্রাম ধ্বংস করলেন। ২৯শে জুলাই মেজর বারোজের নির্দেশে লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌ গর্ডন, মুনহান ও মুনকাতরো গ্রাম দুটি ধূলিসাৎ করলেন। ৩০শে জুলাই লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌ রুবি বহু সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিস নিয়ে ভুগ্যা, তিতোরিয়া, ভুসকুদার, রাংগাকিতা, হুরিয়ালিয়া, কামুলদে ও বোচাই নামক আরো সাতটি সাঁওতাল গ্রাম ধ্বংস করলেন।

অন্যদিকে, ইংরাজ সামরিক কর্তৃপক্ষ বারহাইত দখলের আয়োজন করলেন। মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ টুগুড বহু সৈন্য ও হাতী নিয়ে প্রধান সৈন্য-বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হলেন। বারহারোয়া-বারহাইত সড়ক ধরে কোম্পানির সৈন্য এগিয়ে চলল। ২৪শে জুলাই রঘুনাথপুরে চাঁদ ও কানুর সাঁওতাল-বাহিনীর সঙ্গে ইংরাজ সৈন্যদের প্রচণ্ড লড়াই হল। শক্তিশালী ইংরাজ সৈন্যদের সামনে টিকতে না পেরে সাঁওতালরা পলায়ন করতে বাধ্য হল। ইংরাজ বাহিনী বারহাইত দখল করল। সঙ্গে সঙ্গে বারহাইতের পাশাপাশি সমস্ত সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রামও পুড়িয়ে ছারখার করা হল। এবার ভগনাডিহি গ্রাম ধ্বংস করা চাই। মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে গোলন্দাজ, অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী ভগনাডিহি গ্রাম ধ্বংসের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। গ্রামে সাঁওতাল জোয়ানরা কেউ ছিল না। পুরুষের মধ্যে শুধু বুড়ো ও শিশু, বাকী শুধু মেয়েরা। এদের উপরই শিক্ষিত ইংরাজ সৈন্যরা আক্রমণ চালাল।

বন্দুকের গুলি ও কামানের গোলা দাগার পর একদল হাতী নিয়ে গোরা সিপাহীরা সাঁওতালদের ঘর-বাড়ি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে ও জ্বালাতে জ্বালাতে অগ্রসর হল। হাতীগুলো একটার পর একটা কুঁড়ে ঘর ভাঙ্গে। ঘরের ভিতর থেকে ব্যাকুল হয়ে বুড়ো-বুড়ি, ছেলে-মেয়েরা বেরিয়ে আসে ও সঙ্গে সঙ্গে গুলির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। নিদারুণ দৃশ্য। গোরা সৈন্যরা পৈশাচিক আনন্দে দেখতে থাকে কেমন ভাবে জ্বলন্ত ঘরের মধ্যে নিরস্ত্র অসহায় ছেলে-মেয়েরা, বুড়ো-বুড়িরা পুড়ে মরছে। যুবতী মেয়েদের ধরে গোরা সৈন্যদের উল্লাস বীভৎস হয়ে ওঠে।

গ্রামের উপর ঘন ধোঁয়া উঠতে দেখে সাঁওতাল জোয়ানরা নিকটবর্তী জঙ্গল ও দলদলি পাহাড় থেকে ছুটে এল গ্রামের লোকদের সাহায্য করার জন্য। গুলিবর্ষণ উপেক্ষা করে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল ইংরাজ সৈন্যদের উপর। ঝাঁকে ঝাঁকে তারা তীর ছুড়তে লাগল, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে টাঙ্গি ও তরোয়াল নিয়ে লড়াই করতে লাগল। অরণ্য সন্তানদের এই সংহার মূর্তি দেখে গোরা সৈন্যরা সন্ত্রস্ত হয়ে উম্মত্তের মত গুলি বর্ষণ করতে লাগল। সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। বহুক্ষণ যুদ্ধ চলল। গোরা সৈন্যদের আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে সাঁওতাল জোয়ানরা আর কতক্ষণ টিকে থাকতে পারে? স্ত্রী-পুত্র ও নিজস্ব বাসভূমি রক্ষার জন্য তারা একের পর এক প্রাণ দিল। হাজার সাঁওতাল শহীদের রক্তে ভগনাডিহির মাটি লাল হয়ে গেল। ভগনাডিহি গ্রাম রক্ষা করা গেল না, ভগনাডিহি বিধ্বস্ত হল।

ষোল

আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে নদিয়া ডিভিসনের কমিশনার মিঃ এ. সি. বিডওয়েলকে বিদ্রোহ দমনের জন্য স্পেশ্যাল কমিশনার পদে নিযুক্ত করা হল। কার্যভার গ্রহণ করেই তিনি বিদ্রোহ দমনের আয়োজন করলেন। তাঁর নির্দেশে সাঁওতালদের ওপর বীভৎস অত্যাচার চলতে লাগল। ফলে, অরণ্যভূমির রণাঙ্গন কিছুদিনের জন্য স্তব্ধ হল। ইংরাজ সরকার এটাকে বিদ্রোহের চূড়ান্ত পরাজয় ভেবে নিয়ে বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ করতে বললেন। ১৭ই আগস্ট এই ঘোষণাপত্র প্রচার করা হল :

> "রাজবিদ্রোহ কর্ম্ম করিয়া অত্র দেশ লুট ও উজার করিতেছে—আর সৈন্যের সহিত আপত্য করিতেছে—উহারদিগের মধ্যে এমত অনেক ব্যক্তী আছে জে আপনাদিগের নিব্বুদ্ধি ও দুষ্কর্ম্ম জ্ঞান করিয়া মার্জ্জনা ও পূর্ব্ব-কারাবস্থা পুনরায় পাইবার প্রার্থী আছে—এ বিষয় ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা আপনার প্রজার সুখ······তাহারা মন্দলোকের পরামর্শে কুপথগামী হয় ইচ্ছুক নয় এ নিমিত্ত কেবল এই সকল ব্যক্তী জাহারা প্রধানমন্ত্রী ও সরদার কিম্বা কোন খুন করিতে প্রাধান্যরূপে অধিক থাকা প্রকার হইবেক তদ্বিতিরিক্ত সকল সাঁওতালগণ জাহারা ১০ দশ দিবসের মধ্যে কোন হাকিমের সম্মুখে হাজীর হইয়া আজ্ঞাবাহী হইবেক তাহাদিগের দোশ মার্জ্জনা করা জাইবেক—জখন তাহাদের আজ্ঞাবাহী যুক্ত প্রকাশ হইবেক তখন তাবত নালিশ সাঁওতালদিগের যাহা প্রমাণযোগ্য তাহা সুন্দররূপে তদারক করা যাইবেক কিন্তু যদ্যপি সকল রাজদ্রোহি এই ইস্তাহার জারির পর বিপরিত আচরণ করে তাহারা সক্ত ও নিদারুণ সাজা পাইবেক। ইতি সন ১৮৫৫ সাল—তাঃ ১৭ই আগণ্ট—মোতাক সন ১২৬২ সাল—২ ভাদ্র।"[১]

কিন্তু বিদ্রোহী সাঁওতালরা এই মার্জনা ও আত্মসমর্পণের ঘোষণাকে ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করল। ইংরাজ সরকার, জমিদার ও মহাজনদের হামলায় তারা প্রত্যেকেই প্রিয়জনদের হারিয়েছে। আকাশে-বাতাসে, পাহাড়ে-অরণ্যে—সর্বত্রই প্রিয়জনদের চাপা দীর্ঘশ্বাস ভেসে বেড়াচ্ছে। এ সত্ত্বেও কি তারা ইংরাজ সরকারের এই ঘোষণাকে মেনে নেবে ? না, কখনই না। হাণ্টার সাহেব লিখেছেন—

> "সাঁওতালরা এই ঘোষণাটি ঘৃণার সঙ্গে অগ্রাহ্য করে স্পর্ধাভরে নতুনভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়।"[২]

১। ডেপুটি কমিশনার, সাওতাল পরগণা, ডুমকা-এর দপ্তরে রক্ষিত অনুলিপি।

২। ডব্লু. হাণ্টার, 'দি অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল', পৃ-৭৭।

ইংরাজরাজের ঘোষণাটি প্রত্যাখ্যান করল সাঁওতালরা। আত্মসমর্পণ করার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। আর, ইংরাজরাজের কাছে আত্মসমর্পণ মানেই তো তিলে তিলে মৃত্যু। তার চেয়ে বীরের মত লড়াই করে মরা অনেক ভাল। কিন্তু ইংরাজ সেনাবাহিনীর ব্যাপক হামলা চলছে সাঁওতাল গ্রামগুলিতে। এই অবস্থায় কিছু করা যায় না, বাধ্য হয়ে সাঁওতালরা কিছুদিন চুপচাপ রইল। এ দেখেই বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেট্ ২৪শে আগস্ট বঙ্গদেশের লেফ্‌টেন্যাণ্ট্ গভর্নরকে জানিয়েছিলেন—

> "সাত সপ্তাহ ধরে চারিদিকে শান্তি বিরাজ করছে। গ্রামবাসীরা গ্রামে ফিরে এসেছে এবং চাষীরা স্বাভাবিকভাবে তাদের জমি চাষ করছে। সাঁওতালদের কোথায় দেখা যাচ্ছে না।……সম্ভবত তারা মাইল ত্রিশেক দূরে অন্য কোন জেলায় চলে গেছে।"[১]

কিন্তু এই শান্তভাব সাময়িক মাত্র। এক মাস পার হতে না হতেই বিদ্রোহী-দের আক্রমণ আবার শুরু হ'ল। বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের কমিশনারকে লিখে জানালেন—

> "গত এক পক্ষকালের মধ্যে ওপরবাঁধ (ওপরবাঁধা) ও নাঙ্গুলিয়া (লাঙ্গুলিয়া) থানার ত্রিশটির বেশী গ্রাম বিদ্রোহীরা লুট করে জ্বালিয়ে দিয়েছে। নাগোরের চার মাইল পশ্চিমে লোরোজোর থেকে দেওঘরের সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র অংশ তাদের হস্তগত হয়েছে। ডাক চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে এবং গ্রামবাসীরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। বিদ্রোহীরা দুটি দলে বিভক্ত, একটি দল ভাগলপুর জেলার ওপর-বাঁধ থানার দশ মাইল উত্তরে রক্ষাদঙ্গল নামক জায়গায় ছাউনি ফেলেছে আর একটি দল রয়েছে ঐ জেলারই দিউড়ি থেকে ছয় মাইল পশ্চিমে তিলাবনি অঞ্চলে ; লাঙ্গুলিয়া থানায় বিদ্রোহীদের সংখ্যা যতদূর জানা গেছে বারো থেকে চৌদ্দ হাজারের মধ্যে এবং চারদিক থেকে আরোও সাঁওতাল এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে।"[২]

জানা যায় লাঙ্গুলিয়া থানায় ইংরাজ সেনাবাহিনীর সঙ্গে সাঁওতালদের প্রচণ্ড লড়াই হয়েছিল। লড়াই-এর ঘটনা বর্ণনা করে জুগিয়া হাড়াম লিখেছেন—

> "আদো নাঙ্গোলিয়া থানারেকো লাড়হাইএনা। অণ্ডে দো হড় বোগেতেকো গচ্' ওচোএনা। এণ্ডে খন মোর গাডা পারম লাউ-বাড়িয়ারেকো লাড়হাইএনা। এণ্ডে দো সিপাহী বোগেতেকো গুরএনা, আর মিৎটাং সাহেব হঁয় মাক্'এনা।"[৩]

অর্থাৎ—

> "তারপর নাঙ্গোলিয়া থানায় যুদ্ধ হল। সেখানে বহু সাঁওতাল

১। কে. কে. দত্ত, উপরে উল্লেখিত, পৃ-৫৭।
২। কে. কে. দত্ত, উপরে উল্লেখিত, পৃ-৬০।
৩। 'হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াংক্' কাথা', পৃ-২৪০।

নিহত হল। এর পর মোর নদীর ওপাশে লাউবাড়িয়াতে যুদ্ধ হল। সেখানে বহু ইংরাজ সৈন্য মারা পড়ল এবং এক ইংরাজ সাহেবও নিহত হল।

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি বিদ্রোহীদের আক্রমণ শুরু হল। মোচিয়া কাঁসজোলা, রাম পারগানা ও সুন্দ্রা মাঝির নেতৃত্বে তিন হাজার সাঁওতাল ওপরবাঁধ গ্রামে এসে ছাউনি ফেলল এবং ১৬ সেপ্টেম্বর তারা গ্রামখানি এবং সেই সঙ্গে থানা লুট করে ভস্মীভূত করল। ওপরবাঁধের কাছেই তারা সিরু মাঝির নেতৃত্বে মাটির প্রাচীর দিয়ে ঘিরে ও চারদিকে গড়খাই কেটে একটা দুর্গ তৈরি করল। প্রায় সাত হাজার সাঁওতাল এ কাজে যোগ দিয়েছিল।

> "সেরু মাঝির নেতৃত্বে এই বিদ্রোহীদের একটি দল সিউড়ির মাত্র ছ' মাইল পশ্চিমে একটি ছাউনি ফেলেছিল। এখানে তারা আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য পরিখা খুঁড়ে ও মাটির প্রাচীর তুলে অবস্থান করছিল, এবং খুবই বিস্ময়ের বিষয় যে তারা নাকি দুর্গা পুজা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল—যেটা সাঁওতালদের মধ্যে আজও কদাচিৎ প্রচলিত। সম্ভবতঃ বিদ্রোহী দলে কিছু নিম্নশ্রেণীর হিন্দুকে অধিকন্তু হিসাবে দলভুক্ত করা হয়েছিল,—এই সব শ্রেণীর হিন্দুদের অবস্থা সাঁওতালদের চেয়ে বিশেষ উন্নত ছিল না এবং ভবিষ্যতেও তাদের উন্নতির কোনও সম্ভাবনা ছিল না। দুর্গাপুজা যথাবিধি অনুষ্ঠানের জন্য তারা দু'জন ব্রাহ্মণকে তাদের লুটতরাজ-করা কোনও গ্রাম থেকে ধরে এনেছিল এবং যে-উন্মত্ত তাণ্ডবতায় সে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল, সে-সম্বন্ধে কল্পনাপ্রসূত বহু গুজব সিউড়িতেও এসে পেঁছিছিল।"[১]

জঙ্গলের মধ্যে মহা ধুমধামের সঙ্গে সেদিন সাঁওতালরা দুর্গাপুজা পালন করেছিল। যদিও তারা দুর্গাপুজা করে না, কিন্তু মেহনতী মানুষের ঐক্যের মূল্য তাদের কাছে অনেক বেশী মূল্যবান। বহু হিন্দু-মুসলমান তাদের সেনা-বাহিনীতে যোগ দিয়েছে এবং তারা সবাই একই পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে বিদেশী-রাজের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। কোনরকম সংকীর্ণতা তাদের মনের মধ্যে স্থান পায়নি। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাই সেদিন একসঙ্গে দুর্গাপুজা পালন করেছিল।

সাঁওতালরা এবার সিউড়ি আক্রমণের আয়োজন করল। রাস্তায় এক ডাক হরকরার ব্যাগ কেড়ে নিয়ে তার হাত দিয়ে একটি শাল ডাল সিউড়ির সাহেবদের কাছে পাঠান হল। তাতে ছিল তিনটি পাতা, যার মানে—তিন দিন পর সিউড়ি আক্রমণ করা হবে। তবে, শেষ পর্যন্ত তারা আর সিউড়ি আক্রমণ করেনি।

১। এফ. বি, ব্র্যাডলি বার্ট', 'দি স্টোরি অফ এন ইণ্ডিয়ান আপল্যান্ড', পৃ-২০২-২০৩।

বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেট সেদিন সমস্ত ঘটনা উল্লেখ করে বর্ধমানের কমিশনারের কাছে যে চিঠিখানা লিখেছিলেন তাতে লেখা ছিল :—

"গত এক পক্ষকালের মধ্যে ওপরবাঁধ (ওপরবাঁধা) ও নাঙ্গুলিয়া (লাঙ্গুলিয়া) থানার ত্রিশটির বেশী গ্রাম বিদ্রোহীরা লুট করে জ্বালিয়ে দিয়েছে। নাগোরের চার মাইল পশ্চিমে লোরোজার থেকে দেওঘরের সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র অংশ তাদের হস্তগত হয়েছে। ডাক চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে এবং গ্রামবাসীরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। বিদ্রোহীরা দুটি দলে বিভক্ত, একটি দল ভাগলপুর জেলার ওপরবাঁধ থানার দশ মাইল উত্তরে রক্ষাদঙ্গল নামক জায়গায় ছাউনি ফেলেছে আর একটি দল রয়েছে ঐ জেলারই সিউড়ি থেকে ছয় মাইল পশ্চিমে তিলাবনি অঞ্চলে ; লাঙ্গুলিয়া থানায় বিদ্রোহীদের সংখ্যা যতদূর জানা গেছে বারো থেকে চৌদ্দ হাজারের মধ্যে এবং চারদিক থেকে আরো সাঁওতাল এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে।

"দ্বিতীয়। এই মাসের ১৬ তারিখের বিকালে রক্ষাদঙ্গল গ্রামের প্রায় ৩০০০ সাঁওতালের একটি দল মোচিয়া কাঁসজোলা, রাম ও সুন্দর মাঝিদের নেতৃত্বে ওপরবাঁধে কাছে ছাউনি ফেলে এবং পরের দিন গ্রাম ও থানা লুট করে জ্বালিয়ে দেয়। দারোগা আর বরকন্দাজরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বাধা দিয়েছিল ; কিন্তু আক্রমণ-কারীদের বিপুল সংখ্যাধিক্য দেখে ও তাদের প্রতিরোধ বৃথা হবে বুঝে তারা পশ্চাদপসরণ করে এবং দারোগা অতি কষ্টে শাহনী ও আফজলপুর হয়ে সুকৌশলে পালাতে সক্ষম হয় এবং মাত্র কয়েকটি জামাকাপড় পিঠে নিয়ে ২২ তারিখে এখানে এসে পেঁৗছেছে। সে কয়েকদিন আগে জানতে পারে যে, সাঁওতালদের থানা আক্রমণ করার মতলব আছে, সেজন্য সে থানার সমস্ত কাগজপত্র নিরাপত্তার জন্য দেওঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিল এবং স্থানীয় রক্ষীবাহিনীর কমাণ্ডারের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করেছিল, কিন্তু জায়গাটা একটু দূরে ও পথও গভীর জঙ্গলাকীর্ণ বলে রক্ষীদল পাঠাতে কমাণ্ডার রাজি হয়নি। পরিস্থিতি সম্বন্ধে মিঃ ওয়ার্ডকে অবহিত ক'রে সে আমায় বলেছিল যে রানীগঞ্জ থেকে শাহনা থানার জামতাড়ায়, ওপরবাঁধে ও আফজলপুরে অবিলম্বে একটি ছোট রক্ষীবাহিনী পাঠানো দরকার, যারা বর্ষার পর সৈন্যবাহিনী সাঁওতালদের বিরুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা না নেওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবে। আমি জানতে পারলাম যে রক্ষীদল ইতিমধ্যে উপরোক্ত স্থানে পেঁৗছে গেছে, যেটা শহনা থানাকে রক্ষা করার পক্ষে যথেষ্ট হবে। ওখানে এখনও পর্যন্ত লুটতরাজের কোনও ঘটনা ঘটেনি, কিন্তু বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য সাঁওতালরা সব জড় হচ্ছে। যে পর্যন্ত না সৈন্যদল ওপরবাঁধে ঘাঁটি গাড়ে, সে পর্যন্ত এই রকম অরাজক ও বিশৃংখল অবস্থাই চলতে থাকবে ; সৈন্যদল সেখানে পেঁৗছানো মাত্র ঐ থানায় আমি পুলিসদল পাঠিয়ে দেব এবং ডাক চলাচলও আবার শুরু হবে। বর্তমানে অন্য কিছু করা অসম্ভব, কারণ রাম মাঝি তার ২০০ জন অনুচর নিয়ে হলদিগড় পাহাড়ের জঙ্গলে আস্তানা নিয়ে বসে আছে এবং সেই পথ দিয়ে কেউ

যাবার চেষ্টা করলেই গুপ্তভাবে আক্রমণ করছে ও সর্বস্ব লুটে নিচ্ছে। বর্তমান অবস্থায় দেওঘরে একজন অসামরিক অফিসার থাকার যখন বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তখন সেখানে সেরূপ কেউ না থাকা খুবই দুঃখের বিষয়; ইতিপূর্বে এক চিঠিতে এ বিষয়ে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম।

"তৃতীয়। সীরু মাঝির অধীনে ৫০০০ থেকে ৭০০০ সংখ্যক সাঁওতালের যে দল তিলাবুনীতে স্থলিয়া টাকুর অধিকার করেছে, তারা মাটির প্রাচীর তুলে ও খাল কেটে তাদের আস্তানাকে সুরক্ষিত করেছে। তারা দুর্গাপূজা অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেছে এবং সেই উদ্দেশ্যে নাগোলিয়া থানার যে-গ্রাম তারা লুণ্ঠন করেছে, সেখান থেকে দু'জন ব্রাহ্মণকে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে। গতকালই গুপ্তচররা এসে খবর দিল যে তারা রক্ষাদঙ্গলের দলের জন্য অপেক্ষা করছে; তারা এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিলেই সিউড়ি আক্রমণ করার জন্য তারা অগ্রসর হবে; কিন্তু আমার মনে হয়, বর্তমান অবস্থায় থানা আক্রমণের দুঃসাহস করা সম্ভব নয়। কিছুদিন আগে তারা তিনটি পাতাযুক্ত একটি শালগাছের ডাল আমাদের কাছে পাঠিয়েছিল,—ওদের ভাষায় যাকে 'ঢারুওয়াকু' বা 'মিসিভ' বলা হয়; ঐ এক একটি পাতার অর্থ হ'ল, আক্রমণ করার আগে এক-একটি দিন। সেটি দেওঘরের একজন ডাক হরকরা এনে দিয়েছিল, যাকে তারা পথে ধরে এটি পৌঁছে দেবার জন্য ফেরৎ পাঠিয়েছিল। সৈন্যদলের কর্নেল থানার উত্তর ও পশ্চিম দিকে কয়েক স্থানে কয়েকটি প্রহরা-ফাঁড়ি বসিয়ে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, আক্রমণের সময়ে যেগুলি প্রথম আত্মপ্রকাশ করবে। স্পেশাল কমিশনার যখন এখানে ছিলেন, তখন তাঁর অনুরোধে সিয়েট গিলানকে ও তার বরকন্দাজদের তাঁর প্রয়োজনে কাজে লাগাবার জন্য দিয়েছিলাম, জানতে পারলাম তাদের নাগোরে পাঠানো হবে। সেখানের বাসিন্দারা খুবই আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে, অনেকে ঘর ছেড়ে পালিয়েও গেছে।"[১]

কিছুদিন পরেই সাঁওতাল বিদ্রোহীরা বীরভূম জেলার বাঁশকুলি গ্রাম লুট করে বহু মহাজনকে হত্যা করল। পীতাম্বর মণ্ডল নামে এক কুখ্যাত মহাজনও এ সময়ে নিহত হল। বিদ্রোহীরা সমস্ত গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে গেল, কেউ তাদের বাধা দিতে পারল না।

অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সিদু-কানহু ডুমকা জেলার দক্ষিণে অম্বা হর্না মৌজা লুট করলেন। কোথাও নিরাপত্তা নেই। কেন্দ্রা, জয়পুর, নোনিহাট প্রভৃতি গ্রাম একে একে লুট করা হল। ওয়াহাবী বিদ্রোহীদের মত সাঁওতাল বিদ্রোহীরা এ সময় কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে দামিন-ই-কোহ্‌র বিভিন্ন জায়গায় তীব্র আক্রমণ চালাতে লাগল। দেবীর আশীর্বাদে এবার যেন তারা

১। বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কমিশনার অফ বর্ধমান ডিভিশন-এর নিকট লিখিত পত্র, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫।

মরিয়া হয়ে উঠল। তাদের দমন করা চাই-ই, নইলে রাজশক্তির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। শাসকগোষ্ঠী তাই তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে এল দামিন-ই-কোহ্‌তে। ইংরাজ সৈন্যে ভরে গেল দামিন-ই-কোহ্‌। শুরু হল এবার অকথ্য অত্যাচার, উৎপীড়ন ও হত্যার তাণ্ডব। ইংরাজ সৈন্যরা সাঁওতালদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিতে লাগল, নারী-শিশু কাকেও বাদ দিল না। সাঁওতালরাও তাদের প্রতিজ্ঞায় অটল, তারা প্রাণ দেবে, তবু বশ্যতা স্বীকার করবে না। ইংরাজ বাহিনী সমস্ত সাঁওতাল এলাকাটাকে চষে ফেলতে লাগল। হাজার হাজার সাঁওতাল বৃদ্ধ, শিশু ও নারী সেই উন্মত্ত ইংরাজ সেনাদের হাতে নিহত হল। সাঁওতাল সেনাদের দলে দলে গুলি করে হত্যা করা হল। পথ-ঘাট সাঁওতালদের মৃতদেহে ঢেকে গেল। বেগতিক দেখে সাঁওতালরা তখন পাহাড়ে-জঙ্গলে আশ্রয় নিতে লাগল। ছট্‌রায় দেশমাঞ্জ্‌হি এ সময়ের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন—

> "আদো বার্‌ পে দিন তায়নম খানগে আন্‌তে নতে খন পাল্টন ফাদকো রাকাপ্‌' এনা সবৎ সবৎ আর আতো লুট লুটতে, আর আতো হ্‌কো জেরেৎ আগুএৎআ। ওনা আঁজমতে দিশম হড় দোলে উমঝাওএনা; আদো বতরতে জিউয়ী বাঞ্চাওআ মেন্তে অড়াঃক্‌' দুওয়ার, ধন-দৌলত, মিহু-মেরম বাগিকাতে বির্‌তে বুরুতে দাদাড়লে পরতনকেৎআ। সালবনা বুরুলে পেরেচ'কেৎআ, কুল ডাণ্ডেরকোরেলে ওকোএনা। উনরে দো কুল বানা হ্‌' বালে বতরাৎকোওয়া পাল্টন বতরতে।"[১]

অর্থাৎ—

> "দু তিন দিন পরেই ইংরাজসৈন্য এদিক ওদিক থেকে দলে দলে গ্রাম লুট করতে করতে এল, তারা ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিতে দিতে আসছিল। এ কথা শুনে আমরা গ্রামবাসীরা অস্থির হয়ে উঠলাম এবং প্রাণের ভয়ে ঘর-বাড়ি, ধন-দৌলত, গরু-ছাগল সব ফেলে বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে পালাতে শুরু করলাম। আমরা সালবনা পাহাড় ভরে ফেললাম, বাঘের গুহায় লুকালাম। সে সময় ইংরাজ সেনাদের ভয়ে আমরা বাঘ-ভালুকেরও ভয় করিনি।"

এই সময়েই সাঁওতাল নেতারা 'সাইহা বিবাহ' প্রচলন করেন। এ বিবাহে মেয়ের সিঁথিতে সিন্দুর দেওয়া হত না, সিন্দুরের বদলে তেল দেওয়া হত। ছট্‌রায় দেশমাঞ্জ্‌হির বিবরণে পাওয়া যায়—

> "আলো কদমারেলে ডেরাআকান জখেচ্‌' সিদো কানহু দো দিশম ফাদ আন্‌তে মহুলপাহাড়ীরেকিন ডেরা আকান তাঁহেকানা। আর অণ্ডেকিন তাঁহেকানতে মহুলপাহাড়ী আতোরে দিশম হড়াকিন ছাতা পরবআৎকোওয়া। অণ্ডে বার্‌ হপ্তালে তাঁহেকানরে মিৎ উফাদ হোয়এনা সাইহা বাপ্লা রেয়াঞ, বাংমা কুড়ি হপন নাতাগে বেগর বাপ্লাতে বাবোন তাঁহে ওচোকোওয়া।

১। 'ছটরায় দেশমাঞ্জ্‌হি রেয়াঃক্‌' কাথা', পৃ-১৩

সিন্দুর বদলতে সুনুমতেকো ইতুৎএৎকো তাঁহেকানা ইনাগে হোয়এনা সাইহা বাপ্লা ; বাপ্লাকাতে মিৎরেকো তাহেন সে বাং অনা রেয়াঞ জাহান বিচার আচার দো বানুঃক্'আনাং আর খজ তলাস হ্ঁ বানুঃক্'আনাং। নিয়াগে মনসুবা যেমন হুল ভিতরিরে অকয় কুড়ি হ্ঁ বেগর বাপ্লাতে আলকো তাঁহেন।"[১]

অর্থাৎ—

"আমরা যে সময় কদমাতে ছিলাম সিধু-কানু সে সময় তাঁদের লোকজন নিয়ে মহুলপাহাড়ীতে ছিলেন। সেখানে থাকার সময়ই তাঁরা দেশের লোকের জন্য ছাতা পর্বের ব্যবস্থা করলেন। সেখানে আমরা দু' সপ্তাহ ছিলাম, ঐ সময়ই সাইহা বিবাহের রেওয়াজ উঠল অর্থাৎ কোন মেয়েকেই অবিবাহিত অবস্থায় থাকতে দেওয়া হবে না।

মাথার সিঁথিতে সিন্দুরের বদলে তেল লাগিয়ে দেওয়া হত, এটাই হল সাইহা বিবাহ। বিবাহের পর ছেলেমেয়ে একসঙ্গে বাস করুক কি না করুক, খোঁজ খবর রাখুক কি না রাখুক সে সম্বন্ধে কোন নিয়ম কানুন ছিল না। এটাই ঠিক হয়েছিল যে বিদ্রোহের সময়ে কোন মেয়ে যেন অবিবাহিত না থাকে।"

এ ভাবে মাস তিনেক ধরে পাহাড়ে, জঙ্গলে আত্মগোপন করে সাঁওতালরা যুদ্ধ চালাল ইংরাজ রাজশক্তির সঙ্গে। নিদারুণ দুঃখ-কষ্টে দিন কাটল তাদের। জুগিয়া হাড়াম এ কথা স্মরণ করে বলেছেন—

"হুলরে দো আঁডি বাড়িচ্‌লে হারখেত্‌লেনা। আষাঢ় খন পে চান্দো ধাবিচ্' বুরু দারে বুটারেলে তাঁহেকানা; ঝমর ঝমর দাঃক্ আৎলেয়া, আর রেঙ্গেচ্'তেলে গচ্' বাড়িচ্'কান তাঁহেকানা।"[২]

অর্থাৎ—

"বিদ্রোহের সময়ে আমরা খুবই কষ্ট পেয়েছিলাম। আষাঢ় মাস থেকে তিন মাস পর্যন্ত আমরা পাহাড়ে গাছের নীচে ছিলাম ; ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি হয়েছিল, আর আমরা ক্ষিধের জ্বালায় মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিলাম।"

তাহলে কি তারা ইংরাজরাজের বশ্যতা স্বীকার করবে ? না, বশ্যতা তারা স্বীকার করবে না। হয় জয়লাভ করবে, না হয় এই পাহাড়-জঙ্গলই হবে তাদের শেষ-শয্যা।

১। 'ছটরায় দেশমাজ্‌হি রেয়াঃক্' কাথা', পৃ-১৩।
২। 'হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃক্' কাথা', পৃ-২৪৪।

সতরো

অক্টোবর মাস। সাঁওতাল বিদ্রোহীরা এবার সংগ্রামপুরের কাছে পাহাড়ের উপর গাছপালার ছাউনি বেঁধে শিবির স্থাপন করল। সিদু-কানুর নির্দেশে হাজার হাজার সাঁওতাল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। সরাসরি ইংরাজ-শক্তির মুখোমুখি না হলে মাতৃভূমি রক্ষার আর কোন পথ নেই। দলে দলে সাঁওতাল তাই বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে তীর-ধনুক, টাঙ্গি, তরোয়াল হাতে নিয়ে। দামিন-ই-কোহ্‌র গরীব হিন্দু জনসাধারণও সাঁওতালদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এল। সমস্ত পাহাড়-অরণ্য তাদের নাগড়া ও মাদলের আওয়াজে কেঁপে উঠল।

খবর পেয়ে ইংরাজ ফৌজও এসে উপস্থিত হল সংগ্রামপুরে, সঙ্গে কামান-বন্দুক প্রভৃতি অগ্নেয়াস্ত্র। এবার তারা গোলা-বারুদ প্রচুর সঙ্গে নিয়ে এসেছে। পিয়ালাপুরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতেই হবে। কিন্তু বিদ্রোহীরা সবাই পাহাড়ের উপরে। পাহাড়ের উপর জঙ্গলে তারা অপরাজেয়, কামান-বন্দুক কোন কাজে লাগবে না। ইংরাজ সেনাপতি কর্নেল ফাগুন তাই কৌশলে সাঁওতালদের সমতলভূমিতে নামিয়ে আনার মতলব করলেন।

রাত্রে সিদু-কানু ও অন্যান্য নেতারা জরুরী বৈঠকে বসলেন। সবাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। দামিন-ই কোহ্ থেকে ইংরাজদের শেষ চিহ্ন মুছে ফেলা চাই। পরামর্শ চলল। চাঁদরাই মাঝির মতে পাহাড়ের উপরে জঙ্গলে সাঁওতালী রীতিতে যুদ্ধ করাই শ্রেয়, এতে সাঁওতালদেরই সুবিধা হবে বেশী। ইংরাজ বাহিনী এগিয়ে আসুক, জঙ্গলের ভিতর থেকে তারা ইংরাজ সৈন্যদের উপর আঘাত হানবে। কিন্তু শিংড়ার মত অন্য রকম। তার মতে, অবিলম্বে ইংরাজ সৈন্যদের উপর আঘাত হানা হোক। কারণ, ইংরাজ সৈন্যরা সাঁওতালদের তুলনায় সংখ্যায় অনেক কম। আরো সৈন্য এসে পড়লে তখন তাদের সঙ্গে পেরে উঠা মুস্কিল হবে। আর সাঁওতালদের সঙ্গে যথেষ্ট খাবারও নেই, দেরী হলে তাদের মনোবল ভেঙ্গে যাবে। শেষ পর্যন্ত শিংড়ার কথাই গ্রাহ্য হল। সবাই একবাক্যে শপথ নিল এ যুদ্ধে হয় স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু।

এদিকে ইংরাজ শিবিরে সাঁওতাল বিদ্রোহীদের নিশ্চিহ্ন করার সব রকম আয়োজন করা হল। সেনাপতি ফাগুনের নির্দেশে খুব ভোরে হিল রেঞ্জার্স বাহিনীর কিছু সৈন্য কামান-বন্দুক নিয়ে পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হল। ইংরাজ সৈন্যদের দুঃসাহস দেখে কানু আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, অবিলম্বে ইংরাজ সৈন্যদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য চাঁদরাইকে নির্দেশ দিলেন।

তিন শ' সাঁওতাল সেনা নিয়ে চাঁদরাই অগ্রসর হলেন। বিদ্রোহীদের এগিয়ে আসতে দেখে পাহাড়িয়া সৈন্যরাও এক সারিতে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং বিদ্রোহীরা এক শ' গজের মধ্যে আসামাত্র বন্দুকের শব্দ করে তাদের আক্রমণ করল। বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ, গুলি নেই। অন্ধবিশ্বাসী সাঁওতাল সেনারা ভাবল যে দেবতার আশীর্বাদে গুলি হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। গুলি লাগছে না দেখে

হাজার হাজার সাঁওতাল পাহাড়ের উপর থেকে নামতে শুরু করল। ইতিমধ্যে ইংরাজ সৈন্যরা বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ করতে করতে পিছু হটে এল তাদের প্রধান দলের কাছে। ততক্ষণে সাঁওতালরা সমতলভূমিতে নেমে এসেছে। আর দেরী নয়, ক্যাপ্টেনের নির্দেশে ইংরাজ সৈন্যদের বন্দুকগুলো এবার সত্যিসত্যিই নির্দয়ভাবে গর্জে উঠল। একি হল? চার-পাঁচজন সাঁওতাল সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে গেল। বন্দুকগুলো পুনরায় গর্জন করে উঠল। গুলি এবার চাঁদরাইয়ের মাথায় লাগল। এ ঘটনায় সাঁওতালরা স্তম্ভিত হয়ে পড়ল আর ভাবল—এ কি হল? কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। পরমুহূর্তেই তারা দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্যায় শুরু করার জন্য।

চাঁদরাই নিহত হলেন দেখে কানু প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য লাফিয়ে উঠলেন। তরোয়াল বের করে চিৎকার করতে করতে ছুটে নামলেন অন্যান্যদের সঙ্গে। নাগড়ার আওয়াজ তীব্র হয়ে উঠল। এ ডাক হল সংগ্রামে এগিয়ে যাওয়ার ডাক—শত্রুকে সমূলে ধ্বংস করার নির্দেশ। বিশ হাজার সাঁওতাল বিদ্রোহী তীর-ধনুক, টাঙ্গি ও তরোয়াল নিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করল। তাদের সঙ্গে আবার যোগ দিয়েছে সমগ্র দেশের গণশক্তি। ঝাঁকে ঝাঁকে তীর আসতে লাগল ইংরাজ সৈন্যদের দিকে। পরবর্তীকালে ডেভিড দেওয়া নামে এক পাহাড়িয়া সিপাহী সংগ্রামপুরের যুদ্ধের বর্ণনা করে বলেছেন—

> "জঙ্গলই যেন এগিয়ে আসছিল, বিদ্রোহীদের এরূপ দেখাচ্ছিল। তাদের আগে আগে একটি কামার ছেলে তরবারী ঘোরাতে ঘোরাতে লাফিয়ে লাফিয়ে আসছিল। বিদ্রোহীরা কাছে এলে পর তীর ছুঁড়তে লাগল। কি বলব? সে সময় বিদ্রোহীদের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল যে, তীর যেন বৃষ্টিধারার মত নেমে আসছে।"[১]

আধুনিক সমরাস্ত্রের সঙ্গে সেকেলে অস্ত্রশস্ত্রের মোকাবিলা। আক্রমণের পর আক্রমণ চলতে লাগল। নাগড়ার শব্দে মনে হচ্ছিল যেন গুরু গুরু করে মেঘ ডাকছে, পাহাড়ের চূড়াগুলো হুড়মুড় করে ভেঙ্গে আসছে। দেখতে দেখতে বিদ্রোহীরা মাঠের মধ্যে এসে পড়ল। প্রচণ্ড লড়াই চলল, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে দলে দলে সাঁওতাল সংগ্রামপুরের যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিল। কেউ একবারও ভাবল না যে, তারা লড়াইয়ে হারবে কি জিতবে। তাজা রক্তে ভেসে গেল সংগ্রামপুরের সবুজ মাঠ। সরলমনা সাঁওতালদের কৌশলে পাহাড় থেকে নামিয়ে এনে পাইকারী হারে গুলি করে হত্যা করা হল। তাই এক ইংরাজ কর্নেল বলেছেন—

> "আমার বাহিনীতে এমন একটিও সিপাহী ছিল না যে সাঁওতালদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে লজ্জাবোধ করেনি। প্রায় সমস্ত বন্দীই ছিল

১। চৈতন্য হেম্ব্রম কুমার, 'সান্তাল পারগানা, সান্তাল আর পাহাড়িয়া কোওয়া কু' ইতিহাস', পৃ-৫৭-৫৮।

> গুলির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ··· সাঁওতালরা বিষাক্ত তীর ব্যবহার করেছে এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।"[১]

গুলি খেয়ে কানু টলতে লাগলেন। সিধুও সাংঘাতিকভাবে আহত। উভয়কেই গভীর জঙ্গলে সরিয়ে ফেলা হল। নেতৃত্বহীন হয়েও কিন্তু বিদ্রোহীরা মোটেই পেছপা হল না, বরং সিধু-কানহু আহত হওয়ায় মরিয়া হয়ে তারা আঘাত হানতে লাগল ইংরাজ সৈন্যদের উপর।

বারুদের গন্ধে, কামান-বন্দুকে ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন। সামনে থেকে অসংখ্য তীর এসে সাপের ছোবলের মত মৃত্যু ছড়িয়ে যাচ্ছে, দলে দলে সাঁওতাল সেনারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে তাদের সেকেলে অস্ত্র নিয়ে মরণ কামড় দেবার জন্য। চোখে-মুখে তাদের প্রতিহিংসার আগুন। ইংরাজ সৈন্যরা ইতিপূর্বে সামনা-সামনি লড়াইয়ে এরকম সাংঘাতিক শত্রুর সম্মুখীন হয়নি কোনদিন। সাঁওতালদের সংহার মূর্তি দেখে ইংরাজ সৈন্যরা উন্মত্তের মত গুলি চালাতে লাগল। সুশিক্ষিত সৈন্যদলের বিরুদ্ধে, বিশেষতঃ কামান-বন্দুকের বিরুদ্ধে সেকেলে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বিদ্রোহীদের লড়াই আর কতক্ষণ চলতে পারে? অসংখ্য রক্তাক্ত দেহ মাটিতে পড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

অবশেষে নাগড়ার আওয়াজ শোনা গেল, বিদ্রোহীরা পশ্চাদপসরণ করল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ইংরাজ সৈন্যরা। কিন্তু সংগ্রামপুরের মাটিতে যে ঘটনা ঘটল, তা সাঁওতালরা ভুলতে পারেনি আজও। তাই, সেদিনের ঘটনা স্মরণ করে তারা গায়—

"চেদাঃক্' দরে সিদু
মায়ামতে দম নুমেন?
চেদাঃক্' দরে কানহু হো
হুল হুলেম মেমেন?
জাত ভাই ক লাগিৎ
মায়ামতে দঞ নুমেন।
বেপারীয়া কোম্বড়ো হায়রে
দিশম দ ক হুহী।"

W. G. Archer নামে এক সাহেব অনুবাদ করেছেন—

"Sido why are you bathed in blood?
Kanu why do you cry hul hul?
For our people we have bathed in blood
For the trader thieves,
Have robbed us of our land."

১। ডব্লু. ডব্লু-হাণ্টার 'দি অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল', পৃ-৩১৬।

আঠারো

সংগ্রামে সাঁওতালদের পরাজয় ঘটল বটে, কিন্তু ভারতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচিত হল। এ হল—সাঁওতাল-বাঙ্গালী-বিহারী সমস্ত গরীব মেহনতি মানুষের সংগ্রামী ঐক্য। বিশ হাজার সাঁওতাল শহীদের রক্তে রচিত হল এ অধ্যায়। শোষণ ও উৎপীড়ন থেকে মুক্তিলাভের জন্য সেদিন সাঁওতাল নেতারা নিজস্ব বাসভূমিতে প্রকাশ্যভাবে সর্বপ্রথম যে সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তুলেছিল, তার মূল্য স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কোন মতেই উপেক্ষণীয় নয়। শুধু নিজেদের দাবি নিয়ে নয়, পরন্তু দেশের সমস্ত মেহনতী মানুষের ন্যায্য দাবির আন্দোলনে তারা মরণপণ লড়াই চালিয়েছিল। খেটে খাওয়া সংগ্রামী মানুষ কোনদিন একথা ভুলতে পারবে না। জানা যায়, সেদিন বাঙ্গলাদেশের বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলা ও বিহারের ভাগলপুর, মুঙ্গের ও ছোটনাগপুর অঞ্চলের দরিদ্র শ্রমজীবী জনসাধারণ সাঁওতালদের সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছিল ও বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছিল। কারণ, এ সংগ্রাম শুধু ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে নয়, মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর থেকে আরম্ভ করে আশেপাশের জমিদার, মহাজন, নীলকর সমস্ত শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে। যে শত্রুর বিরুদ্ধে সাঁওতালদের সংগ্রাম, সে শত্রু তাদেরও শত্রু। তারাও সেদিন সাঁওতালদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। এ সম্পর্কে ভাগলপুরের কমিশনার রিপোর্টে লিখেছেন—

> "আমার হস্তগত সকল সংবাদ থেকে জানা গেছে যে, গোয়ালা, তেলী ও অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি সাঁওতালদের পরিচালিত ও সন্ত্রাসমূলক কাজ করতে উত্তেজিত করছে, তারা সাঁওতালদের গুপ্তচরের কাজ করছে, প্রয়োজন হলে ড্রাম বাজিয়ে সাঁওতালদের সতর্ক করে দিচ্ছে···তারা এবং কর্মকাররা সাঁওতালদের জন্য ধনুকের তীর ও তরবারী তৈরি করে দিচ্ছে।"[১]

হাণ্টার সাহেবও সাঁওতাল বিদ্রোহীদের সঙ্গে নিম্নশ্রেণী অর্থাৎ দরিদ্র হিন্দু জনসাধারণের যোগ দেওয়ার কথা স্বীকার করে লিখেছেন—

> "মনে হয়, এই সময়ে সাঁওতাল ও হিন্দুদের মাঝামাঝি কিছু আধা আদিবাসী শ্রেণী এবং কিছু কিছু নিম্নশ্রেণীর হিন্দুও এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল এবং অক্টোবরের মহোৎসব অনুষ্ঠানের জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের অপহরণ করেছিল।"[২]

১। সেক্রেটারী, গভর্মেণ্ট অফ বেঙ্গল-এর নিকট ভাগলপুর কমিশনার-এর পত্র, ২৮ জুলাই, ১৮৫৫ ('বেঙ্গল গভর্মেণ্ট রেকর্ডস')।

২। ডব্লু. ডব্লু. হাণ্টার, 'দি অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল', পৃ-২৫০।

জেমস্ ম্যাকফেইল সাহেবও লিখেছে—

> "অক্টোবর মাসে কিছু ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে জঙ্গলে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠানের জন্য যে বন্দী করে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে কিছু আধা-হিন্দুধর্মাবলম্বী আদিবাসী এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল।"[১]

ঐতিহাসিকদের এ সব বিবরণ থেকে পরিষ্কারভাবেই জানা যায় যে সেদিন সাঁওতালদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল কুমার, তেলী, কর্মকার, চামার, ডোম, মোমিন সম্প্রদায়ের গরীব মুসলমান ও গরীব হিন্দু জনসাধারণ। কোম্পানির আমলে এ সব শ্রেণীর লেকেরাই ছিল সবচেয়ে গরীব; তাই তারা প্রথম থেকেই এ সংগ্রামকে দ্বিধাহীনভাবে সমর্থন জানিয়েছিল ও সাঁওতালদের নানাভাবে সাহায্য করেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল সাঁওতালদের দাবির পেছনে আছে সমস্ত গরীব মেহনতী মানুষের ন্যায্য দাবি। ইংরাজ সরকারও বুঝতে পেরেছিল, এ বিদ্রোহের আগুন অবিলম্বে নিভিয়ে ফেলতে না পারলে এ আগুন ছড়িয়ে যাবে ভারতের সর্বত্র। সেই কারণেই সেদিন কোম্পানির বড় কর্তারা কৃষকের—শ্রমজীবী মানুষের জাগ্রত সংগ্রামশক্তিকে পিষে ফেলবার জন্য ৩৭শ, ৭ম, ৩১শ রেজিমেণ্ট, হিল রেঞ্জার্স, ৪৩, ৪২ ও ১৩ রেজিমেন্ট প্রভৃতিকে নিয়োগ করেছিল এবং তার ফলে সাঁওতাল বিদ্রোহ আরো ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। এ সম্বন্ধে সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন—

> "১৮৫৫-৫৭ খৃষ্টাব্দের সাঁওতাল-বিদ্রোহ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহের ইতিহাসে অতুলনীয়। কেবলমাত্র ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সহিত ইহার আংশিকভাবে তুলনা করা চলে। যে প্রকারের শাসন ও শোষণ-উৎপীড়ন হইতে পরাধীন জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৃষ্টি হয়, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের সাঁওতাল উপজাতির বিদ্রোহ বা স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ বা 'ভারতের প্রথম ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা-সংগ্রাম' সেই প্রকারের শাসন ও শোষণ-উৎপীড়নেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এই উভয় সংগ্রামই আরম্ভ হইয়াছিল ইংরেজ শাসনের কবল হইতে, শোষণের কবল হইতে মুক্তি ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ধ্বনি লইয়া।"[২]

সেদিন সাঁওতাল বিদ্রোহের জঙ্গীরূপ দেখে শাসকগোষ্ঠীর চোখের ঘুম চলে গিয়েছিল। ভারতের মাটিতে তাদের আসন্ন ধ্বংসের পরোয়ানা দেখে তারা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। তাই কমিশনার স্বয়ং সাঁওতাল নেতাদের ধরিয়ে দেবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। পুরস্কারের পরিমাণ ছিল ঃ

"প্রধান নায়কের জন্য দশ হাজার টাকা, সহকারী নায়কের প্রত্যেকের

১। জে. এম. ম্যাকফেল, 'দি স্টোরি অফ দি সান্তাল', পৃ-৬০।
২। সুপ্রকাশ রায়, 'ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম', পৃ-৩১০-৩১১।

জন্য পাঁচ হাজার টাকা এবং বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় নায়কদের প্রত্যেকের জন্য এক হাজার টাকা।"[১]

কোম্পানির আমলে অর্থাৎ তখনকার দিনে এ টাকার মূল্য কম নয়। এতেও শাসকগোষ্ঠী সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি, অস্ত্রধারী বিদ্রোহীদের দেখামাত্র হত্যা করার নির্দেশও দিয়েছিল এবং সমস্ত সাঁওতাল এলাকায় 'সামরিক আইন' (Martial Law) জারী করে সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সাঁওতালরা ও সমস্ত মেহনতী মানুষ সেদিন সামরিক শক্তির কাছে মাথা নত করেনি, আপস করেনি, বরং অসাধারণ সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করে মৃত্যুবরণ করেছিল। হাণ্টার সাহেব লিখেছেন—

> "তাদের মধ্যে অধিকাংশই তাদের সঙ্কল্পসাধনে একটা গৌরববোধের সঙ্গে অত্যন্ত মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিল এবং এই সংঘর্ষের কারণস্বরূপ সরকারের নির্বুদ্ধিতার ওপর দোষারোপ করেছিল। বীরভূম জেলে তাদের একজন নেতা বলেছিল, 'তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে তোমরাই আমাদের বাধ্য করেছ। যা ন্যায্য তাই আমরা চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা তাতে সাড়া দাওনি। যখন আমরা অস্ত্রের সাহায্যে এর প্রতিকার করতে গেলাম, তখন তোমরা আমাদের জঙ্গলের বন্য জন্তুরমতো গুলি ক'রে মারলে।"[২]

অতি স্পষ্ট ও সত্য কথা। সাঁওতালরা বুঝতে পেরেছিল তাদের জীবনে এই অসহনীয় দুঃখ-লাঞ্ছনার জন্য বিদেশীরাজের সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও শোষণ ব্যবস্থাই দায়ী। তাই, তারা বৃটিশ রাজশক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি, কঠোর আত্মত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়ে শাসকগোষ্ঠীর চরম স্বেচ্ছাচারী স্বরূপ জনসমক্ষে তুলে ধরেছিল। খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ সেদিন দলে দলে সমবেত হয়েছিল সাঁওতালদের পতাকাতলে। বিদেশী শাসন, শোষণ, উৎপীড়ন, অন্যায় ও অবিচারের প্রতিবাদে সাঁওতালদের ও গরীব মেহনতী মানুষের এ ছিল সর্বপ্রথম মিলিত সংগ্রাম। গণসংগ্রামের ইতিহাসে তাই সাঁওতাল-বিদ্রোহ তথা সাঁওতাল নেতাদের সংগ্রামী অবদান চিরস্মরণীয়।

আজকের দিনে মেহনতী মানুষের ঐক্যের তাৎপর্য অনেক বেশী গভীর। সাঁওতাল নেতারা যে ঐক্য সেদিন গড়ে তুলেছিল, আজও তা শাসকগোষ্ঠীর দমননীতি, ভেদনীতি সত্ত্বেও শোষণ-শাসনে জর্জরিত শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে—নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে। তাই বলব, সাঁওতাল বিদ্রোহের বিশ হাজার শহীদের আত্মত্যাগ ব্যর্থ হয়নি। সাঁওতাল নেতারা অন্যায়-উৎপীড়ন এবং শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যে অগ্নিগর্ভ আহ্বান সেদিন জানিয়ে গেছেন, আজ এতদিন পরে সে আহ্বানে সাড়া জেগেছে ভারতের গ্রামে গ্রামে, ভারতের আকাশে-বাতাসে। চারিদিকে শুরু হয়েছে শোষিত বঞ্চিত জনগণের দৃপ্ত প্রতিরোধ অভিযান।

১। কে. কে. দত্ত, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ ২৯।

২। ডব্লু ডব্লু. হাণ্টার, 'দি অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল', পৃ-২৫৪।

উনিশ

সংগ্রামপুরের যুদ্ধে হাজার হাজার সাঁওতাল বিদ্রোহীকে হত্যা করেও ইংরাজরাজ অরণ্যপ্রদেশের বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হল না। শাসকশ্রেণী ও জমিদার-মহাজনদের অমানুষিক অত্যাচার সাঁওতালদের মনে যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, সে আগুন সহজে নিভে যাবার নয়। সাঁওতালদের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক সিদু এবং আরো অনেকে তখনও জীবিত। তাঁরা আবার ইংরাজবাহিনীকে বাধা দেবার আয়োজন করতে লাগলেন। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায় সাঁওতাল বিদ্রোহীরা ছোট ছোট দলে সংঘবদ্ধ হয়ে গেরিলা কায়দায় ইংরাজবাহিনীর উপর প্রতিশোধ নিতে লাগল। এমন কি তারা অরণ্যপ্রদেশটিকে বিদেশীরাজের শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য রাস্তাঘাট সমস্ত ভেঙ্গে চুরমার করে দিল, রেল-লাইন তুলে ফেলল, শহরাঞ্চলের সঙ্গে অরণ্যাঞ্চলের সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করল। ফলে, বাঙ্গলাদেশের বীরভূম থেকে বিহারের ভাগলপুর জেলা পর্যন্ত ইংরাজ শাসনের পুনরায় অবসান ঘটল। শাসকগোষ্ঠী আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে এবার তাদের চরম অস্ত্র 'সামরিক আইন' প্রয়োগ করল। ১৮০৪ সালের ১০নং রেগুলেশনের ৩ ধারা অনুযায়ী ১০ই নভেম্বর, সামরিক আইন জারী করা হল। সামরিক আইনে বলা হল—

> "এতদ্দ্বারা ঘোষণা ও বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে বাঙলার লেফটেন্যাণ্ট, গভর্নরের উপর ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের ১০নং বিধি বলে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া, এবং সপরিষদ সভাপতির সম্মতি ও ঐকমত্য সহ, তিনি (লেফটেন্যাণ্ট-গভর্নর) নিম্নলিখিত জেলাসমূহে এতদ্বারা সামরিক আইন জারী করিতেছেন, উহার অর্থ ঃ গঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরে ভাগলপুর জেলার যে অংশ আছে তাহা ; ভাগীরথী নদীর দক্ষিণ তীরে মুর্শিদাবাদ জেলার যে অংশ আছে তাহা ; বীরভূম জেলা এবং ব্রিটিশ সরকারের এলাকাগুলির মধ্যে জন্ম হইয়াছে অথবা ব্রিটিশ সরকারের অধীন এলাকাগুলির অধিবাসী এবং ইহার রক্ষণাধীন বলিয়া যে সকল ব্যক্তি, সাঁওতাল এবং অন্যান্য, উক্ত সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন এবং ঐরূপ যে সকল ব্যক্তি এই ঘোষণার তারিখের পর এবং উপরোক্ত জেলাগুলির মধ্যে উক্ত সরকারের প্রকাশ্য বিরোধিতায় সশস্ত্র অবস্থায় ধৃত হইবেন অথবা অস্ত্রবলে উক্ত সরকারের অধিকারের বিরোধিতা কর্মে লিপ্ত থাকা অবস্থায় ধৃত হইবেন, অথবা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে কোন প্রকাশ্য বিদ্রোহমূলক কাজ বাস্তবে রূপায়িত করার কর্মে লিপ্ত থাকা অবস্থায় ধৃত হইবেন, তাঁহাদের সকলের ক্ষেত্রে উক্ত লেফটেন্যাণ্ট্-গভর্নর উপরোক্ত জেলাগুলির মধ্যে সাধারণ ফৌজদারী আদালতগুলির-কাজকর্মও স্থগিত রাখিতেছেন ;

"এবং উক্ত লেফটেন্যাণ্ট্-গভর্নর এতদ্বারা এই আদেশও জারী করিতেছেন যে, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকারকারী যে সকল ব্যক্তি, সাঁওতাল এবং অন্যান্য, এই ঘোষণার তারিখের পর, উপরোক্তভাবে ধৃত হইবেন, তাঁহাদের সামরিক আদালতে বিচার করা হইবে ; এবং এতদ্বারা ইহা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে ঐ আদালতের রায়ে যে কোন ব্যক্তি উপরোক্ত যে অপরাধে দণ্ডিত হইবেন, তাঁহারা ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের ১০নং বিধির ৩ ধারা অনুযায়ী আশু মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।"[১]

এভাবে সামরিক আইন জারী করে বাঙ্গলাদেশের বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ থেকে বিহারে ভাগলপুর পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলটি সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হল। জেনারেল লয়েড এবং ব্রিগেডিয়ার বার্ড ১৪,০০০ মিলিটারী নিয়ে প্রবেশ করলেন সাঁওতালদের বাসভূমিতে। ফলে সামরিক বাহিনীর অবর্ণনীয় অত্যাচার, গুলিবর্ষণ, লুটতরাজ ও অবাধ নরহত্যা চলতে লাগল। দানববাহিনীর তাণ্ডব থেকে কিছুই রক্ষা পেল না। হাজার হাজার সাঁওতাল যুবক, বৃদ্ধ, নারী ও শিশু প্রাণ হারাল, সাঁওতাল গ্রামগুলি জ্বলতে লাগল। কিন্তু সাঁওতালরা তবুও মাথা নত বা আত্মসমর্পণ করেনি, আত্মসমর্পণের চেয়ে মৃত্যুকেই তারা শতগুণে শ্রেয় বলে গ্রহণ করেছিল। পরবর্তীকালে হাণ্টার সাহেবের কাছে সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা বলতে গিয়ে মেজর জারভিস স্বীকার করেছেন—

"আমরা যা করেছি তা যুদ্ধ নয়, গণহত্যা। আমাদের উপর নির্দেশ ছিল যখনই কোন গ্রামের ধোঁয়ার কুণ্ডলী বনের উপর দেখা যাবে তখনই সে গ্রামটি ঘিরে ফেলতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও আমাদের সঙ্গে যেতেন। আমি আমার সিপাহীদের নিয়ে একদিন একটি গ্রাম অবরোধ করলাম। ম্যাজিস্ট্রেট তাদের আত্মসমর্পণ করতে বললেন। তার উত্তরে একটি বাড়ির দরজার ফাঁক দিয়ে বের হয়ে এল এক ঝাঁক তীর। আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে সে জায়গা থেকে চলে যেতে বললাম এবং সিপাহীদের নিয়ে সে বাড়ির নিকটবর্তী হলে সিপাহীরা ঘরের দেওয়াল ভেঙ্গে একটা বড় গর্ত তৈরি করল। আবার আমি বিদ্রোহী-দের আত্মসমর্পণ করতে বললাম এবং না করলে গুলিবর্ষণ করব বলে ভয় দেখালাম। এর উত্তরে আবার একঝাঁক তীর বের হয়ে এল। এবার একদল সিপাহী ঘরের নিকটবর্তী হয়ে দেওয়ালের গর্তের মধ্য দিয়ে ভিতরে গুলিবর্ষণ করল। আবার আমি তাদের ডেকে আত্মসমর্পণ করতে বলায় আর একঝাঁক তীর বের হয়ে এল। ইতিমধ্যে কয়েকজন সিপাহী তাদের তীরে আহত হয়েছিল। আমাদের

১। সি. ই. বাকল্যাণ্ড, 'বেঙ্গল আণ্ডার দি লেফটেন্যাণ্ট গভর্নরস', ১ম খণ্ড, পৃ-১৫।

চারদিকে আগুন জ্বলছিল। সুতরাং বাধ্য হয়ে সিপাহীদের তাদের কর্তব্য করার নির্দেশ দিতে হল। প্রতিবার গুলিবর্ষণের পর তাদের আত্মসমর্পণের সুযোগ দেওয়া হল। অবশেষে ভিতর থেকে তীরের জবাব আসা বন্ধ হল, সম্ভব হলে কয়েকজনের জীবনরক্ষার জন্য আমি ভিতরে প্রবেশ করতে মনস্থির করলাম। আমি ভিতরে প্রবেশ করে একজন বৃদ্ধ সাঁওতালকে রক্তাক্ত কলেবরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। বৃদ্ধ তার চারপাশের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বহু মৃতদেহের মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একজন সিপাহী তার কাছে গিয়ে অস্ত্রত্যাগ করতে বলামাত্র সে তার হাতের টাঙ্গি দিয়ে সিপাহীর মাথা কেটে ফেলল।"[১]

এভাবে কেবল মৃত্যুপণ সংগ্রামের ভিতর দিয়েই সাঁওতালরা এক নিজস্ব স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করতে চেয়েছিল, বিদেশীরাজের সামরিক শক্তির কাছে কোনরকম মাথা নত করেনি। তাই, কোটি কোটি ভারতীয় জনতার কাছে সাঁওতাল বিদ্রোহ আজও এত উজ্জ্বল, এত মহান।

সাঁওতাল বিদ্রোহীদের জব্দ করতে না পেরে ব্রিটিশ সরকার যে কি অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছিল, তা কল্পনারও অতীত। বীরভূমের একটি পত্র 'সম্বাদ ভাস্কর'এর সম্পাদকীয় স্তম্ভে সেদিন প্রকাশিত হয়েছিল ঃ

"মহাশয়, নিষ্ঠুরতার বিষয় কি কহিব, যদি আপনি স্বচক্ষে দেখিতেন তবে অশ্রুজলে অবগাহন করিতেন, পোলিস সম্পর্কীয় লোকেরা দামিনীকো নামক স্থান হইতে ৫০ জন সন্তালকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে, তাহারদিগের অবস্থা দেখিলে পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিরাও রোদন করেন, ঐ সকল সন্তালেরা যে-দিবস ধৃত হয় সে দিন ও তৎপর দিবারাত্রি নিরাহারে বন্ধনাবস্থায় ছিল আহারার্থে জল বিন্দুও পায় নাই, পোলিসের লোকেরা তাহারদিগকে যেমন ধৃত করিয়াছে অমনি বেড়ী পায়ে দিয়াছে, হাতে কড়ী পায়ে বেড়ী, ঐ কড়ী বেড়ী শৃঙ্খলযুক্ত করিয়াছে তৎপরে পঞ্চাশ জনকে এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া টানিয়া লইয়া আসিয়াছে, বেড়ীর ঘর্ষণে অনেকের হস্ত পদে ঘা হইয়া গিয়াছে, সেই ঘা হইতে ঝর্ঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছে, পথে চলিতে না পারিয়া অনেকে পড়িয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া আসিয়াছে, তাহাতে সর্ব্বাঙ্গের চর্ম্ম ছাড়িয়া গিয়াছে, ঐরূপ টানাটানিতে এক বৃদ্ধ মরিয়া গিয়াছিল, তাহার মৃতদেহ হস্তিপৃষ্ঠে তুলিয়া বীরভূমে পাঠাইয়া দিয়াছে; দামিনীকো হইতে বীরভূমে আসিতে আবদ্ধ সন্তালেরা যে কয়েক দিবস পথিমধ্যে ছিল তাহারা অন্ন পায় নাই, বীরভূমের কারাগারের সম্মুখে আনিয়া যখন শৃঙ্খল খুলিয়া দিল তখনও তাহারা হাঁটিয়া কারাগারে প্রবেশ করিতে পারিল না, বেত্রাঘাত

১। ডব্লু. ডব্লু. হাণ্টার, 'দি অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল', পৃ-৩১৬।

করিতে২ পদাতিকেরা হেঁছড়ীয়া টানিয়া জেহেলখানায় লইয়া গেল, পরে তাহারদিগের কপালে কি হইয়াছে আমি জানিতে পারি নাই।

"দামিনীকো স্থান চতুর্দ্দিগে পর্ব্বত বেষ্টিত, মধ্যস্থল স্থলভূমি, ঐ স্থানে সন্তালেরা বসতি করে, কেবল সন্তাল দমনার্থে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সেই স্থানে এক জিলা স্থাপন করিয়াছেন তথায় একজন যুবা ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন তাঁহার আকার প্রকার মনুষ্যের ন্যায় বটে, কিন্তু বিচারাচারে তিনি ব্যাঘ্রাদিকেও পরাজয় করিয়াছেন, সন্তালেরা আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল সংগ্রাম সময়ে সভ্য জাতিরাও গ্রাম২ দাহ করিয়া থাকেন এবং বিপক্ষ পক্ষের অনুগত লোকদিগের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লন, সন্তাল সময়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও সন্তাল প্রজাদিগের গ্রাম দাহ অর্থ লুঠ করিয়াছেন, সন্তালেরা চুরী ডাকাইতী করে নাই, এইক্ষণে তাহারা দুর্ব্বল হইয়াছে; দামিনীকো স্থানে কারাগার প্রস্তুত হয় নাই; মাজিস্ট্রেট সাহেব সন্তালকুলকে ধৃত করিয়া বীরভূমের কারাগারে পাঠাইয়া দিবেন গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি এইমাত্র আদেশ করিয়াছেন ইহাও সর্ব্বসাধারণের বিদিত আছে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট দস্যু তস্করাদিকেও যন্ত্রণা দেন না, তাহারদিগের আহারাদির জন্য রাজভাণ্ডার হইতে অর্থপ্রদান করিতেছেন, দামিনীকো স্থানীয় যুব মাজিস্টেট সাহেবের ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নির্ম্মল কুলে জন্মগ্রহণ হইত তবে সন্তালদিগকে এত যন্ত্রণা দিতেন না, সন্তালেরা যখন স্বাধীন ছিল তখন কত মাজিস্ট্রেটের মস্তক কাটিয়া ফেলিয়াছে, কত বিবিকে ধরিয়া লইয়া যাইয়া আপনাদিগের কুঁড়িয়া ঘরে ভোজন পান করাইয়াছে, শিশু মাজিস্ট্রেট পূর্ব্বোক্ত সন্তালদিগের প্রতি যে নিষ্ঠুর ব্যাপার করিয়াছেন তাহাতে পশুরাও তাঁহাকে আপনাদিগের দলে তুলিতে চাহিবেক না, আমারদিগের লেপ্টেনেন্ত গবর্ণর বাহাদুর কি এ সকল বিষয় অনুসন্ধান করেন না; দামিনীকো স্থান হইতে যে ৫০ জন সন্তাল ধৃত হইয়া বীরভূম কারাগারে আসিয়াছে তাহারা জীবিতাবস্থায় আছে কিনা শ্রীযুত বাহাদুর অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার তত্ত্ব লইবেন, আমি জানিয়াছি গবর্ণমেণ্টের জেনেরেল ডিপার্টমেণ্টের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ভাস্কর পত্র পাঠ করিয়া থাকেন এবং প্রয়োজন মতে শ্রীশ্রীযুতের সাক্ষাতেও কোন কোন বিষয় পাঠ করেন অতএব বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি আমার এই প্রস্তাবটী যেন শ্রীল শ্রীযুত প্রধান পুরুষের কর্ণগোচর হয়।"[১]

১। 'সম্বাদ ভাস্কর', ৯৫ সংখ্যা, ২৫ নভেম্বর, ১৮৫৫।

সমস্ত অরণ্যপ্রদেশে চলতে থাকে সামরিক বাহিনীর বর্বর অত্যাচার। মৃত মানুষের স্তূপ বুকে করে দাঁড়িয়ে থাকে গ্রামের পর গ্রাম। গ্রাম তো নয়, যেন শ্মশান! অগণিত মানুষ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ধরা পড়েছে। মুক্তি সংগ্রামের সেই উদাত্ত আহ্বান ক্রমেই চাপা পড়ে আসছে।

এদিকে আবার তীব্র খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। কারো বাড়িতে এক কণা শস্য নেই। ধানক্ষেত ফাঁকা, চাষ-আবাদ হয়নি। অভাবের তাড়নায় সাঁওতালরা যা পায়, তাই খায়। কি আর করবে? রাতের অন্ধকারে ছাড়া বেরোনো মুশকিল। তবে একেবারে ভেঙ্গে পড়ে না তারা। নেতারা যখন বেঁচে আছেন, নিশ্চয় কোন ব্যবস্থা হবে।

কুড়ি

১৮৫৬ খৃষ্টাদের ৩রা জানুয়ারি সামরিক আইন তুলে নেওয়া হল, কিন্তু কয়েকদিন পরেই জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সাঁওতালরা সুজারামপুরের গ্রাণ্ট সাহেবের কুঠি আক্রমণের আয়োজন করে চিঠি পাঠাল। চিঠিতে লেখা হল ঃ

> "শিবশাহ ভগত সুবার আজ্ঞানুসারে সুজারামপুরের কুঠীওয়ালা মেং গ্রাণ্ট সাহেবের উপর।"
>
> "সংবাদ লও, এই আজ্ঞা প্রাপ্তি পরে তুমি আপন দ্রব্যাদি লইয়া কুঠী ত্যাগ করিবে, যদি তুমি প্রতিবাদ কিম্বা কোন ওজর কর তাহা শ্রবণ করা যাইবেক না। অতএব এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বুধবারে আমারদিগের সেনারা তোমার কুঠীতে উপস্থিত হইবেক, কোন রাইয়তের হানি হইবেক না, বরঞ্চ তাহারদিগকে রক্ষা করা যাইবেক, তারিখ ১২৬২ সাল ৩০ পৌষ।"[১]

এছাড়া আর একটি চিঠি তারা পাঠাল ভাগলপুরের আদালতে কমিশনার, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, কালেক্টর সাহেবদের কাছে যারা কাজ করে তাদের উদ্দেশে। এ চিঠিতে লেখা হল ঃ

> "শিবশাহ ভগত সুবা সম্ভাবিত রাজার আজ্ঞা।"
>
> "রামজিওলাল দেশ জয় করিয়াছেন তন্নিমিত্ত আমি লিখিতেছি, তুমি আমাকে জানাইবে যে জজ মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরেরা যুদ্ধকরণে মনস্থ করিয়াছেন কিনা? যদি আমারদিগের সুবারা আক্রমণ করে তবে রাইয়তদিগের ক্ষতি হইবেক এবং যদি ইংরাজ সেনারা আইসে তথাচ রাইয়তেরা ক্লেশ পাইবে। অতএব ইহা যুক্তিসিদ্ধ যে কেবল কিশোরীয়া সুবার সহিত ইংরাজেরা যুদ্ধ করুণ, তাহা হইলে রাইয়ত-দিগের কোন হানি হইবেক না, এই পরওয়ানার মর্ম্ম ডাকযোগে ঐ সকল লোকদিগকে জ্ঞাত কর যাহারদিগের নিমিত্ত ইহা লেখা হইল।
>
> "সেরেস্তাদারকে লেখা যায়।'
>
> তারিখ ১২৬২ সাল ২৯ পৌষ, পূর্ণিমা, সোমবার।"

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি কর্তা মাঝির অধীনে সাঁওতাল বিদ্রোহীরা সুজারামপুরের গ্রাণ্ট সাহেবের কুঠি লুট করল। 'সম্বাদ ভাস্কর'-এ প্রকাশিত হয়েছিল ঃ

> "...প্রকাশ হয় সন্তালেরা ২৩ দিবসে সুজারামপুরে মেং জি গ্রাণ্ট সাহেবের কুঠী অধিকার করিয়া কাছারী ও আমলাদিগের বাসাবাটী সমুদয় গৃহ দাহ করিয়া দিয়াছে, ঐ কুঠীর কামরায় তাহারা একদিন

১। 'সম্বাদ ভাস্কর', ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৬, ১২৫ সংখ্যা।

অবস্থান করিয়াছিল, আমলারা পূর্ব্বেই তাঁহারদিগের আগমন সমাচার জ্ঞাত হইয়া গো মহিষাদি পশু ও কুঠীর কাগজাদি এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, মেং গ্রাণ্ট সাহেব এক্ষণে কলকাতায় আছেন, ওদিগে সন্তালেরা তাঁহার সর্ব্বনাশ করিল, এই সন্তাল দল দেওগড়ের দিক হইতে আসিয়াছে সুবা কর্ত্তা মাজি নামক এক ব্যক্তি তাহারদিগের দলপতি।"[১]

'সম্বাদ ভাস্কর'-এর ঐ সংখ্যায় আরো পাওয়া যায়—

"সন্তালেরা সমুদয় হুন্দুই পরগনা ব্যাপ্ত হইয়া সর্ব্বত্র লুট করিতেছে, প্রথম বারাপেক্ষা এবারে বিদ্রোহানল আরো প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, প্রধান পক্ষের দোষেই এই দ্বিতীয় বিদ্রোহিতা উপস্থিত হইল, সন্তাল শাসন হইয়াছে বলিয়া সেনাসকল উঠাইয়া না আনিলে সন্তালেরা এরূপ দ্বিতীয়বার বিদ্রোহাচরণ করিতে সাহসী হইত না।"

বিদ্রোহীদের আক্রমণ আবার নতুন করে শুরু হল। এবার তারা ছোট ছোট দলে সংঘবদ্ধ হয়ে বেপরোয়াভাবে প্রতিশোধ নিতে লাগল এবং গেরিলা কৌশলে ইংরাজ বাহিনীকে অস্থির করে তুলল। ধর্মা মাঝি ও বিন্দা মাঝির নেতৃত্বে সাঁওতালরা একত্র হয়ে হরিপুর ও জয়পুর গ্রাম দুটি লুট করে জ্বালিয়ে দিল। খবর পেয়ে সাঁওতাল প্রদেশের স্পেশ্যাল কমিশনার ইডেন সাহেব ৪২নং দেশীয় পদাতিক বাহিনীর সেনাপতিকে অবিলম্বে সৈন্য পাঠাবার জন্য লিখলেন। এদিকে বিদ্রোহীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে যে সমস্ত মহাজন ও সুদখোর তখনও জীবিত ছিল তাদের নির্মমভাবে হত্যা করতে লাগল। পুলিস-মিলিটারীর ঘাটিগুলো পর্যন্ত বাদ গেল না, সেগুলোর উপরেও তীব্র আক্রমণ চলল। বিদ্রোহ ক্রমেই ভয়ানক আকার ধারণ করল। সমসাময়িক পত্রিকাগুলোতে স্পষ্টভাবেই লেখা হল যে ইডেন সাহেবের উপর যে ভার দেওয়া হয়েছে, তিনি সে কাজের উপযুক্ত নন।

"অতএব গবর্ণমেণ্টের উচিত ঐ পদে জনৈক উপযুক্ত মিলিটরী আফিসর নিযুক্ত করেন তবে ত্বরায় বিদ্রোহানল নিবারণ হইবেক 'যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্য লোকে লাঠী বাজে' সিবিলিয়ানেরা মিলিটরী কার্য্যের কি জানেন।"[২]

২৭শে জানুয়ারি লেফটেন্যাণ্ট ফেগান সাহেবের অধীনস্থ ভাগলপুর হিল রেঞ্জার্স বাহিনীর সঙ্গে একদল সাঁওতালের মুখোমুখি লড়াই হল। বিদ্রোহীরা সংখ্যায় ২০০ জনের বেশী ছিল না। ফেগান সাহেব তাদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিলেন, কিন্তু তার পরিবর্তে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ইংরাজ সৈন্য বাহিনীর উপর আসতে লাগল। সৈন্য বাহিনী পাল্টা গুলি চালাল। শেষ পর্যন্ত

১। 'সম্বাদ-ভাস্কর', ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৬, ১২৫ সংখ্যা।
২। সম্বাদ ভাস্কর', ২২ জানুয়ারী, ১৮৫৬, ১২২ সংখ্যা।

বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়ে নিকটবর্তী জঙ্গলে আত্মগোপন করল। এ লড়াইয়ে যানারোহী পুরুষবেশী এক সাঁওতাল নারী সর্দার নিহত হয়। 'সম্বাদ ভাস্কর' এ পাওয়া যায়ঃ

> "যানারোহী এক সান্তাল সরদার ঐ দলের সঙ্গে ছিল, গুলি দ্বারা তাহার পঞ্চত্ব লাভ হইয়াছে তাহার মৃত্যুর পরে প্রকাশ যে ঐ সরদার পুরুষ নহে, রমণী পুরুষ বেশে আসিয়াছিল।"[১]

বলা বাহুল্য, স্বজাতির মুক্তি সাধনের জন্য সাঁওতাল নারীরাও সেদিন পিছিয়ে থাকেনি, স্বজাতির এই মুক্তি-সংগ্রামে তারাও অংশ গ্রহণ করেছিল।

ইতিমধ্যে ভাগলপুরের কাছে সাঁওতাল বিদ্রোহীদের সঙ্গে ইংরাজ বাহিনীর এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বিদ্রোহের অন্যতম দুই নায়ক চাঁদ ও ভৈরব প্রাণ হারালেন, ফলে বিদ্রোহীদের মনে হতাশা দেখা দিল। ঠিক এ সময়ে ইংরাজ সৈন্যরা বীরভূমের সাঁওতাল বিদ্রোহীদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাল। কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বিদ্রোহীরা পিছু হটতে বাধ্য হল। বিদ্রোহীদের পিছু হটতে দেখে ইংরাজ সৈন্যরা তাদের অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। যেখানে-সেখানে সাঁওতালদের গুলি করে হত্যা করতে লাগল। সাঁওতাল জনসাধারণকে এভাবে ইংরাজ সৈন্যদের বর্বরতার মুখে ফেলে দিয়ে চুপ করে থাকা সম্ভব নয়, সিদুর সাঁওতাল বাহিনী ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ইংরাজ সৈন্যদের প্রাণপণে বাধা দিতে লাগল।

এদিকে ইংরাজ সৈন্যরা গ্রামের পর গ্রাম ঘেরাও করে সিদু-কানুর সন্ধান করতে লাগল। সিদু-কানুর আস্তানা খুঁজে বের করা চাই, নইলে এ যুদ্ধ থামবে না। প্রচুর অর্থের লোভ দেখানো হল সাঁওতালদের, যদি বিশ্বাসঘাতক খুঁজে পাওয়া যায়, অন্যদিকে আবার তেমনি চলল সাঁওতাল নিধন যজ্ঞ। বন্দী সাঁওতালদের একটি বড় দলকে সিউড়ির মাঠে প্রকাশ্য দিনের আলোয় ফাঁসি দেওয়া হল। সৈন্য ও পুলিশের অকথ্য অমানুষিক অত্যাচারে শেষ পর্যন্ত কয়েকজন সাঁওতাল সিদু-কানু ও অন্যান্য নেতাদের গোপন আস্তানার খবর ইংরাজদের জানিয়ে দিল।

> "আলে হেরেল হপন দো মিৎ মিৎতেকো সাপ্' ইদিকেৎলেয়া ধাসনিয়া রাজ আতো, সাপ্' এ্যামকো দো অণ্ডে দো মিৎ চান্দো লেকা দহকাতে মোর গাডা ফেড কুমারবাদতেকো আগুকেৎলেয়া। উনুরে সাহেবকো চাচ্‌কিকেৎলেয়া, মেতাংলেয়াকো চাঃক্'পে হার্খেতঃক্'আ? সুবা লাইকোপে, নিত্‌গেলে ছুটিপেয়া। খানগে দিশম হড়কো লাইকেৎকোওয়া।"[২]

অর্থাৎ—

> "আমাদের পুরুষদের এক এক করে ধাসনিরা রাজার গ্রামে ধরে নিয়ে

১। 'সম্বাদ ভাস্কর', ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬, ১২৬ সংখ্যা।

২। 'হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াক্' কাথা', পৃ-২৪৩।

> গেল। যাদের ধরা হয়েছিল তাদের সেখানে একমাস আটকে রেখে মোর নদীর কাছে কুমড়াবাদে আনা হল। সে সময় সাহেবরা আমাদের প্রতারণা করে বলল, কেন তোমরা কষ্ট পাবে? নেতাদের নাম বলে দাও, এখনই তোমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। তখন তারা বলে দিল।"

জানা যায়, ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইংরাজ সৈন্যরা সিদুকে গ্রেপ্তার করার সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে হত্যা করে। কয়েকদিন যেতে না যেতেই ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বীরভূম জেলার ওপরবাঁধের নিকট একদল সশস্ত্র পুলিসের হাতে কানুও গ্রেপ্তার হলেন। জুগিয়া হাড়াম বলেছেন :

> "সিদো দো লাড়হাইরেয়ে গচ্' হাতাড়এনা আর কানহুতেকো তায়মরেকো সাপ্'কেৎকোওয়া। কানহু আর মিৎবার্ হড়কো ফাঁসীকেৎকোওয়া আর তিনাঃক্' চ কো দ্বীপচালানকেৎকো।"[১]

অর্থাৎ—

> "সিদু যুদ্ধে মারা পড়লেন এবং কানহু ও অন্যান্যরা পরে ধরা পড়লেন। কানহু এবং দু-একজনকে ফাঁসি দেওয়া হল আর কিছু সংখ্যককে দ্বীপান্তরে পাঠান হল।"

কিন্তু সিদুর মৃত্যু সম্পর্কে অনেকেই একমত হননি। ব্র্যাডলি-বার্ট লিখেছেন—

> "চার ভাই-এর মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং দলের প্রধান নেতা সিধু ধরা পড়ল এবং একটা সংক্ষিপ্ত বিচারের পর মিঃ পন্টেট বারহেটে এক বিরাট জনসমষ্টি—যারা পরাজয়ের একটা আত্মগ্লানি নিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করছিল,—তাদের সামনে তাকে ফাঁসি দিলেন। এই সংঘর্ষে যত সাঁওতাল নিহত হয়েছিল, সংখ্যায় তারা দশহাজারের কম নয় কিন্তু যখন তাদের আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণরূপে সংসাধিত হ'ল এবং সমগ্র জাতি যখন সংগ্রামের উদগ্র উত্তেজনার পর সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও মৃতপ্রায়, তখন তাদের অবস্থার প্রতিবিধানের জন্য যে অনাহূত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তারা তার প্রাপ্তির প্রত্যাশায় নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।"[২]

ছটরায় দেশমাঝির বিবরণ থেকে জানা যায়, সিদু-কানহু দুজনেরই ফাঁসি হয়েছিল। তিনি বলেছেন :

> "আর সিদো কানহুতোকিন দো সাহেব হপনকো সাপ্'কেৎকিনতে আর আঁড়ি আঁড়ি হড়াঃক্' জিউয়ীকিন খত্‌রা ওচোকেৎ, আঁড়ি আঁড়ি মাইজুকিন রাণ্ডি ওচোকেৎকো আর আঁড়ি আঁড়ি গিদরীকিন টুওয়ার

১। 'হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃক্' কাথা', পৃ-২৪৩।
২। এফ. বি. ব্র্যাডলি-বার্ট, 'দি স্টোরি অফ এন ইণ্ডিয়ান আপল্যাণ্ড', পৃ-২০৬।

আমার ওচোকেৎকো, আঁডি আঁডি হড়াঁকিন জালে থালে আর রাঃক্' ওচোকেৎকো এঃতুমতেকো বিচার দুষীকেৎকিনা আর ওনা ইয়াতেকো শাস্তিকেৎকিনা, মেতাক্'মে মাতকম্ দারেরে আকাকাতেকো ফাঁসি গচ্'কেৎকিনা ঝিলিমিলি টাঁড়রে। আর পিণ্ডরারেন ভগ্না দো কাথায় আঁডি হড়ে বঙ্গায়েৎকো তাঁহেকানা ওনা ইয়াতে উনি দো খিদি খিদি সামাঃক্' কুট্রাকাতে আঁডিতেৎ হারখেত্ ওচোকাতেকো গচ্'কেদেয়া।"[১]

অর্থাৎ—

"ইংরাজরা সিদু-কানহুকে ধরল এবং বহু লোকের মৃত্যুর জন্য, বহু মেয়েকে বিধবা করার জন্য, বহু ছেলেকে অনাথ করার জন্য, বহু লোককে আশ্রয়হীন করার ও কাঁদানোর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করল এবং এজন্য শাস্তি দিল অর্থাৎ ঝিলিমিলি মাঠে মহুয়া গাছে টাঙ্গিয়ে ফাঁসি দিল। পিণ্ডরার ভগ্না বহুলোকের প্রাণনাশ করেছিল, এজন্য তাকে টুকরো টুকরো খণ্ড করে ভীষণ কষ্ট দিয়ে হত্যা করল।"

ছটরায় দেশমাঝির কথাই নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়। তিনি নিজে বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন এবং অনেক ঘটনা জানতেন। সিদু-কানু কিংবা অন্যান্য নেতাদের খবর রাখা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং তাঁর কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এভাবে, পরাধীন ভারতের দুই মহান যোদ্ধা তাঁদের জীবন দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস রচনা করে গেলেন।

১। 'ছটরায় দেশমাঞ্জহি রেয়াঃক্' কাথা', পৃ-১৯।

একুশ

দামিন-ই-কোহ্‌র পথে প্রান্তরে রক্তের হোলি খেলা শেষ হল। বিদেশী সাম্রাজ্য-বাদের পশুশক্তির কাছে সাঁওতাল বিদ্রোহীরা শেষ পর্যন্ত পরাজিত হল। ইংরাজ সরকার মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল যে, কামান বন্দুকের সাহায্যে সাঁওতালদের স্বাধীনতালাভের আকাঙ্খাকে স্তব্ধ করা অসম্ভব। সাঁওতালরা মরতে জানে, কিন্তু আত্মসমর্পণ করতে জানে না। এই সাঁওতালদের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য স্তরের জনসাধারণের অবাধ মিশ্রণ ঘটলে অচিরে বিদ্রোহের বীজ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে এবং বৃটিশ রাজত্বের অবসান ঘটবে। 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকায় এ কথা স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয়েছিল ঃ

> "পাটনা নগরে জনরব উঠিয়াছে এবারে চারি লক্ষ সন্তাল গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে, রাজসেনারা তাহারদিগের বেগধারণে অসমর্থ হইয়াছে, বেহারীয় যবনেরাই এই অমূলক জনরব তুলিয়াছে, তাহারা নিশ্চয় করিয়াছে সন্তালীয় বিদ্রোহিতা সূত্রেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সিংহাসন ভ্রষ্ট হইবেক।"[১]

উক্ত সংখ্যার সম্পাদকীয় কলমে সেদিন একথাও লেখা হয়েছিল ঃ

> "এক সন্তালীয় উপদ্রবেই গবর্ণমেণ্ট বিব্রত হইয়া উঠিয়াছেন, যদি এ সময়ে অন্য কোন দিগে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠে একেবারে দেশ উচ্ছন্ন হইবেক, এ দেশে সৈন্যের বড়ই অঘটন পড়িয়াছে, রুষীয় সমরে গোরা পল্টন সকল গমন করিয়াছে, সিপাহী দলের অধিকাংশ লাহোরাদি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এবং রাঙ্গুন পেগু ইত্যাদি স্থানে রহিয়াছে, কলিকাতার নিকটে যে দুই একটি সিপাহি দল ছিল তাহারা সন্তাল তাড়নে নিযুক্ত আছে, এখন অন্য কোন বন্য জাতি বিদ্রোহি হইলে গবর্ণমেণ্ট কি প্রকারে তাহারদিগকে নিবারণ করিবেন দূর হইতে সেনা আসিতে[২] তাহারা সন্তালদিগের ন্যায় রাষ্ট্র বিপ্লব করিবে।"

তাই ইংরাজ সরকার বিদ্রোহ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতালদের ভারতীয় জন-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্য 'সাঁওতাল পরগনা' নামে ননরেগুলেশন জেলা সৃষ্টি করল। দামিন-ই-কোহ্‌র আয়তন বাড়িয়ে চতুর্সীমা নির্দিষ্ট করা হল। চৈতন্য হেম্ব্রম লিখেছেন ঃ

> "দামিন-ই-কোহ্ ওন্‌তে নতেকো আগাদকেদা। ভাগলপুর আর বীরভূম জিলা রেয়াঃক্' তারা কেচাক্'কো আদের আদা। উত্তর সেচ্'রে গঙ্গা ভিড়াও মেনাঃক্' তিলিয়াগাড়্হি পারগানা হঁ দামিন-ই-কোহ্ রেকো জড়াওকেদা; পাহিল্ দো মনিহারি জমিদারী তাঁহেকানা। মেনখান মুসলমান বিদালরে রোশান ভগত এঞ্তুমায়

১। 'সম্বাদ ভাস্কর', ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬, ১২৯ সংখ্যা।

হিন্দু তিলি ইসলাম ধরমে সাপ্'কেৎতে ওনা পারগানা দো উনিকো গেৎ বেগারআদেয়া আর তিলিয়াগাড়হিরেন রাজায় হোয়এনা। মুসলমানকোওয়াঃক্' দখলরে তাঁহেকান রাজমহল আডেপাশে জায়গা ; পাকুড়রেন ব্রাহ্মণ গুষ্টিরে তাঁহেকান পারগানা অম্বর ; রাজপুত-কোওয়াঃক্' সুলতানাবাদ পারগানা হঁ সান্তাল পারগানারে আদেরএনা। আরহঁ পাঠান রাজকোওয়াঃক্' খড়্গপুর জিলা, খাতাউরিকোওয়াঃক্' হাণ্ড্ওয়াই ; ভুঁইয়াকোওয়াঃক্' পাসাই পারগানা ; খাতাউরি কোওয়াঃক্'গে মনিহারি, বারকোপ আর পারসাণ্ডা ; বীরভূমরে পাঠান রাজকোওয়াঃক' তাপ্পা ; দেওঘর আর বেলপাত্তা লাগায়তে সান্তাল পারগানা বাঁধাওএনা।[১]

অর্থাৎ—

"দামিন-ই-কোহ্ এদিক ওদিকে বাড়ান হল। ভাগলপুর ও বীরভূম *জেলার কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত হল।* উত্তরে গঙ্গার পাশ্বর্বতী তিলিয়া-গাড়হি পরগনাও দামিন-ই-কোহ্র সঙ্গে যুক্ত হল। পূর্বে এটা ছিল মনিহারি জামদারী, কিন্তু মুসলমান রাজত্বকালে রোশান ভগত নামে এক হিন্দু তিলী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় এই পরগনাটি তাকে দেওয়া হয় এবং তাকে তিলিয়াগাড়হির রাজা করা হয়। মুসলমানদের রাজমহলের পাশ্বর্বতী অঞ্চল ; পাকুড়ের ব্রাহ্মণ পরিবারের অম্বর পরগনা ; রাজপুতদের সুলতানাবাদ পরগনাও সাঁওতাল পরগনার মধ্যে এল। আবার পাঠান রাজাদের খড়্গপুর জেলা ; খাতাউরিদের হাণ্ড্ওয়াই ; ভুঁইয়াদের পাসাই পরগনা ; খাতাউরিদেরই মনিহারি, বারকোপ এবং পারসাণ্ডা ; বীরভূমের পাঠান রাজাদের তাপ্পা ; দেওঘর ও বেলপাত্তা নিয়ে সাঁওতাল পরগনা গঠিত হল।"

নতুন জেলার শাসনভার ন্যস্ত হল একজন ডেপুটি কমিশনারের উপর।

"ভাগলপুর ও বীরভূমের কিছু কিছু অংশ নিয়ে ৫,৫০০ বর্গ মাইল জুড়ে এবং প্রথমে দেওঘর ও পরে দুমকায় প্রধান কার্যালয় নির্দিষ্ট করে যে সাঁওতাল পরগনা জেলা গঠিত হ'ল, সেটা বিদ্রোহ প্রশমনের পর প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট পরিবর্তন। এই পরগনাকে অনিয়ন্ত্রিত (নন্ রেগুলেটেড) একটি জেলারূপে রাখা হল এবং এশ্লি ইডেনকে প্রথম ডেপুটি কমিশনার ক'রে এর দায়িত্ব দেওয়া হল।"[২]

এতদিন পর্যন্ত পণ্টেট্ সাহেবই দামিন-ই-কোহ্র সুপারিনটেনডেণ্ট্ নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁকে অবসর নিতে হল। কারণ কোম্পানীর শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত

১। চৈতন্য হেম্ব্রম কুমার, 'সান্তাল পারগানা, সান্তাল আর পাহাড়িয়াকোওয়াঃক্' ইতিহাস', পৃ-৯৬।

২। জে. এম. ম্যাকফেল, 'দি স্টোরি অফ দি সান্তাল', পৃ-৬৩।

করার জন্য তিনি কোন রকম চেষ্টা করেন নি, কিংবা সাঁওতালদের অসন্তোষের কথা কোম্পানিকে জানাননি। তাই সাঁওতাল বিদ্রোহের জন্য দায়ী করা হল তাঁকেও।

"এরপর রীতি অনুযায়ী যে সরকারী তথ্যানুসন্ধান হ'ল তারফলে মি. পণ্টেটকে তীব্রভাবে দোষারোপ করে তাঁর পদ থেকে অপসারিত করা হল। ১৮৫৭ সালে তিনি ভগ্নহৃদয়ে মারা যান। এখন সকলেই উপলব্ধি করেছেন, যে তাঁকেই শিখণ্ডি খাড়া ক'রে সমস্ত দোষ তাঁর ওপর চাপানো হয়েছিল। তাঁর উপরিতন ব্যক্তিদের অজ্ঞতা ও অবহেলার জন্যই প্রকৃতপক্ষে যে ভয়াবহ পরিণাম সংঘটিত হয়েছিল, সেই দোষের বোঝা তাঁকেই বহন করতে হয়েছিল।"[১]

নতুন ডেপুটি কমিশনারের নির্দেশে অত্যাচারী পুলিসবাহিনীকে অপসারিত করা হল এবং শান্তিরক্ষার ভার দেওয়া হল গ্রামের মাঝি-পরগনাইৎদের উপর। ই. জি. ম্যান লিখেছেন—

"তাঁরই সুপারিশে সাঁওতাল পরগনা থেকে পুলিসের অত্যাচার, শোষণ ও জটিল কার্যবিধির বিবিধ আনুষঙ্গিক ও থানাসহ সমগ্র পুলিশ-বাহিনীকে উচ্ছেদ করা হল; এবং শান্তিরক্ষা, অপরাধীদের ধরা ও যাবতীয় প্রশাসনিক কার্য গ্রামবাসীদের ওপরই ন্যস্ত করা হল এবং প্রত্যেক গ্রামের মোড়লকে সব কাজ যথারীতি হচ্ছে কিনা তা দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হল।"[২]

এ ব্যবস্থায় সাঁওতালরাও সন্তুষ্ট হল, কারণ তাদের সমাজব্যবস্থা পূর্বের মতই চালু থাকল। মাঝি-পরগনাইৎদের মর্যাদা কিছুমাত্র কমল না। আদালতেও দুর্নীতিগ্রস্ত উৎপীড়নকারী আমলা বিচারক ও তাদের অনুচরদের সরিয়ে নতুন লোক নেওয়া হল। এক কথায়—বিচার বিভাগকে ঢেলে নতুন করে সাজানো হল।

"কম মাইনের দুর্নীতিগ্রস্ত আমলা আর ছ্যাঁচোড় মোক্তারের বেশে যত সব রক্তচোষা জোঁকের দলসহ আইন-আদালতগুলো সব উঠিয়ে দেওয়া হল এবং তাদের জায়গায় মিঃ ইউলকে মনোনীত করে এবং তাঁরই রচিত আইনবিধি সহ কয়েকজন কর্মঠ ইংরেজ ভদ্রলোককে এ্যাসিস্টাণ্ট কমিশনার নামে অভিহিত করে সাঁওতালদের মধ্যে পদাভিষিক্ত করা হল। যে আইনবিধি রচিত হল তার সারমর্ম হলঃ

"হাকিম অর্থাৎ এ্যাসিস্টাণ্ট কমিশনার ও সাঁওতালদের মধ্যবর্তী কোনও যোগাযোগকারী ব্যক্তি থাকবে না।"

"কোনও লিখিত অভিযোগ বা কোনও আমলার উপস্থিতি ব্যতিরেকেই

১। জে. এম. ম্যাকফেল, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ-৬১।
২। ই. জি. ম্যান, 'সান্থালিয়া এন্ড দি সান্থালস', পৃ-১২৫।

সাঁওতালদের মুখ থেকে সরাসরি যে কোনও নালিশ ধৈর্যের সঙ্গে শুনতে হবে।"

"অপরাধ ঘটিত যে-কোনও কার্যের নিষ্পত্তি গ্রামবাসীদের সহায়তায় সম্পন্ন করতে হবে, তারাই সাক্ষীসাবুদ সহ অপরাধীকে হাকিমের সামনে হাজির করবে, হাকিম তৎক্ষণাৎ তাদের বক্তব্য শুনবেন এবং দোষী ব্যক্তিকে আইনানুগভাবে শাস্তি বিধান করবেন।"[১]

সাঁওতালদের সুবিধার জন্য দুমকা, রাজমহল এবং গোড্ডাতে আদালত স্থাপন করা হল। এ সমস্ত আদালতে সাঁওতালরা যেন তাদের অভিযোগ পেশ করতে গিয়ে কোনরকম অসুবিধায় না পড়ে, সেদিকে দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা হল।

শুধু তাই নয়, সাঁওতালদের সন্তুষ্ট করার জন্য ঘোষণা করা হল যে, বিদ্রোহের সময়ে যে সমস্ত সাঁওতালের গরু-মহিষ হারিয়েছে, তারা যদি সেগুলি চিনতে পারে তবে আবার ফিরে পাবে। ছটরায় দেশমাঁঝিহির কথানুসারে—

"লাট সাহেব দো দিশমে রোফাকেৎআ আর রাজরাপাজকো ঠেন পরওয়ানায় কোল পাসনাওকেৎআ, বাংমা হুল ভিতরিরে যাঁহায় হড় হপনরেন মিহু মেরম, গাই কাডাকো বিলটাওআকানতাকো খান, আদো নিয়া মিৎ সেরমা ভিতরিরে যাঁহারেগেকো এেল ওরোমকোতাকো, আদো একালতেকো হাত চাপড়াকোওয়া; আদোকো হাত চাপড়ালেকো খান অকয় হঁ বাকো আড় দাড়েয়াকোওয়া, খাতিরজমাকো ইদিকোতাকোওয়া; বিন খরচ এমতেকো এাম রুওয়াড়কোতাকোয়া।"[২]

অর্থাৎ—

"লাট সাহেব দেশে শান্তি-শৃংখলা স্থাপন করলেন এবং জমিদারদের কাছে নির্দেশ পাঠালেন যে, বিদ্রোহের সময়ে যে সমস্ত সাঁওতালের গরু-ছাগল মহিষ হারিয়েছে তারা এক বৎসরের মধ্যে যে কোন স্থানে দেখে চিনতে পারলে দাবী করতে পারে এবং দাবী করলে কেউ বাধা দিতে পারবে না, একেবারে নিয়ে যাবে; কিছু খরচ না করেই আবার ফিরে পাবে।"

এতে সাঁওতালদের উপকারই হল। অনেকে গরু-মহিষ ফিরে পেয়ে আবার চাষের কাজে মন দিল।

সাময়িকভাবে সাঁওতাল পরগনায় মহাজন ও ব্যবসায়ীদের বসতিস্থাপন নিষিদ্ধ করা হল। কারণ, সাঁওতালদের চরম দুর্দশার জন্য দায়ী তারাই। একমাত্র ক্রীশ্চান মিশনারীদের জন্যই কোন বাধা থাকল না। কিন্তু কয়েক বৎসর পর মিশনারীরা সাঁওতাল পরগনায় কাজ আরম্ভ করে। সাঁওতাল পরগনার গেজেটিয়ারে পাওয়া যায়ঃ

১। ই. জি. ম্যান, 'সান্থালিয়া এণ্ড দি সান্থালস', পৃ-১২৬-১২৭

২। 'ছটরায় দেশমাঁঝিহি রেয়াক্‌' কাথা', পৃ-১৯।

"কাজ শুরু হ'ল ১৮৬২ সালে, প্রথম মিশনারী ছিলেন রেভাঃ ই. এল. পাক্সলে এবং রেভাঃ ডব্লু. টি. স্টরস্। বর্তমানে ধর্মপ্রচার, শিক্ষাপ্রসার ও চিকিৎসা কার্যের ব্যবস্থাযুক্ত চারটি কেন্দ্র আছে,— গোড্ডা মহকুমার পাথরা ও ভাগ্যায় এবং রাজমহল মহকুমার তালঝারি ও বারহারোয়ায়।

দুমকা মহকুমায় চল্লিশ বছরেরও আগে স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার লুথারেন মিশন স্থাপিত হয়েছে, ডেনমার্কবাসী রেভাঃ এইচ. পি. বোয়েরসেন ও নরওয়েবাসী রেভাঃ এল. জি স্ক্রেফসরুড, যাঁর রচিত সাঁওতালী ভাষার ব্যাকরণ সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য; তাঁরা ১৮৬৭ সালে কাজ আরম্ভ করেন।"[১]

বিদ্রোহের পর 'চার্চ মিশনারী সোসাইটি'ই প্রথম সাঁওতাল পরগনায় সাঁওতাল-দের মধ্যে কাজ আরম্ভ করেছিল, পরে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান মিশন আসে। রেভাঃ পি. ও. বোডিং সাঁওতাল পরগনায় মিশন প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে লিখেছেন—

"মিশন রেয়াঃক্' মারে রিপোর্টকো লেকা ব্যাপ্টিস্ট্ মিশন দো জনসন্ সাহেবকো ভারআদেয়া হড় হপনকো তালারে কাঁমি এহব্ লাগিৎ। উন্‌রে (১৮৬৫-৬৬ সালরে) সিহুড়ি খন থোড়ায় এহপ্'কেৎআ। ১৮৬৭ সালরে উনি আর পাপা সাহেবতেকো বেলবুনিতেকো হেচ্'এনা; আর অণ্ডে খন বেনাগাড়িয়াতেকো হেচ্'এনা। অকাটাঃক্' ছটরাইএ লাইএৎ অণ্ডেন হড়কো দারাম-কেৎকো রেয়াং, অনা দো জতগে ঠিক। মেনখান একেন জনসন্ সাহেব দো বাঙ, জতকো তাঁহেকানা। জনসন সাহেব দো চিত্রা-গাড়িয়া সেচ্' পাহিল্ মিশন লাগিৎ জায়গায় বাছাও আনা; আদো অণ্ডে বাঙ জুত্‌লেনতে থোড়া দাখিন মাছা সেচ্' পাপা সাহেবগে জায়গায় গোটাকেৎ আর ১৮৬৭ সাল রেয়াঃক্' ২৬ সেপ্টেম্বর চান্দোরে পাহিল ধাও অণ্ডে সীমা রেয়াঃক্'কো লা'কেৎতে অনা দিন খন দো আবোওয়াঃক' মিশন রেয়াঃক্' এত্হপ্'গে লেখাআকানা।"[২]

অর্থাৎ—

মিশনের পুরানো রিপোর্ট অনুসারে ব্যাপ্টিস্ট্ মিশন জনসন সাহেবের উপর ভার দিয়েছিল সাঁওতালদের মধ্যে কাজ আরম্ভ করার জন্য। সে সময়ে (১৮৬৫-৬৬ সালে) তিনি সিউড়ি থেকে কিছু কিছু কাজ আরম্ভ করেছিলেন। ১৮৬৭ সালে তিনি এবং পাপা সাহেব প্রথমে বেলবুনিতে যান এবং সেখান থেকে বেনাগাড়িয়াতে আসেন। সেখানের লোকদের অভ্যর্থনা সম্বন্ধে ছটরাই যা বলেছেন সমস্তই ঠিক। কিন্তু জনসন সাহেব শুধু একা ছিলেন না, সবাই হাজির ছিলেন। জনসন্ সাহেব প্রথমে চিত্রাগাড়িয়াতে মিশনের জন্য জায়গা

১। 'বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার ফর সান্তাল পরগনাজ', পৃ-৬৮।
২। 'ছটরায় দেশমাঞ্জহি রেয়াঃক্' কাথা', পৃ-২৭।

> পছন্দ করেছিলেন, কিন্তু সেখানে সুবিধা না হওয়ায় কিছু দক্ষিণে পাপা সাহেবই জায়গা ঠিক করেন এবং ১৮৬৭ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর সেখানে সর্বপ্রথম সীমানা নির্ধারিত হওয়ায় সেদিন থেকে মিশন প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলে গণ্য করা হচ্ছে।"

আদালতে মোট ২৫১ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল ১৯১ জন সাঁওতাল এবং বাকী সকলে নিম্নবর্ণের হিন্দু। অধিকাংশেরই সাত বৎসর থেকে চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ড হয়েছিল। তবে, জুগিয়া হাড়াম এ কথা স্বীকার করেননি। তিনি বলেছেন—"সাহেবরা নেতাদের ধরে কিছুসংখ্যককে দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছিল।"[১] বিদ্রোহীরা সেদিন ধরা পড়েও প্রাণভিক্ষা করেনি। মৃত্যুঞ্জয়ী বীর যারা, তারা মৃত্যুকে ভয় করে না। তারই নমুনা পাওয়া যায় 'সম্বাদ ভাস্কর'এর পাতায়—

> "৮ [ফেব্রুয়ারি] দিবসে একজন সন্তালের ফাঁসি দ্বারা প্রাণনাশ হয় লেপ্টেনেন্ট টোলমিন সাহেবের হত্যা ব্যাপারে যে সন্তালেরা লিপ্ত ছিল এ ব্যাক্তিও তাহারদিগের একজন সঙ্গী ; এই সন্তালও ফাঁসি আজ্ঞা শ্রবণে ভীত হয় নাই। ফাসীকাষ্ঠে উঠিবার কালেও তামাকু চাহিয়া খাইয়াছিল।"[২]

এ রকম বহু সাঁওতালই সেদিন ইংরাজরাজের অকল্পনীয় কঠোর নির্যাতন সহ্য করে দেশজননীর বেদীমূলে জীবন উৎসর্গ করেছিল।

১। 'হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃক্' কাথা', পৃ-২৪৩।
২। 'সম্বাদ ভাস্কর', ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬, ১৩২ সংখ্যা।

বাইশ

সাঁওতাল বিদ্রোহের অবসান হল। দরিদ্র, অশিক্ষিত সাঁওতালরা রক্ত দিয়ে লিখে গেল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। পঁচিশ হাজার সাঁওতাল শহীদের এই আত্মত্যাগ ইতিহাসের পাতা থেকে কোনদিন মুছে যাবে না। এ কথা আজ নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, অর্থনৈতিক অধিকার অর্জনের জন্য অন্যায়ের প্রতিবাদ করে সাঁওতাল বিদ্রোহীরা সেদিন যে সংগ্রামী ভূমিকা নিয়েছিল এবং সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষকে সর্বগ্রাসী শোষণ ব্যবস্থার রক্তাক্ত শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য যে প্রতিরোধ তারা গড়ে তুলেছিল, মুক্তিকামী সংগ্রামী মানুষের কাছে তা চিরদিন জ্বলন্ত প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। সরকার ছিল তাদের বিরুদ্ধে, সংবাদপত্রগুলি তাদের বিরুদ্ধে—এতগুলি শক্তির বিরুদ্ধে তারা সংগ্রাম চালিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত আদায় করে নিয়েছিল তাদের জন্য এক স্বতন্ত্র জেলা। ধন্য তাদের সাহস! ধন্য তাদের বীরত্ব! ধন্য তাদের আত্মত্যাগ! বৃটিশ শাসকবর্গকে প্রথম নতি স্বীকার করতে হয়েছিল এই অশিক্ষিত সাঁওতালদের কাছে। তাই সাঁওতাল বিদ্রোহ চিরস্মরণীয়। পলাশী যুদ্ধের পর বৃটিশ শাসক সম্প্রদায় যে সকল খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহের মুখোমুখি হয়েছিল সাঁওতাল বিদ্রোহ তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর ও ব্যাপকতর। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এর গুরুত্বকে কিছুতেই উপেক্ষা করা চলে না। এ সম্পর্কে সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন—

> "চল্লিশ বৎসরব্যাপী ওয়াহাবী বিদ্রোহ ও ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাবিদ্রোহের পরেই সাঁওতাল বিদ্রোহের স্থান। এই বিদ্রোহ সমগ্র ভারতবর্ষের ইংরাজ শাসনের ভিত্তিমূল পর্যন্ত কাঁপাইয়া দিয়াছিল এবং ইহা ছিল ভারতের যুগান্তকারী মহাবিদ্রোহের অগ্রদূতস্বরূপ।"[১]

সত্যি কথা। সাঁওতাল বিদ্রোহীদের অতুলনীয় দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মনের উপর স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা জ্বলন্ত ছবি তুলে ধরেছিল। বাংলা ও বিহারের সংগ্রামী মানুষ তাই ক্ষেপে উঠেছিল অত্যাচারী বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে। দেখা দিয়েছিল ভারত-ব্যাপী বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন। ভবানী সেনের কথায়—

> "উনবিংশ শতকে বাংলায় যে সমস্ত কৃষক সংগ্রাম ঘটেছিল তার মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫) এবং নীল বিদ্রোহ (১৮৬০) বাংলার ইতিহাসের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।"[২]

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও জমিদারী প্রথা প্রথম থেকেই আমাদের জাতীয় অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর পর থেকেই একদিকে যেমন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতা তার শাসনের ভিত শক্ত করেছিল অন্যদিকে তেমন আবার

১। সুপ্রকাশ রায়, 'ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম', পৃঃ-৩৩৯।
২। 'সাহিত্য পত্র', ১৮শ বর্ষ" শরৎ সংকলন, ১৩৭৯, পৃঃ-৩১।

জমিদার মহাজনগোষ্ঠী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের ভাগ্যকে জুড়ে দিয়েছিল। বলতে বাধা নেই যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসন ও জমিদারী-মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে সাঁওতালরা এরকম একটা বিদ্রোহ ঘটাতে পেরেছিল যা অন্য কোন বিদ্রোহের চেয়ে কোন অংশে গৌণ নয়। লর্ড ডালহৌসী সাঁওতাল বিদ্রোহের গুরুত্ব স্বীকার করে তাঁর ডাইরীতে লিখেছিলেন—

> "অযোধ্যা সম্পর্কে কোর্টকে লিখতে গিয়ে আমি জানাই যে, তাঁরা যদি বলেন তবে আমি মার্চ মাসের গোড়া পর্যন্ত থেকে যেতে পারি। আমার নিজেরও তাই ইচ্ছা। কারণ এই সাঁওতাল বিদ্রোহ এখনও দমন হয়নি। আমিই করি বা ক্যানিংই করুন এটা এখনই করতে হবে!"

বিদ্রোহের রূপ দেখে তাঁর বুঝতে দেরী হয়নি যে, তাড়াতাড়ি ভারতবর্ষে একটা ঝড় উঠবে এবং এ ঝড় উঠলে বৃটিশ শাসকদের সমূহ বিপদ। অবিলম্বে এ দেশ থেকে তাদের পাততাড়ি গুটাতে হবে। অথচ, একটু আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, কোন পরিকল্পিতভাবে এ বিদ্রোহ ঘটেনি, বাইরের কেউ এ পরিচালনা করতেও আসেনি। বহুদিনের অসহনীয় অত্যাচার-উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে সাঁওতালরা ইংরাজরাজের সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও শোষণব্যবস্থাকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য এগিয়ে এসেছিল। অত্যাচার, উৎপীড়ন ও শোষণ থেকে মুক্তি—এটাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। এ কথা সত্য যে ইংরাজরা এদেশে আধিপত্য বিস্তারের পর থেকেই দেশীয় রাজা-মহারাজারা এই বিদেশী রাজশক্তির কাছে মাথা নত করেছিল, একমাত্র বিদ্রোহী সাধারণ মানুষই এই বিদেশীদের বাধা দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে বারবার রুখে দাঁড়িয়েছে তারা। বিদেশী শাসকগোষ্ঠী শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের এই জাগ্রত সংগ্রামশক্তি বহু চেষ্টা করেও ধ্বংস করতে পারেনি। সাঁওতাল-বিদ্রোহ কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষেরই বিদ্রোহ। ইংরাজরাজের অমানুষিক শোষণ-অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সাঁওতালরা প্রায়ই চিৎকার করে বলত—"ঈশ্বর মহান, কিন্তু তিনি থাকেন বহু-বহুদূরে। আমাদের রক্ষা করবার কেউই নেই!"[১]

অবশেষে সত্যিই একদিন অসন্তোষের আগুন জ্বলে উঠল সমগ্র সাঁওতাল প্রদেশে। হাজার হাজার সাঁওতাল বিদ্রোহীর প্রচণ্ড আঘাতে ভারতে ইংরাজ শাসনের বনিয়াদ চুরমার হ'বার উপক্রম হল। শত শত জমি ও গৃহহারা কৃষক, শ্রমিক ও কারিগর এই ব্যাপক বিস্ফোরণকে গ্রহণ করল তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ও শ্রেণীর দুঃখ-যন্ত্রণার অবসান ঘটাবার উপায় হিসাবে। সাঁওতাল বিদ্রোহের এই বৈপ্লবিক রূপ দেখে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে শাসকগোষ্ঠীর মুখপাত্র 'ক্যালকাটা রিভিউ' সেদিন চিৎকার করে লিখেছিল—

১। ডব্লু. ডব্লু. হাণ্টার, 'দি অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল,' পৃ-২৩০।

"এই রক্ত-পিপাসু জংলী মানুষগুলি যারা শিশু কিংবা নারীর সম্মান দেয় না, তাদের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা ছাড়া এ বিদ্রোহ দমনের অন্য কোন উপায় আমরা আশা করতে পারি না। এর পুনরাবৃত্তি যেন আর না ঘটে, এজন্য অত্যাচারের বদলা নিয়ে সমতলভূমির কৃষকদের রক্ষা করা প্রয়োজন। সাঁওতালরা মনে করে যে, কোনরকম প্রতিফল না পেয়েই তারা এক মাস বেপরোয়া খুনখারাপি ও লুটপাট চালাতে পারে। এ ধরনের মনোভাব দূর করা কিংবা মুছে ফেলা একান্তই প্রয়োজন, যদি সরকার এ সব জেলায় বন্দুকের সঙ্গীন উঁচিয়ে শাসন না চালায়। ভবিষ্যতের দাঙ্গাবাজদের সুযোগ সন্ধানের কোন অবকাশ না দিয়ে এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই পূর্ণ প্রতিশোধ নিতে হবে; আঘাত হানতে হবে যেন কেউ জানতে কিংবা বুঝতে অসমর্থ হয় এবং ভয়ঙ্কর হবে, যেন জনগণের জীবন ও সুখ হাল্কা না হয়ে ওঠে। কেবল বিদ্রোহের দু-একজন প্রধান নায়ককেই নয়, উপদ্রুত জেলাগুলির সমস্ত লোককেই আমরা পেগু অঞ্চলে নির্বাসিত করব। যেরূপ উপেক্ষাপূর্ণ ধৈর্যের সঙ্গে ইংলন্ডের এক মন্ত্রিসভা 'চার্টিস্ট দল'কে ক্ষমা করেছিল কিংবা আইরিশ স্বদেশপ্রেমিকদের ছোট দলটিকে নির্বাসিত করেছিল সেরূপভাবে মোকাবিলা ভারতে করা যাবে না। ১৮৩৮ সালে কানাডায় যা করা হয়েছিল, ঠিক সেইভাবে সাঁওতালদের শাস্তিবিধানের দায়িত্বও অর্পণ করতে হবে একটি বিশেষ কমিশনের হাতে অথবা এ ব্যবস্থা খুব বাড়াবাড়ি মনে হলে লুটের যে অংশ লুণ্ঠনকারীরা নিজেদের কাছে রেখে দিয়েছে, তার সমপরিমাণ অর্থ গ্রামগুলি থেকে জরিমানাস্বরূপ আদায় করে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করা হোক। এই জাতির শাস্তিবিধানের জন্য এবং বৃটিশ মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য সাঁওতালদের পাইকারীহারে শাস্তি দিতে হবে।"[১]

'ক্যালকাটা রিভিউ'র এই মন্তব্য শুনে মনে হয়, সত্যিই সেদিন বৃটিশরাজের মর্যাদা অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। যাদের হাতে ভারতবর্ষের নবাব-বাদশা পরাজিত, তাদের শক্তি কিনা সামান্য অশিক্ষিত সাঁওতালদের আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম। সমস্ত সাঁওতাল এলাকা থেকে ইংরাজ শাসন প্রায় লুপ্ত। মেজর ভিনসেন্ট জারভিসের বর্ণনায়—

"আমরা দু'দিন এক রাত্রি হেঁটে চলেছি, সারা রাস্তায় অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, আমার লোকদেরও ঠিকমতো খাওয়া জোটেনি। সিউড়ির কাছে আসতে দেখি, প্রত্যেক গ্রামে একটা আতঙ্ক। বেশ কিছু সংখ্যক হিন্দু রাস্তার ধারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে সাশ্রুনয়নে আমাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল এবং আমার শ্রান্ত-ক্লান্ত সিপাইদের হাতে খই-মুড়ি ও মিষ্টান্ন গুঁজে দিচ্ছিল। সিউড়িতে গিয়ে দেখি অবস্থা আরও

১। 'ক্যালকাটা রিভিউ', ১৮৫৬, পৃ-২৫৯-৬০।

> খারাপ। একজন অফিসার দিনরাত তাঁর ঘোড়ায় জিন চড়িয়ে প্রস্তুত হয়ে আছেন ; জেলখানাটাকে মনে হল, তাড়াতাড়ি যতটা পারা যায় সুরক্ষিত করা হয়েছে ; আর শুনলাম, অবশ্য কতটা সত্য জানি না, যে জেলখানার সব টাকাকড়ি নাকি একটা কুয়ার মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।"[১]

অবশ্য বলা যেতে পারে যে, সাঁওতাল বিদ্রোহ, শাসক শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে আকস্মিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং এত দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল যে শাসকগোষ্ঠী প্রথমে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। তাই, তাদের পক্ষে কোনরকম বাধা দেওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু কোনরকম প্রস্তুতি না থাকা সত্ত্বেও এ বিদ্রোহ সেদিন অল্প সময়ের মধ্যে যেরূপ সংঘবন্ধ ও সংগঠিত রূপ নিয়ে বিস্তারলাভ করেছিল তা আমাদের কাছে অকল্পনীয়। পরবর্তীকালে তা সংগ্রামী মানুষকে নিজস্ব সংগঠন সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছিল ও সংগ্রামী মানুষের সংগ্রাম-শক্তিকে শতগুণ বর্ধিত করেছিল।

পিয়ালাপুরের যুদ্ধে জয়লাভের পর সাঁওতাল বিদ্রোহীরা নতুন করে পেয়েছিল তাদের শক্তির স্বাদ। তারা বুঝেছিল, শাসকগোষ্ঠী কখনও তাদের এই জয় স্বীকার করে নেবে না। তাদের জয়কে তাদেরই শক্তির জোরে রক্ষা করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে মুখোমুখি লড়তে হলে তীর-ধনুকের উপর নির্ভর করলে চলে না, আগ্নেয়াস্ত্রও দরকার। কোথা থেকে আসবে এ অস্ত্র ? এ অস্ত্র না হলে বিদেশীরাজের সৈন্যবাহিনীর উপর শক্ত আঘাত হানা যাবে না। কিন্তু অসুবিধায় পড়েনি তারা। 'সম্বাদ ভাস্কর'-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পাওয়া যায়—

> "বিদ্রোহী প্রদেশের যাবতীয় কামারেরা দিনরাত্রি বন্দুক নির্ম্মাণ করিতেছে ; বোধহয় সন্তালেরাই তাহা প্রস্তুত করাইতেছে। তীর, ধনুক, টাঙ্গী লইয়া সিপাহীদিগের সহিত সম্মুখ সংগ্রাম করিতে পারগ হয় না, এজন্য সন্তালেরা বন্দুকের আয়োজন করিতেছে।"[২]

গ্রামের সাধারণ মানুষই তাদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছিল। বিদেশী শাসন ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের এই ঐক্যবন্ধ সংগ্রাম সেদিন বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে আরও দৃঢ় ও ব্যাপক করে তুলেছিল। বাংলার দিকে দিকে দেখা দিয়েছিল নানা ধরনের কৃষক বিদ্রোহ। ভারতের দুর্ভাগ্য যে, সেদিন কৃষক-সম্প্রদায়ের সংগ্রামী শক্তিকে নেতৃত্ব দেবার কেউ ছিল না, কৃষকশক্তি নেতৃত্ব-বিহীন হয়ে সংগ্রাম করতে বাধ্য হয়েছিল।

ইংরাজ লেখকদের হিসাবে দেখতে পাওয়া যায়, সাঁওতাল বিদ্রোহে শতকরা ৫০ জন নিহত হয়েছিল অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার বিদ্রোহী সাঁওতালের মধ্যে প্রায়

১। ডব্লু ডব্লু হান্টার, 'দি অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল', পৃ-২৪৩।
২। 'সম্বাদ ভাস্কর,' ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬, ১৩২ সংখ্যা।

পঁচিশ হাজার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল। সাঁওতালদের কাছে এ ছিল আপসহীন সংগ্রাম। তারা নির্ভয়ে, নিঃশঙ্কচিত্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিল, কিন্তু শত্রুর কাছে মাথা নত করেনি, কিংবা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে শ্বেত-পতাকা তুলে ধরেনি। মেজর জারভিসের উক্তিতে পাওয়া যায়ঃ

> "আত্মসমর্পণ কাকে বলে তা ছিল তাদের কাছে অজ্ঞাত। যতক্ষণ তাদের যুদ্ধের নাগড়া বাজত, ততক্ষণ তারা দাঁড়িয়ে থেকে যুদ্ধ করত এবং গুলির আঘাতে প্রাণ দিত। তাদের নাগড়ার শব্দ বন্ধ হলেই তারা সিকি মাইল দূরে সরে গিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করত এবং আমরা তাদের নিকটবর্তী হয়ে গুলিবর্ষণ করতাম"[১]

এখানে একটা কথা উল্লেখ না করে থাকতে পারা যায় না, সেটি হল, সাঁওতালরা তীর-ধনুক, টাঙ্গি-তরোয়াল নিয়ে যেমন নির্ভয়ে শত্রুসৈন্যের সামনা-সামনি হয়েছিল তেমনি আবার তারা গেরিলা পদ্ধতিতে লড়াই করে শত্রুপক্ষকে অস্থির করে তুলেছিল। তাদের তীরের আঘাতে বহু সৈন্য নিহত হয়েছিল, কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় যে তারা কখনও বিষ মাখানো তীর ব্যবহার করেনি। এক ইংরাজ সেনানায়ক এ কথা স্বীকার করে স্পষ্টভাবে বলেছেন—

> "এই যুদ্ধে আদিবাসীরা একটা যে দারুণ বীরোচিত আচরণ দেখিয়েছিল, তা স্মরণ রাখার যোগ্য। যদিও জাতিগতভাবে সমস্ত গাছ গাছড়ার বিষ সম্বন্ধে তাদের আশ্চর্যরকম একটা সহজাত জ্ঞান আছে, এবং সে সব গাছ-গাছড়াও তাদের জঙ্গলে প্রচুর। এবং তারা শিকার ও হত্যার উদ্দেশ্যে তাদের তীরের ফলা সেই-সব প্রস্তুত বিষের রসে ভিজিয়ে নেয় এবং সে-বিষ এতই ভয়ানক যে একটা পূর্ণ বয়স্ক বাঘের গা যদি সেই বিষ লাগানো তীর লেগে সামান্য ছড়েও যায় তবু আধঘন্টার মধ্যে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তবু, এসব সত্ত্বেও তারা আমাদের সৈন্যদলের সঙ্গে যুদ্ধে এমন একটা সুযোগ নেওয়া অবজ্ঞাভরে পরিহার করেছিল। যদিও আমাদের অনেক সৈনিক ও অফিসার তীরবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছিল, কিন্তু বিষাক্ত তীরে আহত একটি দৃষ্টান্তও আমার চোখে পড়েনি।"[২]

সত্যি, আশ্চর্য হবারই কথা। প্রশংসা না করে থাকা যায় না, অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়নের জ্বালায় ক্ষিপ্ত হয়েও অশিক্ষিত সাঁওতালরা সেদিন অমানুষের কাজ করেনি, বরং গর্বের সঙ্গে বলা চলে যে, তারাই প্রথম কৃষককে জমির ওপর তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে জমিদার ও মহাজনগোষ্ঠী সাঁওতালদের জমিজমা ও বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করে

১। ডব্লু. ডব্লু. হান্টার, 'দি অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল', পৃ-২৪৮।

২। ই. জি. ম্যান, 'সন্থালিয়া এন্ড সন্থালস,' পৃ-১২০-২১।

সমগ্র কৃষক সমাজের সর্বনাশ সাধনের যে আয়োজন করেছিল, জমিদারী শোষণ-উৎপীড়নের ইতিহাসে তা অভিনব। অশিক্ষিত হলেও শাসকগোষ্ঠীর সামন্ত-তান্ত্রিক শাসন ও শোষণ তাদের চোখে ধরা পড়েছিল। সাঁওতালরা এজন্যই জমিদার ও মহাজনগোষ্ঠীর উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল।

> "মাঝে মাঝে প্রায়ই ধর্মীয় ও জমিসংক্রান্ত উত্তেজনা এক নগ্ন বর্বরতার আকার ধারণ করত। ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ এইরূপ এক পরিণতি থেকেই রূপলাভ করেছিল—এর উদ্ভব হয়েছিল বাঙালী ও বিহারী ভূম্যধিকারীদের শোষণ প্রতিরোধে অক্ষম একশ্রেণীর আদিম কৃষি জীবীদের আক্রোশ থেকে। প্রায় ৩০০০০ সাঁওতাল দেশের এক বিরাট অঞ্চলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঙালীদের ছারখার করেছিল, তাদের মেয়েদের আহত করেছিল এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ওপরও অত্যাচার করেছিল।"[১]

অত্যাচারের বাধা না দিলে অত্যাচারীর সাহস বেড়ে যায়। এই সত্যকে সাঁওতাল ও সেই সঙ্গে সমগ্র কৃষক সমাজের সামনে প্রথমে তুলে ধরেছিল সিদু-কানহু। যারা মানুষের মুখে অন্ন দেয় না, বরং তাদের নানাভাবে শোষণ করে, এরকম শত্রুকে ধ্বংস করাই শ্রেয়। এজন্য বিপদ আসে তো আসুক, ভয় করলে চলবে না। অবশ্য, প্রতিকারের জন্য সাঁওতালরা প্রথমে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেছিল। হাণ্টার সাহেবের কথায়ঃ

> "১৮৫৫ সালের জুন মাসে, দক্ষিণাঞ্চলের ৩০০০ সংখ্যক সাঁওতালদের একটি দল তাদের তীরধনুক নিয়ে ১৪০ মাইল হেঁটে কলকাতা যাত্রা করেছিল, তাদের অবস্থার কথা গভর্ণর জেনারেলের কাছে নিবেদন করার জন্য। প্রথম দিকে তারা সুশৃংখলভাবেই চলেছিল; কিন্তু পথের দূরত্বটা অনেক, তাদের বাঁচার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। লুটতরাজ হতে লাগল, পুলিসের সঙ্গে তাদের বিবাদ বেধে গেল, এবং সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই তারা সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করল।"[২]

ক্রুদ্ধ আক্রোশে সাঁওতালরা গ্রামের পর গ্রাম লুট করে ইংরাজ শাসনকে ওলট-পালট করে দিয়েছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহের মাদল-ধ্বনিতে বাঙ্গলা-বিহারের সংগ্রামী কৃষকও আওয়াজ তুলেছিল 'লাঙ্গল যার জমি তার'।

> "১৮৫৫-৫৭-র সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৫৭-৫৮-র সিপাহী বিদ্রোহ এবং স্থানে স্থানে ভারতীয়দের বীরত্ব কাহিনী রায়তদের মনে শক্তিদান করেছে।"[৩]

১। স্যার এইচ. ভি. লভেট, 'দি ক্যাম্ব্রিজ্ হিস্টরি অফ ইণ্ডিয়া', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৩৫।
২। ডব্লু-ডব্লু-হাণ্টার, 'দি ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার', পৃ-৯৮।
৩। কালীচরণ ঘোষ, 'জাগরণ ও বিস্ফোরণ', পৃ ৫২।

পরবর্তীকালে বিদ্রোহী কৃষকের আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে জমির উপর কৃষকের দখলীস্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

নিরীহ সাঁওতালরা এত নিষ্ঠুর হল কেমন করে? তীর-ধনুক, টাঙ্গি-তরোয়াল নিয়ে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এমনভাবে রুখে দাঁড়াল কেন? জবাবে 'সংবাদ প্রভাকর'-এর কথাই উল্লেখ করতে হয়; সেখানে লেখা আছে ঃ

> "সাঁওতাল জাতিরা যদ্যপি অত্যাচারী সাহেবদিগের অত্যাচারের প্রতিফল দিয়া ক্ষান্ত হইত তবে ক্ষতি ছিল না। কারণ যাহারা বল-পূর্ব্বক স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ করে, তাহারদিগের প্রাণবধ করিলেও ক্রোধানল শীতল হয় না।"[১]

অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়নে জর্জরিত সাঁওতালদের মনে প্রতিহিংসার যে আগুন জ্বলছিল, তা সহজে নিভে যাবার নয়। ইতিহাসের অমোঘ বিধানে এ আগুন জ্বলে উঠে সেদিন প্রচণ্ড দাবানল সৃষ্টি করেছিল। আদিম প্রকৃতি রুদ্ধ আক্রোশে অত্যাচারীর সমস্ত অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করে দিয়েছিল। রক্তের নেশায় মানব প্রকৃতির এ হল চিরন্তন প্রকাশ। এখানে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার নেই, দয়া-মায়া-মমতার স্থান নেই। প্রতিহিংসায় উন্মত্ত সাঁওতালদের মন থেকে সেদিন ক্ষমার বাষ্প উবে গিয়েছিল। নারী-শিশু কাউকেই বাদ দেয়নি তারা। 'সংবাদ প্রভাকরে' এ কথা প্রকাশিত হয়েছিল ঃ

> "দুরাচারীরা স্ত্রীলোকদিগের আভরণ ও পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত লইয়া গিয়াছে, জননীর ক্রোড় হইতে শিশুসন্তানকে গ্রহণ করিয়া তাহার সম্মুখেই বিনষ্ট করিয়াছে।"[২]

এমন কি সাঁওতাল মেয়েদেরও নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়েছিল ডাকিনী সন্দেহে। এতে অবাক হবার কিছু নেই। মনের মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন যখন দাউ দাউ করে জ্বলে তখন সে আগুন আত্ম-পর চেনে না।

সাঁওতাল বিদ্রোহের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, এই সাঁওতালরাই সর্বপ্রথম নিজেদের এলাকায় সর্বস্তরের মেহনতী মানুষের ঐক্য গড়ে তুলেছিল এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বিতাড়িত করে এদেশে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিল। শুধু স্বপ্নই নয়, ইংরাজ সরকারের সার্মাগ্রক ক্ষমতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়েছিল। গরীব চাষী, ক্ষেত-মজুর, জমিহারা কৃষক এবং সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষই ছিল তাদের মূলশক্তি। শক্তিশালী বৃটিশরাজের তুলনায় তাদের শক্তি অতি সামান্য। শোষিত মানুষের অধিকারের সংগ্রামের সমস্ত বৈশিষ্ট্য তখনও এ সংগ্রামের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিকাশলাভ করেনি; কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা চলে, সাঁওতালদের এ সংগ্রাম ভারতের শোষিত মানুষের বিপ্লবের আহ্বান জানিয়ে গেছে। এখান থেকেই শোষিত মানুষের বিপ্লবের আরম্ভ—

১। 'সংবাদ প্রভাকর', ৫৩০০ সংখ্যা।
২। 'সংবাদ প্রভাকর', ৫৩০০ সংখ্যা।

তার প্রথম পদক্ষেপ। অবশ্য এটা সত্য যে, ঊনবিংশ শতাব্দী ধরেই বিভিন্ন নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। সাধারণ মানুষ ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে দৃপ্ত প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

> "এটা সন্দেহাতীত যে এই বিদ্রোহ শুধু হাওয়ার ওপর ভর করে ছিল না, ভারত ইতিহাসের বিবিধ ঘটনাক্লিষ্ট অধ্যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রতিটি মানুষের শিরায় শিরায় রক্তের মধ্যে এটা সঞ্চারিত হয়ে গেছল। সুতরাং এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রথমে কে জ্বালিয়েছিল, আদিবাসী না অ-আদিবাসী শ্রেণী তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা নিরর্থক। এটা নিশ্চিত বলা যায় যে ১৮৫৭ সালের জাতীয় অভ্যুত্থানের নেতারা ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের কাছে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং তার পরবর্তী পর্বে যে-সব ঘটনার উদ্ভব হতে পারে তার গুরুত্ব অনুমান করতেও প্রচুর সাহায্য পেয়েছিলেন।"[১]

তবে, এ কথা বলতে কোন বাধা নেই যে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৩০ জুন ভারতের ইতিহাসে এক বিশেষ স্মরণীয় দিন। কারণ, এই দিনই ব্রিটিশ শাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দশ হাজার সাঁওতাল গর্জে উঠেছিল। তারা সবাই একবাক্যে শপথ নিয়েছিল যে ব্রিটিশ শাসকদের আর তাদের চিরসঙ্গী জমিদার-মহাজন-পুলিস-পেয়াদাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে এবং স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শ্রীউমাশঙ্কর লিখেছেন—

> "ভারতীয় ইতিহাসে মেঁ ৮ আগস্ট ১৯৪২ কা জো মহত্ব হেঁ, ওহী মহত্ব ৩০ জুন ১৮৫৫ কা হ্যায়। ৮ আগস্ট ১৯৪২ কো প্রসিদ্ধ 'ভারত ছোড়ো' প্রস্তাব স্বীকৃত হুয়া থা। ঠিক উসী প্রকার বিহার রাজকে সন্তাল পরগনা জিলেকে অন্তর্গত্ রাজমহল ক্ষেত্রকে ভাগনাডি গাঁওমে ৩০ জুন ১৮৫৫ কো দশ হাজার সন্তালোকে বিচ্ সন্তাল নেতা সিদোনে এক প্রস্তাব দ্বারা য়েহ্ ঘোষিত্ কিয়া থা কি অংরেজ উন্‌কি ভূমি কো ছোড়্‌দে।"[২]

সম্পূর্ণ সচেতন না হলেও এটা ছিল সেদিন ঔপনিবেশিকতার মূল ভিত্তির উপর প্রচণ্ডতম আঘাত। ইংরাজ সরকার এটা খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিল। সাঁওতাল কৃষকের ক্রোধানল থেকে ইংরাজ শাসনকে রক্ষা করা ইংরাজশক্তির পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল, এই ভয়ঙ্কর অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সুচতুর ও দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন বৈদেশিক শাসকগোষ্ঠীর কিছুমাত্র বিলম্ব হয়নি। তাই বিদ্রোহের পরবর্তীকালে ইংরাজ সরকার তাদের অন্যান্য জাতির সংস্পর্শ থেকে দূরে রেখেছিল।

১। ডি. রাঘবাইয়া, 'ট্রাইবাল রিভোল্টস', পৃ-২৫-২৬।
২। এ. বি. বর্ধন, দি আনসলভড্ ট্রাইবাল প্রবলেম', পৃ-৪-৫।

"বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আদিম অধিবাসীদের ও তারা যেসব অঞ্চলে বসবাস করত, সেগুলিকে ভারতের অন্যান্য অধিবাসীদের থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিচ্ছিন্ন রেখেছিল, কারণ তারা আদিবাসীদের বিপ্লবাত্মক চরিত্র সম্বন্ধে সচেতন ছিল এবং তারা চাইত না যে তারা জাতীয় আন্দোলনে অংশীভূত হয়ে পড়ুক।"[১]

সাঁওতাল বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলেও এর প্রভাব বহুদিন পর্যন্ত ভারতের বিশেষতঃ বাংলার জনগণকে বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রেরণা দিয়েছিল। কামান-বন্দুকের গুলিতে সাঁওতালদের গণসংগ্রাম স্তব্ধ হলেও পরবর্তীকালে ভারতের কোটি কোট মানুষ লাভ করেছিল দেশব্যাপী আপসহীন স্বাধীনতা সংগ্রামের জ্বলন্ত প্রেরণা। ফলে, শতগুণ শক্তিশালী হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম। ভি. রাঘভাইয়ার ভাষায়ঃ

"এটা ভুললে চলবে না যে ১৮৫৭ সালের মহান ভারতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম যাকে বিদ্রোহ দুর্নামে অভিহিত করা হয় সেটা সাঁওতাল বিদ্রোহের সমসময়ে ভ্রূণাবস্থায় ছিল এবং এটা থেকে তারা শুধু যে অমূল্য অনুপ্রেরণা পেয়েছিল তাই নয়, সাঁওতাল নায়কদের ভুলের ফসল থেকে মূল্যবান শিক্ষাও লাভ করেছিল, যদিও স্বাধীনতার এই বিরাট আন্দোলনের পরিণাম সাঁওতালদের পরিণামেরই অনুরূপ হয়েছিল। উভয় সংগ্রামেরই বিপক্ষ ছিল একই শত্রু। দুটোই ছিল অসম শক্তির মধ্যে সংগ্রাম। উভয়ের মধ্যেই ছিল বহু বিশ্বাসঘাতক ও দলত্যাগী এবং উভয়েরই প্রথম সারির নেতাদের জীবন আহুতি দিতে হয়েছিল ফাঁসীর মঞ্চে। উভয়ের মধ্যেই দেশাত্মবোধের অগ্নিশিখা বিশুদ্ধতার দীপ্তিতে, দেশপ্রেমে, আত্মত্যাগে এবং অতুলনীয় নিষ্ঠায় হয়েছিল সমুজ্জ্বল।"[২]

সুপ্রকাশ রায় মহাশয়ও তা স্বীকার করে লিখেছেনঃ

"সাঁওতাল উপজাতির এই স্বাধীনতার যুদ্ধ যে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণকে এবং দুই বৎসর পরের মহাবিদ্রোহে (১৮৫৭) স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণা যোগাইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বর্তমানকালে 'অসভ্য ও বন্য' বলিয়া পরিচিত যে উপজাতি একশত বৎসরের অধিককাল পূর্বে সমগ্র ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা সংগ্রামের শিক্ষা ও প্রেরণা দান করিয়াছিল, তাহাদের অতীত ইতিহাস ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাহিনী আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের মূল্যবান উপাদান।"[৩]

১। 'বিহার সমাচার', স্বাধীনতা অঙ্ক, ১৯৭০, পৃ-৪২।

২। ভি রাঘবাইয়া, 'ট্রাইবাল রিভোল্টস', পৃ-১৫৬।

৩। সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম', পৃ-৩১১।

সাঁওতাল বিদ্রোহের সঠিক মূল্যায়নের কাজ আজও বাকি আছে। স্বাধীন ভারতে এটি না করলে গণ-আন্দোলনের ইতিহাসে এক বিরাট ফাঁক থেকে যায়। অবশ্য এটা সত্য যে, সাঁওতাল বিদ্রোহের যতটুকু পরিচয় আমরা পাই তা বিশেষভাবে বৃটিশ সরকারের দপ্তরখানার জন্যই তৈরি হয়েছিল; তার মধ্যে এই বিরাট গণ-সংগ্রামের আসল ছবি পাওয়া যায় না। আক্ষেপের সঙ্গে তাই বলতে হয় যে সাঁওতাল বিদ্রোহের সঠিক মূল্যায়ন করা বড় কঠিন। যাই হোক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে আদিবাসী ঐতিহ্য ও সংগ্রামী চরিত্রকে স্বচ্ছ উদার দৃষ্টিভঙ্গীতে তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকরা দেখেন নি। তাই আমরা দেখতে পাই যে এরকম একটা ব্যাপক ও জঙ্গী সাঁওতাল বিদ্রোহকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করে গেছে বিদেশী শাসকেরা এবং তা করেছে তাদের সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থেই। এ ছাড়া, বিবরণ দাতাদের অনেকেই উপদ্রুত অঞ্চলের ম্যাজিস্ট্রেট্ বা কালেক্টররূপে প্রশাসন যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকায় তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও মানমর্যাদার প্রশ্নও ঘটনাগুলির সঙ্গে জড়িত ছিল। সুতরাং তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থ অনুযায়ী কোন ঘটনাকে বিকৃতভাবে পরিবেষণ কিংবা ঘটনার গুরুত্ব হ্রাসের চেষ্টা যে করবেন, এ স্বাভাবিক। আনন্দের কথা, ইদানীং মার্ক্সীয় মতাবলম্বী আধুনিক ঐতিহাসিকরা এ বিদ্রোহের মধ্যে ইংরাজ উপনিবেশকতার বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধের প্রথম প্রয়াস লক্ষ্য করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম ভাগে যে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তারও পরিচয় পেয়েছেন।

সাধারণভাবে অনুসন্ধান করলেই দেখতে পাওয়া যায় যে স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য স্থাপন ও মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই ছিল সাঁওতাল বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য। এ ব্যাপারে আপসহীন সংগ্রামের আদর্শই সাঁওতালরা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছিল। ইংরাজ আমলে, জমিদার মহাজনরাই ছিল ইংরাজরাজের রক্ষাস্তম্ভ। তাদের আড়ালে থেকেই শাসকগোষ্ঠী ভারতের কৃষক সমাজকে শাসন ও শোষণ করত। বিদ্রোহী কৃষকের আঘাত জমিদার ও মহাজনদের উপর পড়লেই শাসকগোষ্ঠী তাদের সামরিক শক্তি নিয়ে উপস্থিত হত সংগ্রামী কৃষকের শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে। সাঁওতাল বিদ্রোহে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। জমিদার-মহাজনদের অমানুষিক অত্যাচার-উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে সাঁওতালরা বিদ্রোহ করেছিল। এক কথায়—সেদিন আরম্ভ হয়েছিল ভারতের কৃষি-বিপ্লবের প্রথম সশস্ত্র সংগ্রাম। তাই, ইংরাজরাজ সাঁওতালদের পিষে মারবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সাঁওতাল বিদ্রোহের ঘটনাবলী বিচার বিশ্লেষণ করে লিখেছেন ঃ

> "১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ, আদিবাসীদের মৌলিক আবেগপ্রবণতার একটি উগ্রতম রূপ ও বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে আছে। কিন্তু এটা প্রথমতঃ, বোধহয় প্রধানতঃ ঘটেছিল অর্থনৈতিক কারণে এবং শুরুতে বৃটিশ বিরোধী মনোভাব ছিল না। সাঁওতালদের আসল আক্রোশ ছিল সেইসব

বাঙালী ও উত্তর ভারতের 'সভ্য লোকদের' ওপর যারা ঐ অঞ্চলে ছেয়ে গেছল এবং তাদের সরলতা ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে নির্মমভাবে শোষণ করত। কিন্তু তারা যখন দেখল যে সরকারী কর্মচারীরা তাদের অভিযোগের কোনও প্রতিকার না ক'রে তাদের উৎপীড়কদেরই তাদের ক্রুদ্ধ বিক্ষোভ থেকে রক্ষা করার জন্য উৎসুক, তখন তারা সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল।"[1]

বলতে বাধা নেই যে, বিদ্রোহের সময় সাঁওতালরা কুখ্যাত মহাজন, জমিদার, নায়েব, গোমস্তা ও দুর্নীতিপরায়ণ দারোগাদের নির্দয়ভাবে হত্যা করেছিল। বড় নির্মম এ ইতিহাস। কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে শত শত সাঁওতাল পরিবারকে যারা সর্বস্বান্ত করেছে, তাদের সুখ-শান্তি, আনন্দ কেড়ে নিয়েছে, এমন কি সামান্য কয়েকটি টাকার জন্য এক একটি পরিবারকে পুরুষানুক্রমে গোলামের মত জীবন যাপন করতে বাধ্য করেছে, স্বভাবতই তাদের প্রতি ঘৃণা ও ক্রোধ ঐ সব অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত মানুষের থাকতে পারে। উত্তেজনার মুহূর্তে তার উগ্র বহিঃপ্রকাশও ঘটতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ভোলা যায় না যে, বিদ্রোহ করার অভিযোগে হাজার হাজার নিরপরাধ সাঁওতালকে হত্যা করা হয়েছে, বিদ্রোহ দমনের নামে ইংরাজ সরকার সিউড়ীর মাঠে শত শত বিদ্রোহীকে ফাঁসি দিয়েছে। সাঁওতাল বিদ্রোহীদের থেকে সরকারপক্ষ শত গুণ বেশী নৃশংস হয়েছে। মেজর জারভিস্ স্পষ্টই স্বীকার করে গেছেন যে, ইংরাজ কর্তৃপক্ষ যা করেছে তা যুদ্ধ নয়—গণহত্যা। এই গণহত্যার মাধ্যমেই ইংরাজ সরকার হাজার হাজার মানুষের এক ন্যায্য দাবিকে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। লর্ড ডলহৌসীর ভারত শাসনের এ এক কলঙ্কিত অধ্যায়।

সাঁওতাল বিদ্রোহের সংগ্রামী চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা যায় যে, এ বিদ্রোহ শুধুমাত্র সাঁওতালদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বাঙলা-বিহারের নির্যাতিত নিপীড়িত সাধারণ মানুষও সাঁওতাল বিদ্রোহীদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল। এর কারণ অনুসন্ধান করলে পাওয়া যায়, ইংরাজরাজের শোষণ-যন্ত্রের মধ্যে জমিদারদের স্থান ছিল সকলের উপরে। তাদের নীচে ছিল বহু-সংখ্যক ছোট বড় তালুকদার, জোতদার, গাঁতিদার, ইজারাদার প্রভৃতি। তারা কৃষককে চুক্তির জালে আবদ্ধ করে শোষণ করত। এ ছাড়া আর এক শ্রেণীর শোষক সেদিন সৃষ্টি হয়েছিল। তারা হল মহাজন—কৃষকের মহাশত্রু। তাদের শোষণের পথ ছিল বড় নির্মম, বড় ভয়ঙ্কর। কৃষকের সঙ্গে সরাসরি যোগ ছিল তাদের। সরল কৃষকেরা খাজনাব টাকা সংগ্রহের জন্য এই মহাজনশ্রেণীর কাছে জমি ও বাস্তুভিটা বন্ধক রেখে অতিরিক্ত সুদে ঋণ নিত। বলা বাহুল্য, সে জমি ও বাস্তুভিটা কোনদিনই উদ্ধার করতে পারত না নিরীহ কৃষক। সাঁওতালরাই

১। আর. সি. মজুমদার, 'ব্রিটিশ প্যারামাউন্টসি এণ্ড ইণ্ডিয়ান রেনাসে', ১ম খণ্ড, পৃ-৪৫৭।

সর্বপ্রথম এই মহাশত্রুর দিকে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং বিদ্রোহের প্রাথমিক পর্যায়ে এই মহাজনগোষ্ঠীর উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল। সিদু সেদিন স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছিল—

> "মহাজনরাই সব বিশ্বাসঘাতকতা, দুর্নীতি এবং নানারূপ অন্যায় আচরণ করেছে।"[১]

সিদুর এ কথা শুধু সাঁওালদেরই চোখ খুলে দেয়নি, কিন্তু সমস্ত গরীব কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষেরও চোখ খুলে দিয়েছিল। তাই তারা সাঁওতালদের এ সংগ্রামকে একান্ত নিজের বলে মনে করেছিল এবং দ্বিধাহীন-ভাবে সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এই সংগ্রামই ইংরাজ বিরোধী সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল।

এবার আসল প্রশ্ন—স্বাধীনতা-সংগ্রামে সাঁওতাল বিদ্রোহের স্থান কোথায়? এর উত্তরে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের একটি উক্তিই যথেষ্ট। তিনি বলেছেন:

> "১৮৫৭-৫৮ সালে সাহাবাদে যে বিদ্রোহ হয়েছিল, তার সঙ্গে সাঁওতাল বিদ্রোহের বৃটিশবিরোধী মনোভাবের তীব্রতা, সংগঠন ও ভৌগোলিক অঞ্চলের বিষয়ে তুলনা করা যেতে পারে। সুতরাং ১৮৫৭ সালে বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল, তাকে যদি স্বাধীনতার সংগ্রাম বলে মনে করা হয়, তাহলে সাঁওতালরা বা সুরেন্দ্র সাই এবং সম্ভবত আরও অনেকে যে কঠিন সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, তাঁদেরও সেই একইরকম মর্যাদা দিতে অস্বীকার করা যায় না।"[২]

সব চেয়ে শেষে এ কথাই বলতে হয়, সাঁওতাল বিদ্রোহীদের সামনে সেদিন কোন রকম রাজনৈতিক আদর্শ ছিল না, কোন রাজনৈতিক সংগঠনও তাদের ছিল না। কিন্তু তবু তারা এক মৌলিক প্রশ্ন দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছিল। সেটি হল—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, অরণ্যের জীবজন্তুদের সঙ্গে লড়াই করে যে জমি তারা তৈরি করেছে সে জমির প্রকৃত মালিক তারাই। সে জমিতে তারাই ফসল ফলায় এবং সে ফসলের মালিকানাও তাদের। এ দেশ তাদেরই প্রচেষ্টায় ও পরিশ্রমে জনপদে পরিণত হয়েছে। সুতরাং এ দেশের প্রকৃত মালিক তারাই। এ দেশের প্রতিটি সম্পদ ভোগ করার ন্যায্য অধিকার তাদের রয়েছে।

বহু রক্ত, বহু অমূল্য জীবন উৎসর্গ করে ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে, কিন্তু স্বাধীনতার পরিপূর্ণ স্বাদ সাধারণ মানুষ আজও পায়নি। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন না হ'লে এ স্বাদ পাওয়া যায় না। ফলে, দেশের স্বাধীনতা হয়ে পড়েছে অসম্পূর্ণ ও মর্যাদাবিহীন।

১। 'বেঙ্গল জুডিসিয়াল প্রসিডিংস,' নং ১৫৮, ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৬।

২। আর. সি. মজুমদার, 'ব্রিটিশ প্যারামাউন্টসি এণ্ড ইণ্ডিয়ান রেনাসে', ১ম খণ্ড, পৃ-৬২৪।

আমরা যে পথে চলেছি, সে পথের সঙ্গে বৃটিশ নীতির খুব একটা পার্থক্য নেই। স্বাধীনতা অর্জন হয়েছে সত্যি, কিন্তু সে স্বাধীনতা চলে গেছে বৃহৎ ধনতান্ত্রিক গোষ্ঠীর হাতে। ফলে, ভারত অর্থনৈতিক শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। ধনী আরোও ধনী হয়েছে, গরীব আরোও গরীব হয়েছে। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ আজও দেখছে তার ঘর ভেঙ্গে যাচ্ছে, তার সমস্ত আশা-আকাংখা, সমস্ত স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। সুজলা-সুফলা অফুরন্ত সম্পদে ভরা এই বিরাট ভারতবর্ষ পরিণত হয়ে যাচ্ছে দুর্ভিক্ষের দেশে। অনাহার, অর্ধাহার এখন সাধারণ মানুষের জীবনে নিত্য সহচর। দুর্ভিক্ষে অনাহারে মানুষের মৃত্যু হয়—সবাই সেটা জানে। আজ বেঁচে থেকে সেই মৃত্যুর ছায়ামূর্তি দেখছে স্বাধীন ভারতের সাধারণ মানুষ। গ্রামকে গ্রাম মৃত্যুর ছায়ান্ধকারে তলিয়ে গিয়ে ভারত যেন মহাশ্মশান ভূমি! দিনের পর দিন বাড়ছে অর্থনৈতিক সংকট। জনসাধারণকে মৃত্যু পথের যাত্রী করে তোলার এই অবাধ সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে জোতদার, মজুতদার ও চোরাকারবারীরা। শত শত শহীদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করে পরিণাম কি এই? দুঃখ-দুর্দশা-পীড়িত ভারতবাসীর সমস্যাময় আধুনিক জীবনে স্বাধীনতার বিকৃতরূপ ও ক্ষমতার অপব্যবহার দেখে সেই সব শহীদের বিদেহী আত্মা হয়তো দীর্ঘশ্বাস ফেলছে কোন স্বর্গলোক থেকে! স্বাধীন দেশের তপস্যা আজ ব্যর্থ হতে চলেছে। এর চেয়ে দুঃখ আর লজ্জার বিষয় আমাদের আর কি থাকতে পারে?

এখানে একটি কথা না বলে পারছি না। সেদিনের মত আজও বড় বড় সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন শ্রমজীবী মানুষের বিরুদ্ধে ধনিকতন্ত্রের পক্ষে সুর মিলিয়ে কথা বলছে। এটা স্বাভাবিক। কারণ, শ্রমজীবী মানুষের চেয়ে বড় বড় আমলা ও ব্যবসায়ীদের মূল্যই তাদের কাছে বেশী মূল্যবান। তাই সে সমস্ত সংবাদপত্র ভারতীয় জনজীবনের সঠিক অবস্থা তুলে ধরে না। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ আড়াল থাকলে কোন দেশেরই অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান হয় না, কোন দেশই সুষ্ঠুভাবে সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে এগোতে পারে না।

হ্যাঁ—স্বাধীনতা লাভের পর এ দেশে পর পর কয়েকটি পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে। যেখানে একদিন বনবাদাড় ছিল, দিনদুপুরে শেয়াল ডাকত, সেখানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে কত পাকাবাড়ি, আর নতুন নতুন কল-কারখানা। দেশের এ পরিবর্তনকে অস্বীকার করা যায় না, সঙ্গে সঙ্গে এ বাস্তব সত্যটুকুও অস্বীকার করতে পারা যায় না যে স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে গণদারিদ্র্য বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। "বর্তমানে জনসংখ্যার কতভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে আছে সে-সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত যাই হোক, এ-বিষয়ে মতদ্বৈধতার অবকাশ নেই যে, বিগত দশ বছরে মোটামুটিভাবে অন্ততঃ আট কোটি লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে যে জনসংখ্যা, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।"[১]

১। অজিত রায়, 'পলিটিকাল পাওয়ার ইন ইণ্ডিয়া-নেচার এণ্ড ট্রেণ্ডস্', পৃ-৭।

সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন আজও হয়নি। তাদের কথা ভাবতে গেলে স্মরণে আসে স্পষ্টবক্তা লর্ড কার্জনের একটি কথা—“শাসন ও শোষণ একই সরকারের কাজ।” (১৯০২, আসাম) পূর্বেই বলেছি, আমরা যে পথে চলেছি, তার সঙ্গে বৃটিশ নীতির খুব একটা পার্থক্য নেই। কারণ, ইংরাজ আমলের আমলাতান্ত্রিক কাঠামো বাতিল করে দেওয়া হয়নি। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় চরিত্রে আমলাতান্ত্রিক প্রাধান্য এখনো অক্ষুণ্ণ আছে। ফলে, প্রশাসনযন্ত্র এমনভাবে চালানো হচ্ছে যে নির্বিবাদে শোষণ চলতে পারে। তাই একশ্রেণীর মানুষ নিজেদের কার্যসিদ্ধি করছে ও ঐশ্বর্য গড়ে তুলছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনে যে স্বপ্ন ও যে আশা মানুষের মনে ছিল, তার পরিপূর্ণ সার্থকতা হয়নি। রাস্তাঘাটে কান পাতলেই শোনা যাবে দুর্নীতি, অব্যবস্থা, অসাধুতা ও আরও কত কি! এগুলো নিশ্চয় মিথ্যা নয়? এমনি অবস্থার মধ্যে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষগুলো ক্রমাগত ঘূরপাক খাচ্ছে। তাদের দুর্দশার শেষ নেই। অথচ, আমরা জানি, বহু আড়ম্বরের সঙ্গে ভারতের সংবিধানের ৪৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একদিন ঘোষণা করা হয়েছিল যে, “রাষ্ট্র বিশেষ যত্নের সঙ্গে দেশের দুর্বলতর অংশের বিশেষত তফসিলী সম্প্রদায় ও আদিবাসীদের শিক্ষা ও অর্থনীতিগত স্বার্থপূরণ এবং তাদের সর্বপ্রকার সামাজিক অবিচার ও শোষণ থেকে রক্ষা করবে।” এই পবিত্র সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি এ পর্যন্ত কতখানি পালিত হয়েছে? দুঃখের বিষয়, সরকারী নির্দেশ ও ঘোষণা সুষ্ঠুভাবে পালিত না হওয়ায় স্বাধীন ভারতে অনগ্রসর আদিবাসী ও তফসিলী সম্প্রদায়গুলির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি আজও হয়নি। সমাজের এই মানুষগুলি তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। হৃদয়হীন শক্তিশালী আমলাতন্ত্র ও কায়েমী স্বার্থের চক্রান্তে সংবিধানের সেই প্রতিশ্রুতি কেবলমাত্র কথার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হ্যাঁ—বলতে ভাল লাগে, আর শুনতেও ভাল লাগে যে, প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা তাদের কল্যাণের জন্য বরাদ্দ হচ্ছে। কিন্তু ফল পাওয়া যাচ্ছে সামান্য। সমস্ত ব্যাপারটাই একটা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। এটা শুধু পশ্চিমবঙ্গেরই কথা নয়, এটা সমগ্র ভারতের কথা।

আর জমি? যে জমির জন্য আদিবাসীরা বারবার বিদ্রোহ করেছে সে জমি আজও তারা পায়নি। জমিদারী প্রথার অবসান ঘটিয়ে ভূমি-সংস্কার আইন পাশ হয়েছে সত্যি, এমন কি সে আইনকে কয়েকবার সংশোধনও করা হয়েছে। কিন্তু কৃষকের সমস্যা মেটেনি। স্বাধীন ভারতে আজও বিভিন্ন প্রকারের সুদের মহাজনী কারবার ও দাদন প্রথা বেগার খাটানো ইত্যাদি আদিবাসী কৃষকের জীবনকে এক সর্বনাশা ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে। ১৯৬০ সালের এক সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে—

> “আদিবাসী-জীবনের প্রায় সকল পথই স্বার্থান্বেষীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ব্যবসায়ীরূপী মহাজনরা জিনিসপত্র কেনাবেচা ও খাদ্য সরবরাহের কারবারের সঙ্গে ধার-দেনার ব্যাপারটা খুব কৌশলে সার্থক

ভাবে যুক্ত করে নিয়েছে। কয়েকজন ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি ছোট গোষ্ঠী মহাজন, কারবারী, বনবিভাগ, পূর্তবিভাগ ও আবগারী ঠিকাদারদের ভূমিকা নিয়ে এই সব আদিবাসী অঞ্চলে প্রভূত প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করেছে। একজন আদিবাসীকে সব রকম অবস্থার মধ্যেই এদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়, তাদের ব্যবস্থাকে এড়িয়ে চলার সাধ্য তার নেই। তাদের জন্য তাদের খাটতে হবে, তাদের কাছে ধার করতে হবে এবং তাদের কাছেই তার উৎপন্ন জিনিস বেচতে এবং তার প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে হবে। এই পাপচক্র আদিবাসীকে সবদিক থেকে বেঁধে রেখেছে, এই বেড়া ভেঙ্গে বদলি কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করার তার উপায় নেই, এবং এই গোষ্ঠীর কাছ থেকে কোনও প্রতিকারও পেতে পারে না। এই অবস্থার একমাত্র সমাধান হতে পারে, যদি সরকার সমস্ত দায়দায়িত্ব গ্রহণ করে দেনাগুলি জাতীয়করণ করে নেন, যেটা পরিশোধিত হবে এই শর্তে যে আদিবাসীরা তাদের সমস্ত উৎপন্ন সরকারী নিয়ামকের মাধ্যমে বিক্রয় করবে এবং সরকার তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করবে।"[১]

সরকারের এ বক্তব্য পড়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে আর এক দৃশ্য। তা হল—ভারতের হরিজন সমাজের দৃশ্য। স্বাধীন ভারতে মানবাত্মা সবচেয়ে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হয়েছে তাদের মধ্যেই এবং আজও হচ্ছে।

একই কথা বলতে হয় আদিবাসী এবং অন্যান্য তফসিলী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে। ভারতের সংবিধানে যদিও তাদের জন্য রক্ষাকবচের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থায় কায়েমী স্বার্থ কখনই সরকারী নির্দেশকে সহজে কার্যকরী করতে দেবে না। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ভিতর দিয়েই শুধু তারা কেন, সমস্ত সংগ্রামী মানুষকে এগোতে হবে। তবেই, একদিন সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ, শ্রমিক, কৃষক ও ক্ষেত-মজুর জীবন-জীবিকার ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নতুন ইতিহাস রচনা করবে।

১। এ. বি. বর্ধন, 'দি আনসলভড্ ট্রাইবাল প্রবলেম,' পৃ-৩০-৩১।

সাঁওতাল বিদ্রোহের ঘটনাপঞ্জি

১৭ জানুয়ারি, ১৭৮৪	ভাগলপুর ও রাজমহলের কালেক্টর ক্লিভল্যান্ড হত্যা। তিলকা মুর্মুর নেতৃত্বে প্রথম সশস্ত্র সাঁওতাল বিদ্রোহ।
১৭৮৫	তিলকা মুর্মুর ফাঁসি।
১৮৩২-১৮৩৩	জন পেটি ওয়ার্ড এবং সার্ভেয়ার ক্যাপ্টেন ট্যানার কর্তৃক দামিন-ই-কোহ্-র সীমানা নির্ধারণ। কটক, ধলভূম, মানভূম, বরাভূম, ছোটনাগপুর, পালামৌ, হাজারীবাগ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূম থেকে দলে দলে সাঁওতালদের দামিন-ই-কোহ্-তে প্রবেশ।
৩০ জুন, ১৮৫৫	ভগনাডিহি গ্রামে বিশাল জনসমাবেশে সিদু-কানুর ভাষণ এবং শোষণহীন স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য দশ হাজার সাঁওতালের শপথ গ্রহণ। কলিকাতা অভিমুখে প্রথম গণ-পদযাত্রা।
৭ জুলাই, ১৮৫৫	সাঁওতাল জনতার হাতে কুখ্যাত মহাজন কেনারাম ভগত ও দিঘি থানার অত্যাচারী দারোগা মহেশলাল দত্ত খুন। সাঁওতাল বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত।
১১ জুলাই ১৮৫৫	বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্যবাহিনীসহ মেজর বারোজের কলগাঁ আগমন।
১২ জুলাই, ১৮৫৫	সিদু, কানু, চাঁদ এবং ভৈরবের নেতৃত্বে বিদ্রোহীদের পাকুড়ে প্রবেশ এবং রাজবাড়ি আক্রমণ।
১৩ জুলাই, ১৮৫৫	কদমসায়েরে সেভেন্‌থ্ রেজিমেণ্ট বাহিনীর আগমন, বৃহত্তর সামগ্রিক সংগ্রামের সূত্রপাত।
১৫ জুলাই, ১৮৫৫	পাকুড়ের কাছে তরাই নদীতীরে সাঁওতাল বিদ্রোহীদের সঙ্গে সেভেন্‌থ্ রেজিমেণ্টের সম্মুখ যুদ্ধ। যুদ্ধে সাঁওতালবাহিনীর পরাজয়।
১৬ জুলাই, ১৮৫৫	পিয়ালাপুরের যুদ্ধে বিদ্রোহীদের হাতে ইংরাজ বাহিনীর পরাজয়।
২০ জুলাই, ১৮৫৫	বীরভূমের দক্ষিণ-পশ্চিমে তালডাঙ্গা থেকে সাঁইথিয়া পর্যন্ত এবং উত্তর-পশ্চিমে ভাগলপুর ও রাজমহল থেকে ভাগলপুর জেলার উত্তর-পূর্বভাগ পর্যন্ত বিদ্রোহীদের আধিপত্য বিস্তার।
২১ জুলাই, ১৮৫৫	কাতনা গ্রামে ইংরাজবাহিনীর পরাজয় স্বীকার।
২৩ জুলাই, ১৮৫৫	বীরভূমের বিখ্যাত ব্যবসাকেন্দ্র গণপুর বাজার ধ্বংস।

২৪ জুলাই, ১৮৫৫	বারহারোয়া-বারহাইত রাস্তায় রঘুনাথপুরে মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ টুগুড পরিচালিত ইংরাজ সেনাবাহিনীর হাতে চাঁদ ও কানুর পরাজয়।
২৯ জুলাই, ১৮৫৫	ক্যাপ্টেন শেরউইল কর্তৃক বারোখানি সাঁওতাল গ্রাম ও লেফটেন্যান্ট্ গর্ডন কর্তৃক মুনহান ও মুনকাতরো গ্রাম ধ্বংস।
৩০ জুলাই ১৮৫৫	লফটেন্যান্ট রুবি কর্তৃক আরো সাতখানি সাঁওতাল গ্রাম ধ্বংস।
১৭ আগস্ট ১৮৫৫	ইংরাজ সরকার কর্তৃক আত্মসমর্পণের ঘোষণাপত্র প্রচার ও সাঁওতালদের ঘোষণাপত্র প্রত্যাখ্যান।
১৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫	মোচিয়া, কাঁসজোলা, রাম পারগানা ও সুন্দ্রা মাঁঝির নেতৃত্বে ওপরবাঁধ থানা ও গ্রাম লুট।
অক্টোবর ২য় সপ্তাহ	সিদু-কানু কর্তৃক অম্বা হার্না মৌজা লুট।
১০ নভেম্বর, ১৮৫৫	ইংরাজ সরকার কর্তৃক সামরিক আইন জারী।
৩ জানুয়ারি, ১৮৫৬	সামরিক আইন প্রত্যাহার।
২৩ জানুয়ারি, ১৮৫৬	সুজারামপুরের গ্রাণ্ট সাহেবের কুঠি লুট।
২৭ জানুয়ারি, ১৮৫৬	লেফটেন্যান্ট ফেগান সাহেব পরিচালিত ভাগলপুর হিল রেঞ্জার্স বাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রামে সাঁওতালদের পরাজয়।
ফেব্রুয়ারি ২য় ও ৩য় সপ্তাহ, ১৮৫৬	সিদু-কানুর মৃত্যু।

গ্রন্থ-নির্দেশিকা

যে সকল গ্রন্থ, সরকারী দলিলপত্র, গেজেটিয়ার ও সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা থেকে তথ্য ও উদ্ধৃতি গৃহীত হয়েছে তার তালিকা।

ইংরাজী গ্রন্থ

Bardhan, A. B. — The Unsolved Tribal Problem
Bradly Birt, F. B. — The Story of an Indian Upland
Buckland, C. E. — Bengal under the Lieutenant Governors, Vol-1
Carstairs, R. — Harma's Village
Datta, K. K. — The Santal Insurrection of 1855-57.
Hunter W. W. — The Annals of Rural Bengal
The Indian Empire
Lovett, H. V. — The Cambridge History of India Vol-VI
Macphail, J. M. — The Story of the Santal
Majumdar, R. C. — British Paramountcy and Indian Renaissance, Part-1
Man, E. G. — Sonthlia and the Sonthals
Marshman J. C. — History of India, Vol-1
Marx, K. — Capital, Vol-III
Raghavaiah, V — Tribal Revolts.
Roy, A. — Political Power in India—Nature and Trends

জেলা গেজেটিয়ার ও ইংরাজী পত্র-পত্রিকা

Bengal District Gazetteer for Santal Parganas.
Calcutta Review, 1856,

বাংলা গ্রন্থ

গণেশ দেউস্কর, সখারাম — দেশের কথা
ঘোষ, কালীচরণ — জাগরণ ও বিস্ফোরণ
ঘোষ, বিনয় — সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, চতুর্থ খণ্ড
নিয়োগী জ্ঞানাঞ্জন — দেশের ডাক

বাগল, যোগেশচন্দ্র	মুক্তির সন্ধানে ভারত
বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ	বাংলা সাময়িক পত্র
রায়, সুপ্রকাশ	ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম
ঐ	মুক্তি-যুদ্ধে ভারতীয় কৃষক

সাঁওতালী গ্রন্থ

হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃক্' কাথা
ছটরায় দেশমাঁঝিহি রেয়াঃক্' কাথা
সান্তাল পারগানা, সান্তাল আর পাহাড়িয়াকোওয়াঃক্' ইতিহাস

হিন্দি গ্রন্থ

শ্রীরামলক্ষ্মণ প্রসাদ	অমর শহীদ বাবা তিলকা মাঁঝি

বাংলা সাময়িক পত্রিকা

সংবাদ প্রভাকর
সম্বাদ ভাস্কর
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
ভারতবর্ষ, ১৩৪৫
দেশ, ১৩৫৭
সাহিত্য পত্র, শরৎ সংকলন, ১৩৫৯

হিন্দি সাময়িক পত্রিকা

বিহার সমাচার, স্বাধীনতা অঙ্ক,

সাঁওতালী সাময়িক পত্রিকা

পছিম বাংলা, ১৯৫৫

নির্দেশিকা

ও

ক

খ

গ

ঘ

চ

ছ

ভ

য

র

ল

শ